১৩তম খণ্ড

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা

উত্তরণের উপায়

বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা উত্তরণের উপায়

ত্রয়োদশ খণ্ড

বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা : উত্তরণের উপায়
(২০২১-২২ সালে প্রকাশিত টিআইবির গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংকলন)

ত্রয়োদশ খণ্ড

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২৩
© ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষণালব্ধ তথ্য-উপাত্তনির্ভর এই প্রকাশনায় উপস্থাপিত বিশ্লেষণ ও সুপারিশ টিআইবির মতামতের প্রতিফলন, যার দায়দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট গবেষক ও টিআইবির।

সংকলনে অন্তর্ভুক্ত গবেষণাগুলোর উপদেষ্টা

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের
উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

প্রচ্ছদ অলংকরণ

সামছুদ্দোহা সাফায়েত

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (৫ম ও ৬ষ্ঠ তলা)
বাড়ি - ৫, সড়ক - ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরোনো)
ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: ৮৮০-২ ৪৮১১৩০৩২, ৪৮১১৩০৩৩, ৪৮১১৩০৩৬
ফ্যাক্স: ৮৮০-২- ৪৮১১৩১০১
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org
ফেসবুক : www.facebook.com/TIBangladesh

ISBN: 978-984-35-3809-3

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

মুখবন্ধ

প্রথম অধ্যায়
শুদ্ধাচার ব্যবস্থা

অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন : গণতান্ত্রিক সুশাসনের চ্যালেঞ্জ উত্তরণে করণীয় ১৫
মোহাম্মদ রফিকুল হাসান

দ্বিতীয় অধ্যায়
সেবা খাত

সেবা খাতে দুর্নীতি : জাতীয় খানা জরিপ ২০২১ ২৭
ফারহানা রহমান, মোহাম্মদ নূরে আলম, মো. সাজেদুল ইসলাম, মো. জুলকারনাইন, মো. নেওয়াজুল মওলা, মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান সাখিদার, কাওসার আহমেদ, মো. নূরুজ্জামান ফরহাদ, মো. মোস্তফা কামাল, মো. সহিদুল ইসলাম রাবেয়া আক্তার কনিকা ও মো. সাজ্জাদুল করিম

করোনাভাইরাস সংকট মোকাবিলায় সুশাসন : অন্তর্ভুক্তি ও স্বচ্ছতার চ্যালেঞ্জ ৪৭
রাবেয়া আক্তার কনিকা, কাওসার আহমেদ ও মো. জুলকারনাইন

টিসিবির ফ্যামিলি কার্ড কার্যক্রমে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ৬৯
মুহা. নূরুজ্জামান ফরহাদ, কাওসার আহমেদ, মো. মোস্তফা কামাল মোহাম্মদ নূরে আলম ও মো. জুলকারনাইন

করোনা-সংকট মোকাবিলায় সাড়াদানকারী বেসরকারি সংস্থাগুলোর ভূমিকা : চ্যালেঞ্জ ও করণীয় ৮৫
মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান সাখিদার, মো. শাহ্‌নূর রহমান ও মো. শহিদুল ইসলাম

বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও অধিকার : সুশাসনের চ্যালেঞ্জ এবং উত্তরণের উপায় ১০৩
রাবেয়া আক্তার কনিকা

তৃতীয় অধ্যায়
পরিবেশ ও জলবায়ু অর্থায়ন

বাংলাদেশে কয়লা ও এলএনজি বিদ্যুৎ প্রকল্প : সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় ১২১
মো. মাহ্ফুজুল হক ও মো. নেওয়াজুল মওলা

পরিবেশ অধিদপ্তরে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় ১৪৫
মো. নেওয়াজুল মওলা

মিসরের শার্ম আল শেখে কপ-২৭ জলবায়ু সম্মেলন : জলবায়ু অর্থায়নে ন্যায্যতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রসঙ্গে টিআইবির অবস্থানপত্র ১৬৩
মো. মাহ্ফুজুল হক

গবেষক পরিচিতি ১৭০

মুখবন্ধ

দেশব্যাপী দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং নাগরিক চাহিদাকে সোচ্চার ও কার্যকর করার জন্য কাজ করছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। এর অংশ হিসেবে সুশাসনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সরকারি-বেসরকারি সেবা খাতে দুর্নীতির প্রকৃতি, মাত্রা ও ব্যাপকতা নিরূপণের জন্য টিআইবি গবেষণা ও তার ভিত্তিতে অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সরকার ও সংশ্লিষ্ট সব অংশীজনের অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশে আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক, নীতি ও কৌশলকাঠামোয় প্রয়োজনীয় ও যুগোপযোগী সংস্কারের মাধ্যমে রাষ্ট্রের দুর্নীতিবিরোধী ও সুশাসন-সহায়ক অবকাঠামো সুদৃঢ় করা এবং এর প্রয়োগে সহায়ক ভূমিকা পালন করা এই কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য।

টিআইবি পরিচালিত ও প্রকাশিত বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ নিয়ে 'বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা : উত্তরণের উপায়' শীর্ষক ১২টি সংকলন ইতিমধ্যে বার্ষিক ভিত্তিতে প্রকাশিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় এই সিরিজের ত্রয়োদশতম সংকলন ২০২৩ সালের অমর একুশে বইমেলা উপলক্ষে প্রকাশিত হলো। এই সংকলনকে তিনটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন, দ্বিতীয় অধ্যায়ে সেবা খাত এবং তৃতীয় অধ্যায়ে পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে প্রকাশিত বিভিন্ন গবেষণার সারসংক্ষেপ সংকলিত হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ের একমাত্র প্রবন্ধে অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচনের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাব্য সময় ২০২৩ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০২৪ সালের জানুয়ারি। ইতিমধ্যে এই নির্বাচন ঘিরে সংশ্লিষ্ট অংশীজন, তথা রাজনৈতিক দল, নির্বাচন কমিশন, নাগরিক সমাজ, গণমাধ্যম এবং উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়েছে। সামনের নির্বাচন কতটুকু অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হবে তার সাথে এটিও গুরুত্বপূর্ণ যে এটি কতখানি অন্তর্ভুক্তিমূলক হবে। গত দুটি জাতীয় নির্বাচনে সুশাসনের যেসব ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে, সেই ধরনের ঘাটতি আসন্ন নির্বাচনেও থাকলে তার পরিণতি কী হবে তা নিয়ে সব মহলেই ব্যাপক উদ্বেগ লক্ষ করা যায়। এই নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ, নিরপেক্ষ, গ্রহণযোগ্য এবং সর্বোপরি একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচনে পরিণত করাই বর্তমানে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক সুশাসন অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ উত্তরণে সংশ্লিষ্ট সব অংশীজনেরই রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এ ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনকে প্রদত্ত সাংবিধানিক বিশেষ দায়িত্ব ছাড়াও নির্বাচনকালীন সরকার ও তার প্রশাসনিক যন্ত্র, বিশেষ করে প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, ক্ষমতাসীন ও বিরোধী রাজনৈতিক দল, সুশীল সমাজ এবং গণমাধ্যমের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে সরকারের বিভিন্ন সেবা খাত ও এর অধীনে সেবা প্রতিষ্ঠানের ওপর কয়েকটি গবেষণার সারাংশ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ অধ্যায়ের প্রথম প্রবন্ধে 'সেবা খাতে দুর্নীতি : জাতীয় খানা জরিপ ২০২১'-এর মূল ফলাফল সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হয়েছে। দেখা যায় ২০২১ সালে

১৭টি খাতে সার্বিকভাবে ৭০ দশমিক ৯ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ দুর্নীতিগ্রস্ত সাতটি খাত হচ্ছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা (৭৪.৪%), পাসপোর্ট (৭০.৫%), বিআরটিএ (৬৮.৩%), বিচারিক সেবা (৫৬.৮%), স্বাস্থ্যসেবা (৪৮.৭%), স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (৪৬.৬%) এবং ভূমি সেবা (৪৬.৩%)। ২০২১ সালে সার্বিকভাবে ঘুষের শিকার হওয়া খানার হার ৪০ দশমিক ১ শতাংশ; এ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ঘুষ গ্রহণকারী তিনটি খাত হচ্ছে পাসপোর্ট, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা ও বিআরটিএ। জরিপে অন্তর্ভুক্ত ঘুষদাতা খানার ৭২ দশমিক ১ শতাংশ ঘুষ দেওয়ার কারণ হিসেবে 'ঘুষ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না'–এ কথা বলেছেন, অর্থাৎ ঘুষ আদায়ের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ অব্যাহত রয়েছে।

২০২১ সালে সার্বিকভাবে খানাপ্রতি গড়ে ৬ হাজার ৬৩৬ টাকা ঘুষ দিতে বাধ্য হয়েছে এবং সর্বোচ্চ ঘুষ আদায়ের তিনটি খাত হলো বিমা, বিচারিক ও গ্যাসসেবা। জাতীয় পর্যায়ে প্রাক্কলিত মোট ঘুষের পরিমাণ প্রায় ১০ হাজার ৮৩০ দশমিক ১ কোটি টাকা, যা ২০২০-২১ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটের (সংশোধিত) ৫ দশমিক ৯ শতাংশ এবং বাংলাদেশে জিডিপির শূন্য দশমিক ৪ শতাংশ। সেবা খাতে দুর্নীতি ২০২১ সালের জরিপের ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, সার্বিকভাবে ২০১৭ সালের তুলনায় সেবা খাতে দুর্নীতির শিকার খানার হার বৃদ্ধি পেয়েছে (২০২১ সালে যেখানে দুর্নীতির শিকার খানার হার একই খাত বিবেচনায় পাওয়া গেছে ৭০ দশমিক ৮ শতাংশ, ২০১৭ সালে এই হার ছিল ৬৬ দশমিক ৫ শতাংশ)। ২০১৭ সালের তুলনায় ২০২১ সালে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের হার কমেছে কিন্তু ঘুষ আদায়ের পরিমাণ বেড়েছে। অপরদিকে অন্যান্য অনিয়ম-দুর্নীতি বেড়ে যাওয়ায় সার্বিকভাবে সেবা খাতে দুর্নীতি বেড়েছে। বিভিন্ন খাতে ডিজিটালাইজেশন প্রক্রিয়া চলমান থাকলেও কোনো কোনো সেবা খাতে তা পুরোপুরি কার্যকর না হওয়ায় দুর্নীতি একই অবস্থায় রয়েছে (যেমন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, পাসপোর্ট, বিআরটিএ ইত্যাদি) এবং কিছু খাতে বৃদ্ধি পেয়েছে (স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, এনজিও, বিমা ইত্যাদি)। এ ছাড়া ২০১৭ সালের তুলনায় ২০২১ সালে কোনো কোনো খাতে ঘুষের শিকার খানার হার বেড়েছে (স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান) এবং কোনো কোনো খাতে কমেছে (কৃষি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা)।

আর্থসামাজিক অবস্থানভেদে খানার দুর্নীতির শিকার হওয়ার হারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য তারতম্য লক্ষ করা যায়নি, তবে ঘুষের ক্ষেত্রে শহরাঞ্চলের চেয়ে গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী খানার শিকার হওয়ার হার বেশি (৩৬ দশমিক ৬ শতাংশ বনাম ৪৬ দশমিক ৫ শতাংশ)। উচ্চ আয়ের তুলনায় নিম্ন আয়ের খানার ওপর দুর্নীতির বোঝাও অপেক্ষাকৃত বেশি। সেবা নিতে গিয়ে উচ্চ আয়ের তুলনায় নিম্ন আয়ের খানা তাদের বার্ষিক আয়ের অপেক্ষাকৃত বেশি অংশ ঘুষ দিতে বাধ্য হয়। জরিপের ফলাফল বিশ্লেষণে আরও পাওয়া যায়, পুরুষ সেবাগ্রহীতার তুলনায় নারী সেবাগ্রহীতারা কোনো কোনো খাতে বেশি দুর্নীতির শিকার হয়েছেন (স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, অন্যান্য খাত) এবং কোনো কোনো সেবা খাতে নারীদের তুলনায় পুরুষ সেবাগ্রহীতারা বেশি দুর্নীতির শিকার হয়েছেন (শিক্ষা, ভূমি সেবা)। এ ছাড়া ৩৫ বছরের নিচের সেবাগ্রহীতাদের তুলনায় ৩৬

ও এর বেশি বয়সের সেবাগ্রহীতারা অপেক্ষাকৃত বেশি দুর্নীতির শিকার হন। যেসব খানার খানা-প্রধান প্রতিবন্ধিতার কারণে প্রান্তিক, তাদের দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার ৮০ দশমিক ৩ শতাংশ, যা সার্বিক গড় দুর্নীতির শিকার হওয়ার হারের তুলনায় ১০ শতাংশ বেশি। ঘুষ দিতে বাধ্য হয়েছে এমন খানার সার্বিক হার ৩৯ দশমিক ৮ শতাংশ, অথচ প্রতিবন্ধিতাসম্পন্ন খানার ক্ষেত্রে এ হার ৫১ দশমিক ৮ শতাংশ।

এ অধ্যায়ের দ্বিতীয় প্রবন্ধে 'করোনাভাইরাস সংকট মোকাবিলায় সুশাসন : অন্তর্ভুক্তি ও স্বচ্ছতার চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক গবেষণার সারাংশ উপস্থাপিত হয়েছে। এটি ২০২২ সালে একই বিষয়ের ওপর সম্পন্ন গবেষণার চতুর্থ পর্ব, যেখানে করোনাভাইরাস মোকাবিলায় সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ সুশাসন, বিশেষ করে অন্তর্ভুক্তি ও স্বচ্ছতার আলোকে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এ প্রবন্ধে দেখা যায়, করোনাভাইরাসের সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ, আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসাব্যবস্থা ও টিকা কার্যক্রম এবং করোনার প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে গৃহীত প্রণোদনা কার্যক্রমে অনিয়ম-দুর্নীতিসহ সুশাসনের চ্যালেঞ্জ অব্যাহত রয়েছে। করোনাভাইরাস সংকট মোকাবিলায় সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার, পরিস্থিতি অনুযায়ী দ্রুত সাড়া প্রদান এবং সেবা সম্প্রসারণ করা হয়নি, যা বারবার সংক্রমণ বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের মৃত্যুসহ নানা ধরনের দুর্ভোগ বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে কাজ করেছে। কোভিড-১৯ টিকাসহ চিকিৎসাব্যবস্থা ও প্রণোদনা কার্যক্রমে সবার জন্য সমান প্রবেশগম্যতা ও সবার অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত না করায় সেবাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে এলাকা, শ্রেণি, লিঙ্গ ও জনগোষ্ঠীভেদে বৈষম্য ছিল। এটি সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সেবা থেকে বঞ্চিত করছে এবং হয়রানি ও আর্থিক বোঝা তৈরি করেছে। কোভিড-১৯ মোকাবিলা কার্যক্রমে স্বচ্ছতার ঘাটতি একদিকে অনিয়ম-দুর্নীতির ঝুঁকি তৈরি করেছে এবং অন্যদিকে সংঘটিত দুর্নীতিকে আড়াল করার সুযোগ তৈরি করেছে। প্রণোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান থাকায় করোনাভাইরাসের প্রভাবে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের কাছে প্রণোদনার সুফল প্রত্যাশিতভাবে পৌঁছায়নি। বিদ্যমান কোভিড-১৯ সেবা কার্যক্রমে অভিযোগ নিরসনব্যবস্থা না থাকায় সমস্যা নিরসনে বা অনিয়ম-দুর্নীতির সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি, যা সুশাসনের সমস্যাগুলো টিকে থাকার অন্যতম কারণ।

তৃতীয় প্রবন্ধে ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) ফ্যামিলি কার্ড কার্যক্রমে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। করোনাভাইরাসের অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবিলায় এবং অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে বাংলাদেশ সরকার মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য বিভিন্ন সহায়তা কর্মসূচি গ্রহণ করে, যার মধ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজারে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে রমজান মাস সামনে রেখে ২০২২ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে টিসিবির মাধ্যমে নিম্ন আয়ের এক কোটি পরিবারকে 'ফ্যামিলি কার্ড' দিয়ে ভর্তুকি মূল্যে পণ্য সরবরাহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর মধ্যে করোনাকালে '২৫০০ টাকা নগদ সহায়তা' কর্মসূচির আওতাভুক্ত উপকারভোগীদের ৩৮ লাখ ৫০ হাজার উপকারভোগীর সবাই এবং নতুন করে ৬১ লাখ ৫০ হাজার নতুন উপকারভোগীকে এই কর্মসূচির

আওতায় আনা হবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তবে গবেষণায় দেখা যায়, নিম্ন আয়ের পরিবারগুলোর ফ্যামিলি কার্ড প্রাপ্তি এবং সাশ্রয়ী মূল্যে পণ্য ক্রয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুশাসনের ঘাটতি ছিল। ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচি জনস্বার্থে গৃহীত সরকারের একটি কর্মসূচি হলেও সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোর সক্ষমতা যাচাই করে যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তুতি না নিয়েই দ্রুত এ ধরনের কর্মসূচি গ্রহণের ফলে বিভিন্ন পর্যায়ে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ পরিলক্ষিত হয়েছে। দেখা যায়, উপকারভোগীর তালিকাভুক্তি ও পণ্য ক্রয়ে স্বচ্ছতার ঘাটতি এবং অনিয়ম-দুর্নীতির ফলে একদিকে প্রকৃত উপকারভোগীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচির তালিকা থেকে বাদ পড়েছে, অন্যদিকে উপকারভোগীদের চাহিদা, পণ্য ক্রয়ের সামর্থ্য এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রবেশগম্যতা, অন্তর্ভুক্তির বিষয়গুলো যথাযথভাবে বিবেচনা না করায় দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে এই ইতিবাচক উদ্যোগের সুফল যথাযথভাবে পৌঁছায়নি, যা এই কর্মসূচির উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করেছে। তথ্য প্রকাশ ও প্রচারে ঘাটতি থাকার কারণে লক্ষিত উপকারভোগীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এই কার্যক্রমের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং একই সাথে দুর্নীতির শিকার হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে। তা ছাড়া ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচিতে কার্যকর অভিযোগ নিরসনের ব্যবস্থা না থাকায় দুর্নীতির সাথে জড়িত ব্যক্তিদের জবাবদিহির আওতায় আনা সম্ভব হয়নি।

এ অধ্যায়ের চতুর্থ প্রবন্ধে করোনা-সংকট মোকাবিলায় সাড়াদানকারী বেসরকারি সংস্থাগুলোর ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কোভিড-১৯ সংকট মোকাবিলায় সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে অংশীজন হিসেবে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের কোভিড-১৯ সংক্রান্ত তহবিল ও চলমান প্রকল্পের তহবিল ছাড়াও সাধারণ তহবিল থেকে ত্রাণ ও খাদ্যসহায়তা, নগদ অর্থ বিতরণ, সচেতনতামূলক কার্যক্রম, স্বাস্থ্যসেবা ও সুরক্ষাসামগ্রী প্রদান, লাশ দাফন ও সৎকারসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্রুততার সাথে সাড়া দেয়। সরকার-ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ থেকে প্রান্তিক ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রঋণ সংস্থাগুলো তুলনামূলক বেশি কার্যকর ছিল। নিয়মিত আয়ের উৎস না থাকা, দাতা সংস্থা কর্তৃক তহবিল হ্রাস এবং ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হওয়ায় করোনা-সংকট মোকাবিলায় কর্মসূচি বাস্তবায়নে সংস্থাগুলোর তহবিলের সংকট ছিল মূল চ্যালেঞ্জ। অন্যদিকে করোনা অতিমারির সময়েও ত্রাণ বিতরণের ক্ষেত্রে উপকারভোগীর তালিকা প্রণয়নে স্থানীয় ক্ষমতাসীনদের নেতিবাচক প্রভাব ছিল। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ বেসরকারি সংস্থার করোনা কর্মসূচি-সংক্রান্ত তহবিল সংগ্রহ ও ব্যয়ে তেমন কোনো অনিয়ম চিহ্নিত না হলেও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের ঘাটতি ছিল। করোনাকালে বিভিন্ন মেয়াদে ক্ষুদ্রঋণের কিস্তি আদায় বন্ধ রাখার নির্দেশনা থাকলেও বেশ কিছু সংস্থার বিরুদ্ধে কিস্তি আদায়ে চাপ প্রয়োগের অভিযোগ পাওয়া যায়। করোনাকালে প্রাথমিক পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সমন্বয়হীনতা দেখা গেলেও পরবর্তী সময়ে স্বাস্থ্যসেবা, ত্রাণ বিতরণসহ বিভিন্ন কার্যক্রমে সমন্বয়ের উন্নয়ন ঘটে। তবে বেসরকারি সংস্থা ও তদারকি সংস্থার অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থায় ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়।

এ অধ্যায়ের পঞ্চম প্রবন্ধে বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও অধিকার নিয়ে গবেষণার সারাংশ উপস্থাপিত হয়েছে। ২০১৪ সালের ২৭ জানুয়ারি বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে বীরাঙ্গনাদের মুক্তিযোদ্ধার সম্মান প্রদান করার জন্য উচ্চ আদালতে একটি পিটিশন করা হয়। ২০১৫ সালের জানুয়ারি মাসে জাতীয় সংসদ বীরাঙ্গনাদের মুক্তিযোদ্ধার মর্যাদা দেওয়ার প্রস্তাব পাস করে, যেখানে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের সহযোগী কর্তৃক নির্যাতিত নারীদের 'নারী মুক্তিযোদ্ধা (বীরাঙ্গনা)' হিসেবে গেজেটভুক্ত করা এবং মাসিক ভাতাসহ মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য প্রযোজ্য সব সরকারি সুবিধা প্রদান ও আর্কাইভ তৈরি করার বিষয়ে বলা হয়। ২০২২ সালের ২৪ মে পর্যন্ত গেজেটভুক্ত বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ছিল মোট ৪৪৮ জন। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে গেজেটভুক্তির প্রজ্ঞাপন জারির ছয় বছরের বেশি সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও গেজেটভুক্ত বীরাঙ্গনার সংখ্যা লক্ষণীয়ভাবে কম। এ ছাড়া বীরাঙ্গনাদের স্বীকৃতি ও সুবিধাপ্রাপ্তির প্রক্রিয়া নিয়েও রয়েছে নানা প্রশ্ন। এই পরিপ্রেক্ষিতে বীরাঙ্গনাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি এবং অধিকার নিশ্চিতকরণের প্রক্রিয়া সুশাসনের নির্দেশকের আলোকে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করার উদ্দেশ্যে এ গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়।

গবেষণায় দেখা যায়, মুক্তিযুদ্ধের চার দশক পরে হলেও মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বীরাঙ্গনাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান সরকারের একটি অনন্য পদক্ষেপ। তবে বীরাঙ্গনাদের চিহ্নিত করা থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও সুযোগ-সুবিধা প্রদানের পুরো প্রক্রিয়ায় নানা ঘাটতি বিদ্যমান। বীরাঙ্গনাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও অধিকারপ্রাপ্তির প্রক্রিয়া যেখানে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে বাস্তবায়ন করা আবশ্যক, সেখানে পরিকল্পনাহীনতা, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ঘাটতি, কাঠামোগত জটিলতা, অনিয়ম-দুর্নীতির সুযোগ, জবাবদিহির ব্যবস্থা ও সংবেদনশীলতায় ঘাটতি প্রক্রিয়াটিকে করে তুলেছে জটিল। তার সাথে সামাজিক সচেতনতা ও সংবেদনশীলতার ঘাটতিও লক্ষণীয়। স্বাধীনতার ৫০ বছর পরও সামাজিক মূল্যবোধে অনেকাংশেই স্থবিরতা রয়ে গেছে। স্থানীয় পর্যায়ে সামাজিক-সাংস্কৃতিক নেতিবাচক মনোভাবের কারণে বীরাঙ্গনারা এখনো প্রান্তিকীকরণের শিকার। বীরাঙ্গনাদের নিয়ে বিভিন্ন বেসরকারি ও নারীবিষয়ক প্রতিষ্ঠান এবং মিডিয়ার নির্দিষ্ট কিছুসংখ্যক কাজ থাকলেও তা নারীবিষয়ক অন্য যেকোনো কাজের তুলনায় বেশ অপ্রতুল। বীরাঙ্গনাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও অধিকার প্রদানের এ প্রক্রিয়াটি সরকারি সাধারণ প্রক্রিয়া থেকে ভিন্ন হলেও পুরো প্রক্রিয়া গতানুগতিক আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিনির্ভর। সংবেদনশীল এ বিষয়টি বিশেষ বিবেচনায় না রাখার কারণে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া বীরাঙ্গনাদের জন্য অনেক ক্ষেত্রেই জটিলতার সৃষ্টি করছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে দুটি গবেষণার সারাংশ এবং একটি অবস্থানপত্র উপস্থাপিত হয়েছে। প্রথম প্রবন্ধে বাংলাদেশে কয়লা ও এলএনজি বিদ্যুৎ প্রকল্পে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। গবেষণায় সার্বিকভাবে দেখা যায়, জ্বালানি খাতের অবকাঠামো উন্নয়ন, নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়নে উন্নয়ন সহযোগীদের ওপর অতিরিক্ত নির্ভর করা হয়েছে, ফলে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশের জ্বালানি খাতের নীতি

করায়ত্ত (পলিসি ক্যাপচার) করতে পেরেছেন। দুর্বল আইনের সুযোগ নিয়ে পুরোনো কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রযুক্তি বাংলাদেশে আমদানি করার মাধ্যমে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। একদিকে যেমন নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রসারে সরকারের উল্লেখযোগ্য কোনো পদক্ষেপ নেই, অন্যদিকে জীবাশ্ম জ্বালানি প্রকল্পে অধিক দুর্নীতি এবং দ্রুত মুনাফা তুলে নেওয়ার সুযোগ থাকায় কয়লা ও এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। প্রভাবশালী মহলকে অনৈতিক সুবিধা প্রদানে প্রকল্প অনুমোদন, বিবিধ চুক্তি সম্পাদন, ইপিসি ঠিকাদার নিয়োগ, বিদ্যুতের দাম নির্ধারণ এবং বিদ্যুৎ ক্রয়ে প্রতিযোগিতাভিত্তিক পদ্ধতি ব্যবহার না করে বিশেষ বিধানের আওতায় চুক্তি ও কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে। কয়লা ও এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নে পরিবেশ সংরক্ষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। পরিবেশ আইন লঙ্ঘন করে এবং নির্ভুল পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব সমীক্ষা ছাড়াই প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ত্রুটিপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে পরিবেশদূষণ এবং সংকটাপন্ন এলাকাগুলোতে ঝুঁকি বৃদ্ধি পেলেও পরিবেশ অধিদপ্তর বিদ্যমান আইন ও বিধি কার্যকরভাবে প্রয়োগে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে বন, নদী, খাসজমিসহ প্রাকৃতিক সম্পদের দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি হচ্ছে। এ ছাড়া প্রকল্প বাস্তবায়নে নানাবিধ অনিয়ম ও দুর্নীতি এবং মানবাধিকার লঙ্ঘিত হলেও বিচার না হওয়ায় অপরাধীদের এক ধরনের দায়মুক্তি প্রদান করা হচ্ছে, যা এ খাতসংশ্লিষ্ট প্রভাবশালীদের অনিয়ম ও দুর্নীতিকে আরও উৎসাহিত করছে।

দ্বিতীয় প্রবন্ধে পরিবেশ অধিদপ্তরে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ-সংক্রান্ত গবেষণায় দেখা যায়, একদিকে পরিবেশসংক্রান্ত আইনের দুর্বলতা রয়েছে এবং অন্যদিকে বিদ্যমান আইন, বিধিমালাসহ সম্পূরক আইন কার্যকরভাবে প্রয়োগে ব্যর্থ হয়েছে পরিবেশ অধিদপ্তর। কর্মীদের একাংশের অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে বড় অঙ্কের নিয়মবহির্ভূত আর্থিক লেনদেন এবং তা প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে ঘাটতির ফলে পরিবেশ অধিদপ্তরে দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হয়েছে। অধিদপ্তরের কর্মীদের একাংশের সাথে পরিবেশদূষণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকদের একাংশের যোগসাজশ এবং তাদের প্রভাবের কাছে আত্মসমর্পণ করার কারণে অধিদপ্তরের কার্যকারিতা ব্যাহত হচ্ছে। অধিদপ্তরের কার্যক্রমে সুশাসনের বিভিন্ন নির্দেশকে, যেমন স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা, জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা, জনসম্পৃক্ততা এবং কার্যকর সমন্বয়ে ঘাটতি বিদ্যমান। একদিকে সামর্থ্যের ঘাটতি এবং অন্যদিকে সরকারের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে প্রভাবিত হয়ে বস্তুনিষ্ঠ অবস্থান গ্রহণে ঘাটতির কারণে পরিবেশ রক্ষায় ব্যর্থ হচ্ছে পরিবেশ অধিদপ্তর। এ ছাড়া কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পসহ সরকারি বিভিন্ন বড় উন্নয়ন প্রকল্প এবং শিল্প কারখানা স্থাপন মূলত পরিবেশদূষণের জন্য দায়ী হলেও এবং পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ অগ্রাধিকার কার্যক্রমের অংশ হওয়ার কথা থাকলেও পরিবেশ অধিদপ্তর তার ওপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগে ব্যর্থ হচ্ছে। আমলানির্ভরতা, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ঘাটতি, নিরীক্ষায় ঘাটতি, পেশাগত দক্ষতার ঘাটতি এবং অনেক ক্ষেত্রে সৎ সাহস ও দৃঢ়তার ঘাটতির কারণে পরিবেশ অধিদপ্তর একটি দুর্বল, দুর্নীতিগ্রস্ত এবং অনেকাংশে অক্ষম ও অকার্যকর একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিণত হয়েছে।

এ অধ্যায়ের শেষ প্রবন্ধ হিসেবে মিসরের শার্ম *আল শেখে কপ-২৭ জলবায়ু* সম্মেলন উপলক্ষে কয়লাভিত্তিক জ্বালানি ব্যবহার বন্ধ *ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রসার* এবং প্রতিশ্রুত জলবায়ু অর্থায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রসঙ্গে টিআইবির অবস্থানপত্র উপস্থাপিত হয়েছে। এ অবস্থানপত্রে টিআইবি বাংলাদেশের পক্ষ থেকে কপ-২৬ সম্মেলনে উত্থাপনযোগ্য বেশ কিছু সুপারিশ প্রস্তাব করে, যার মধ্যে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করে উন্নত দেশগুলোকে প্রতিশ্রুত ১০০ বিলিয়ন ডলার জলবায়ু তহবিল প্রদান এবং ২০২০-২০২৫ মেয়াদের জন্য প্রতিশ্রুত মোট ৬০০ বিলিয়ন ডলার প্রদানে একটি রোডম্যাপ প্রস্তুতে সমন্বিত দাবি উত্থাপন; জলবায়ু অর্থায়নের জন্য নতুন সম্মিলিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে উন্নয়নশীল এবং ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্ট্রগুলোর সাথে একত্রে কাজ করা; কার্বন নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্যমাত্রা আরও বৃদ্ধি করে ২০২৫ সালের আগে এনডিসি সংশোধনে উদ্যোগ গ্রহণ; উন্নত স্বচ্ছতা কাঠামোর প্রতিশ্রুতি পূরণে শিথিলতা পরিহার এবং অভিযোজন ও প্রশমন কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা; জিসিএফসহ জলবায়ু তহবিলে ঋণের বদলে অভিযোজনকে অগ্রাধিকার দিয়ে ক্ষতিপূরণের টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা; ক্ষয়ক্ষতিবিষয়ক আলাদা তহবিল গঠন করা; সান্তিয়াগো নেটওয়ার্ক অন লস অ্যান্ড ড্যামেজের পরিচালনা পদ্ধতি নির্ধারণপূর্বক তা কার্যকরে ব্যবস্থা গ্রহণ করা; ক্ষতিগ্রস্ত দেশে অভিযোজন এবং প্রশমনবিষয়ক ৫০ঃ৫০ অনুপাত মেনে অর্থায়ন করা এবং ২০২২ সালের পরে সব দেশকে নতুন কোনো কয়লানির্ভর প্রকল্প অনুমোদন ও অর্থায়ন না করার ঘোষণা দেওয়া উল্লেখযোগ্য।

এ ছাড়া বাংলাদেশ সরকারের করণীয় হিসেবে যেসব সুপারিশ প্রস্তাব করা হয়, এর মধ্যে ইউক্রেন যুদ্ধপ্রসূত অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক ও জ্বালানির সংকট মোকাবিলার বাধ্যবাধকতার পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনজনিত চ্যালেঞ্জগুলোর ওপর প্রাধান্য অব্যাহত রাখা;

জীবন-জীবিকা, বন ও পরিবেশ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায় কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রসহ ঝুঁকিপূর্ণ শিল্পায়ন কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে স্থগিত করে আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য ও নিরপেক্ষ কৌশলগত পরিবেশের প্রভাব নিরূপণসাপেক্ষে অগ্রসর হওয়া; একটি সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপসহ প্রস্তাবিত ইন্টিগ্রেটেড এনার্জি অ্যান্ড পাওয়ার মাস্টারপ্ল্যানে (আইইপিএমপি) কৌশলগতভাবে নবায়নযোগ্য জ্বালানিকে গুরুত্ব দেওয়া; জ্বালানি খাতে স্বার্থের দ্বন্দ্ব সংশ্লিষ্টদের বাদ দিয়ে অন্তর্ভুক্তি ও অংশগ্রহণমূলক উপায়ে আইইপিএমপি প্রণয়ন করা; বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানির উৎপাদন বৃদ্ধিতে এ খাতে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা গ্রহণ করা এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা-সংক্রান্ত সব প্রকল্পে সুশাসন, শুদ্ধাচার এবং বিশেষ করে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ নিশ্চিত করা উল্লেখযোগ্য।

এই সংকলনের গ্রন্থনা ও সম্পাদনা টিআইবির রিসার্চ ও পলিসি বিভাগের সিনিয়র রিসার্চ ফেলো শাহজাদা এম আকরামের নেতৃত্বে সম্পন্ন হয়েছে। প্রকাশনা-সংক্রান্ত কাজে বিশেষ সহায়তা দিয়েছেন আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশনস বিভাগের কো-অর্ডিনেটর মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম এবং অ্যাসিস্টেন্ট কো-অর্ডিনেটর মাসুম বিল্লাহ। তাদেরসহ অন্যান্য সব বিভাগের সংশ্লিষ্ট সহকর্মী

যারা নিজস্ব অবস্থানে থেকে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, তাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। এ ছাড়া গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট খাত ও প্রতিষ্ঠানের সব পর্যায়ের কর্মকর্তাসহ বিশেষজ্ঞ ও অংশীজন, যারা তথ্য প্রদানসহ বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন, তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

সংকলনটি বাংলাদেশে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথে চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণে আগ্রহী পাঠকের ভালো লাগবে–এ প্রত্যাশা করছি। এতে অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি প্রবন্ধে মূল গবেষণাপ্রসূত সুনির্দিষ্ট সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সুপারিশসহ বিস্তারিত গবেষণা প্রতিবেদনগুলো টিআইবির ওয়েবসাইটে প্রকাশিত রয়েছে (www.ti-bangladesh.org)। এসব সুপারিশ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করবে এবং যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে, টিআইবির এ প্রত্যাশা। সংকলন সম্পর্কে পাঠকের মন্তব্য ও পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

প্রথম অধ্যায়
শুদ্ধাচার ব্যবস্থা

অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন : গণতান্ত্রিক সুশাসনের চ্যালেঞ্জ উত্তরণে করণীয়*

*মোহাম্মদ রফিকুল হাসান***

একটি দেশে গণতান্ত্রিক শাসনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে নির্বাচনের গুরুত্ব অপরিসীম, যে শাসনব্যবস্থার মূলে আবশ্যক শর্ত এই যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের নিজেদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে এবং অন্যদের সাথে তাদের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ায় গণতান্ত্রিক নিয়ম অনুসারে পরিচালিত হবে।[১] নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ তাদের পছন্দমাফিক প্রতিনিধি বাছাই করে নেওয়ার সুযোগ লাভ করে থাকেন। 'আমার ভোট আমি দেব, যাকে খুশি তাকে দেব' স্লোগানের মধ্য দিয়ে এ প্রত্যয়ই প্রতিফলিত হয়েছে যে জনগণ তাদের ভোটাধিকার স্বাধীনভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে পছন্দের প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করার ক্ষেত্রে অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করবেন।

বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমরা যদি বিগত দিনগুলোর ইতিহাস পর্যালোচনা করি তাহলে দেখতে পাই, সাম্প্রতিক অতীতে ২০০৮ সালে একটি গ্রহণযোগ্য সুষ্ঠু, অবাধ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, যা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে সব মহলে স্বীকৃত ও প্রশংসিত হয়েছিল। বাংলাদেশের জনগণ সে সময় এই উপলব্ধিতে পৌঁছেছিলেন যে ওই জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে তারা তাদের পছন্দমতো প্রকৃত প্রতিনিধিদেরই সংসদে প্রেরণ করতে পেরেছেন। তারা আশাবাদী হয়ে ওঠেন যে ভবিষ্যতে একইভাবে তারা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারবেন। কিন্তু সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিলের পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৩ সালে তৎকালীন প্রধান বিরোধী দলের নেতৃত্বাধীন জোট তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে আন্দোলনের পথ বেছে নেয় এবং রাজপথে অনড় থেকে জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে, ফলে নির্বাচন হয়ে পড়ে একদলীয়। এতে করে জনগণের ভোটাধিকার প্রয়োগের উৎসাহ-উদ্দীপনা যেমন একদিকে কমে যায়, অপরদিকে নির্বাচনের মাধ্যমে যারা ক্ষমতাসীন হন, তারা জাতীয় নীতিনির্ধারণ এবং শাসন কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে একধরনের একক দলীয় আধিপত্যের সুযোগ লাভ করেন। পরবর্তী সময়ে ২০১৮ সালের নির্বাচনে বিরোধী দলগুলো সম্মিলিত জোটবদ্ধভাবে ফিরে এলেও কাঙ্ক্ষিত সফলতা দেখাতে

---

*২০২২ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক গণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ আয়োজিত সেমিনারের কার্যপত্র।

[১] Democratic governance। OSCE

পারেনি, যার জন্য দায়ী অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় 'সবার জন্য সমান ক্ষেত্র' (Level Playing Field)-এর অনুপস্থিতি, যার মধ্যে ইসি এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে প্রশাসন এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিতর্কিত ভূমিকা রয়েছে। নির্বাচনী প্রচারাভিযান পর্যায়ে বিরোধী দলের ওপর দমন-পীড়ন, নির্বাচনকালে বুথে প্রতিনিধি প্রেরণ ও অবস্থানের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি এবং রাতের অন্ধকারে অবৈধ ভোট প্রদানের মতো গুরুতর অভিযোগও উত্থাপিত হয়েছে। ফলে এই নির্বাচনে ভোটাররা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে কতটুকু সফল হয়েছেন, সে বিষয়টি প্রশ্নবিদ্ধ রয়ে গেছে। অপরদিকে ২০১৩-উত্তর বাংলাদেশের রাজনীতির একটি বৈশিষ্ট্য এই যে গণতন্ত্রকে সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলো ক্রমাগত দুর্বল হয়েছে এবং আজ অবধি বিরোধীশিবির এমন কোনো গণভিত্তি ও সাংগঠনিক দৃঢ়তা অর্জন করতে পারেনি, যার দ্বারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও নির্বাচন অনুষ্ঠান সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ করার ক্ষেত্রে তারা কার্যকর রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে ভূমিকা পালন করতে পারে।

উপরিউক্ত প্রেক্ষাপটেই দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন আমাদের সামনে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। এই নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ, নিরপেক্ষ, গ্রহণযোগ্য এবং সর্বোপরি একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচনে পরিণত করাই বর্তমানে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক সুশাসন অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ উত্তরণে সংশ্লিষ্ট সব অংশীজনেরই রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এ ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনকে প্রদত্ত সাংবিধানিক বিশেষ দায়িত্ব ছাড়াও নির্বাচনকালীন সরকার ও তার প্রশাসনিক যন্ত্র, বিশেষত প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, ক্ষমতাসীন ও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো, সুশীল সমাজ এবং গণমাধ্যমের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও একাদশ সংসদের নেতা নিজেই এ বিষয়ে তার দল ও সরকারের ইচ্ছার কথা অতিসম্প্রতি খুবই স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। সংসদে এক প্রশ্নোত্তরে তিনি ২০২৩ সালে অনুষ্ঠিতব্য দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনকে অধিকতর অংশগ্রহণমূলক করে তোলার ক্ষেত্রে তার সরকারের গৃহীত ১১টি পদক্ষেপের উল্লেখ করেছেন, যার মধ্যে ছবিসংবলিত ভোটার তালিকা প্রণয়নের বিষয়টিও উল্লেখ করেন। সংবিধানের ১১৮ (৪) অনুচ্ছেদ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বিশেষভাবে জোর দিয়ে বলেন যে নির্বাচন কমিশন তার কার্যক্রম পরিচালনায় স্বাধীন থাকবে এবং এর (অর্থাৎ নির্বাচন কমিশন তথা ইসির) কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা করা সরকার ও নির্বাহী কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব। তার দল আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন সরকার অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে আন্তরিক ও ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

সংসদে পেশকৃত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এসব আশা উদ্দীপক বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে শুধু এটুকুই বলা যেতে পারে যে আমরা আশা করব, নির্বাচনকালীন সরকার নির্বাচনের সময়ে নির্বাচন-প্রত্যাশী সব রাজনৈতিক দলের জন্য সমান প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র নিশ্চিত করাসহ ভোটারের ভোটকেন্দ্রে আগমন ও ভোট প্রদানের সুযোগ করে দেওয়ার বিষয়টির ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করবে। ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা, স্বচ্ছ ভোটবাক্স বা ইভিএমের ব্যবহারসহ সবকিছুই অর্থহীন হয়ে পড়ে যদি সব

রাজনৈতিক দলের জন্য সুষ্ঠু, অবাধ প্রতিযোগিতার সুযোগ না থাকে এবং ভোটার ভোটকেন্দ্রে গিয়ে দেখতে পান তার ভোটটি আগেই দেওয়া হয়ে গেছে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভোটারদের মধ্যে ভীতি ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, ভোটকেন্দ্রে সব দলের প্রতিনিধির উপস্থিতির সুযোগ নিশ্চিত করা হয়নি এবং ভোট গণনার সময় তাদের উপস্থিতিও নিশ্চিত করা হয়নি। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় এই অভিযোগগুলো ব্যাপকভাবে উত্থাপিত হয়েছে, গবেষণালব্ধ তথ্য-উপাত্তও এসব অভিযোগের পক্ষে ছিল এবং এখনো এগুলো নির্বাচনকেন্দ্রিক উদ্বেগের কেন্দ্রীয় উপাদান হিসেবে বিরাজ করছে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, নির্বাচনসংক্রান্ত আইন ও বিধি। সংশ্লিষ্ট সব আইন ও বিধিও এ রকম হওয়া প্রয়োজন যাতে সব দলের জন্য সমান প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র নিশ্চিত হয়। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দশম এবং একাদশ উভয় সংসদ নির্বাচনের সময়ই অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেছে যে প্রতিটি নির্বাচনী এলাকায় একজন সংসদ সদস্য বিদ্যমান থাকা অবস্থায় নতুন সংসদ সদস্য পদের জন্য নির্বাচনে পক্ষপাত বা প্রভাব বিস্তারের সুযোগ ও ঝুঁকি সৃষ্টি করে। এর সাম্প্রতিক উদাহরণ আমরা দেখতে পাই কুমিল্লা সিটি করপোরেশন নির্বাচনে যেখানে বিতর্কিতভাবে কয়েকটি কেন্দ্রের ফলাফল দেরিতে ঘোষণার মাধ্যমে ক্ষমতাসীন মেয়রকেই নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়। তাই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে সমতার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে পঞ্চদশ সংশোধনীর সংশ্লিষ্ট ধারা বাতিল করে পূর্বাবস্থায় ফিরে যেতে হবে। এই সমতাব্যঞ্জক অবস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে অন্যান্য পদক্ষেপের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো নির্বাচন কমিশনের শতভাগ নিরপেক্ষ অবস্থান নিশ্চিত করা এবং প্রয়োজনে আইনি সংস্কারের মাধ্যমে নির্বাচনকালীন সরকারের কার্যক্রম সীমিত রুটিন কাজে সীমাবদ্ধ করা।

এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে একটি নির্বাচনকে কার্যকরভাবে সুষ্ঠু, অবাধ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করে তুলতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ শুধু নির্বাচনের দিনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। নির্বাচনী আচরণ বিধিগুলো, বিশেষ করে সরকারি দলের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক প্রচারাভিযান নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা অনুযায়ী মেনে চলার বিষয়টি অত্যন্ত জরুরি। মনোনয়নের ক্ষেত্রে তৃণমূলের মতামতের প্রতিফলন ঘটাতে হবে এবং মনোনয়ন-বাণিজ্যের অবসান হতে হবে। ২০১৮ সালের নির্বাচনের ক্ষেত্রে এমনকি বিদেশে বসেও কোটি কোটি টাকার মনোনয়ন-বাণিজ্য পরিচালনার অভিযোগ এসেছে। টাকার বিনিময়ে যদি প্রার্থী মনোনয়ন লাভ করেন তাহলে সংসদে জনগণের প্রতিনিধিত্ব করার বিষয়টি অপ্রধান হয়ে ওঠার ঝুঁকি সৃষ্টি হয় এবং যারা প্রকৃতপক্ষে জনগণের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন, নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা গোড়াতেই বিনষ্ট হয়ে যায়। এ ছাড়া নির্বাচনী প্রচার-প্রক্রিয়ায় ব্যয় বিধিবদ্ধ সীমার মধ্যে রাখার ক্ষেত্রে ব্যাপক ব্যত্যয়ের অভিযোগ রয়েছে। মনোনয়ন এবং প্রচারে বিপুল অর্থ ব্যয় করে যারা নির্বাচিত হন, তারা জনগণের প্রতিনিধিত্ব কমই করতে পারেন। ফলে ‘প্রতিনিধিরা জনগণের প্রতিনিধিত্ব না করে নিজেদেরই প্রতিনিধিত্ব’ শুরু করেন– এ রকম একটি পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে।

তাই নির্বাচন অর্থবহ ও জনগণের প্রতিনিধিত্বশীলতার ক্ষেত্রে কার্যকর হতে হলে নির্বাচনী মনোনয়নকে দুর্নীতিমুক্ত করে তৃণমূল পর্যায়ের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ২০০৭ সালে তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার আইনে যে বিধান সৃষ্টি করা হয়েছিল নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে, সেটি পুনরায় চালু করার দাবি রয়েছে। জনগণ নির্বাচনের দিন ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ পান বটে, কিন্তু পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা আর জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকার ক্ষেত্রে কোনো আইনি বাধ্যবাধকতার মধ্যে পড়েন না। ফলে পাঁচ বছর মেয়াদে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা ভোটারদের প্রতিনিধিত্ব করছেন কি না, তা পরিবীক্ষণ করার কোনো সুযোগ ভোটাররা আর পান না। পৃথিবীর অনেক দেশে এ ক্ষেত্রে দুই সংসদ নির্বাচনের অন্তর্বর্তীকালীন পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধি প্রত্যাহারের সুযোগ আছে (Recall method)। সংসদকে জনপ্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে অধিকতর উপযোগী করে তুলতে বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও ভোটারদের অনুরূপ আইনগত সুযোগ সৃষ্টির সুপারিশ টিআইবি আগে থেকেই করে আসছে। জনগণকে সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় কার্যকরভাবে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রতি পাঁচ বছরে একবার ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ পর্যাপ্ত নয়। এ ছাড়া সংসদীয় গণতন্ত্রকে কার্যকর করার জন্য নির্বাচনের প্রচলিত পদ্ধতির সীমাবদ্ধতার বিষয়টিও টিআইবি এর আগে আলোচনায় এনেছে। বর্তমান পদ্ধতিতে মোট ভোটের কম শতাংশ পেয়েও আসনভিত্তিক সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সরকার গঠনের সুযোগ রয়েছে এবং দৃষ্টান্তও রয়েছে, যা 'বিজয়ীরাই সবকিছু পাবে' (Winners take it all) এমন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটার ক্ষেত্রে একটি অন্যতম কারণ। ফলে জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিরোধী দলগুলোর মধ্যে আপসহীন সহিংস লড়াইয়ের ঝুঁকি সৃষ্টি হয়। 'আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতি' (Proportional Representation Method) প্রবর্তনের মাধ্যমে এ ধরনের সহিংসতার ঝুঁকি কমিয়ে আনা যেতে পারে।

নিঃসন্দেহে সামগ্রিকভাবে আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করার জন্য সর্বাধিক গুরুদায়িত্বপ্রাপ্ত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান নির্বাচন কমিশন। তবে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে নতুন কমিশন সব দলকে নির্বাচনে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে তাদের করণীয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোনো অবস্থান নিতে ব্যর্থ হয়েছে। টিআইবি এ ব্যাপারে শুরু থেকেই তার বক্তব্য স্পষ্টভাবে জানিয়েছে। টিআইবি মনে করে, যদি সব দলের আস্থা সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের নির্বাচনে নিয়ে আসার জন্য আইনগত পরিবর্তন বা সংস্কার প্রয়োজন হয় তাহলে নির্বাচন কমিশনকে সে কথা স্পষ্টভাবে সরকারকে জানিয়ে দিতে হবে। বিদ্যমান আইনি কাঠামোর বিভিন্ন ঘাটতি, যা নির্বাচনকে সুষ্ঠু, অবাধ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করার ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের সক্ষমতা সৃষ্টিতে বাধা দেয়, সেগুলো দূর করার জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ করা নির্বাচন কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক ও নৈতিক দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। দুঃখজনক যে এ ধরনের কোনো উদ্যোগ না নিয়ে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে যা বলা হয়েছে

তা সব দলের আস্থা সৃষ্টির সম্পূর্ণ বিপরীত।[২] একইভাবে ইভিএম সম্পর্কে কমিশনের সিদ্ধান্ত কমিশনের প্রতি আস্থা সৃষ্টির ক্ষেত্রে নেতিবাচক ভূমিকা রাখছে। ইতিমধ্যে নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করেছে যে ভোটগ্রহণের জন্য এবার সর্বোচ্চ ১৫০টি আসনে ইভিএম ব্যবহার করা হবে। তবে এই সিদ্ধান্ত বিভিন্ন মহল থেকে সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে এবং অনেকেই এটিকে নতুন নির্বাচন কমিশনের ওপর জনগণের আস্থা সৃষ্টির ক্ষেত্রে গুরুতর নেতিবাচক একটি পদক্ষেপ বলে মনে করছেন। নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব নেওয়ার পর রাজনৈতিক দল ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় সভা করেছে। এই মতবিনিময়কালে বেশির ভাগ রাজনৈতিক সংগঠন এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি ইভিএম ব্যবহারের বিপক্ষে মত দেন। যারা মতবিনিময়ে যোগ দেননি, তারাও গণমাধ্যমে বিবৃতি বা তাদের বক্তব্যে ইভিএম ব্যবহারের বিষয়ে অনাস্থা ব্যক্ত করেছেন।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে টিআইবি মনে করে, ইসির এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত বিতর্কিত এবং তা উল্লেখযোগ্যসংখ্যক রাজনৈতিক দল, সুশীল সমাজ, রাজনৈতিক ও স্বাধীন নির্বাচনী ভাষ্যকার, এবং বিশ্বাসযোগ্য প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞসহ প্রাসঙ্গিক অংশীজনদের উদ্বেগকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছে। ইসি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণ ও যুক্তি পর্যাপ্তভাবে কোথাও ব্যাখ্যা করেনি, তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে এটি কি একটি পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধান্ত ছিল? টিআইবি আরও মনে করে, ইভিএম ব্যবহারের বিরুদ্ধে ব্যাপকসংখ্যক অংশীজনের বিরোধিতার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে এবং বর্তমান আর্থিক সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে ইসির উচিত ইভিএম ব্যবহারের রাজনৈতিক, আর্থিক এবং কারিগরি ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলো বস্তুনিষ্ঠভাবে বিশ্লেষণ করে সেগুলো স্বচ্ছতার সাথে তুলে ধরা। অবাধ, সুষ্ঠু ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচনের ক্ষেত্রে ইভিএম ব্যবহারের এই সিদ্ধান্ত কতটুকু সুনির্দিষ্ট অবদান সত্যি সত্যি রাখবে এবং সুনির্দিষ্টভাবে সেগুলো কী কী সে-সম্পর্কে জানার অধিকার দেশের ভোটারদের রয়েছে।

অপরদিকে এখনো পর্যন্ত বিরোধী দলের পক্ষ থেকে এই নির্বাচন প্রসঙ্গে বর্জনের কথাই উচ্চারিত হচ্ছে। মনে রাখতে হবে, তাদের আপত্তি শুধু ইভিএমকেন্দ্রিক নয়। সমান প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র এবং সেই লক্ষ্যে নির্বাচনকালীন সরকার, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলো এবং প্রশাসনের নিরপেক্ষ ভূমিকা নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় আইনি সংস্কারের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হলে আশা করা যায় যে ২০১৩-এর মতো অনমনীয় পদক্ষেপ তারা নেবে না এবং নির্বাচন বর্জনের চিন্তা থেকে বেরিয়ে এসে নির্বাচনে অংশগ্রহণে আগ্রহী হবে। নির্বাচন যেন সুষ্ঠু, অবাধ ও

[২] সম্প্রতি একজন নির্বাচন কমিশনার স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে সব দলকে নির্বাচনে নিয়ে আসা নির্বাচন কমিশনের কাজ নয়। সূত্র: The Daily Star Online, Friday August 26, 2022, https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/politics/news/not-ecs-job-make-all-parties-join-polls-3103256; প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কাজী হাবিবুল আউয়াল বলেছেন, "নির্বাচন কমিশন (ইসি) সক্রিয় অংশগ্রহণমূলক ভোট চায়। তবে কাউকে ধরে-বেঁধে নির্বাচনে আনবে না ইসি।" সূত্র: প্রথম আলো, ৫ সেপ্টেম্বর ২০২২, ইসি কাউকে ধরে-বেঁধে ভোটে আনবে না: সিইসি। প্রথম আলো (prothomalo.com)

নিরপেক্ষ হয় সে জন্য তারা প্রয়োজনীয় বাস্তবায়নযোগ্য দাবি পেশ করবে। সরকারের পতন এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে যদি তারা আন্দোলনে অনড় থাকে, তাহলে রাজনৈতিক সংকট ঘনীভূত হওয়ার আশঙ্কা থেকে যাওয়ারই যথেষ্ট বাস্তবসম্মত কারণ রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সরকারি ও বিরোধী দল উভয় পক্ষকেই দেশ এবং জনগণের স্বার্থ প্রাধান্য দিয়ে আলোচনা এবং ছাড়ের মাধ্যমে একটি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় আসা প্রয়োজন, যেখানে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে উভয় পক্ষই আশাবাদী হয়ে ওঠার যথেষ্ট কারণ দেখতে পাবে। এ ধরনের একটি অবস্থান, যেখানে উভয় পক্ষই নির্বাচনে অবাধ অংশগ্রহণ সম্পর্কে আশাবাদী হয়ে উঠতে পারে তা সৃষ্টির ক্ষেত্রে সহায়ক সরকারি ও বিরোধী দল, নির্বাচন কমিশন, নাগরিক সমাজ, গণমাধ্যমসহ সব অংশীজনের জন্য গ্রহণযোগ্য কিছু সুনির্দিষ্ট সুপারিশ বিভিন্ন সময়ে টিআইবি কর্তৃক পরিচালিত গবেষণার ভিত্তিতে এখানে তুলে ধরা হলো।

রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ

- দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে সব রাজনৈতিক দলকেই শান্তিপূর্ণ পন্থায় ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া হিসেবে নির্বাচন কার্যকর করে তোলার ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল ও আন্তরিক হতে হবে।
- সরকারি দল অন্যান্য দলের আস্থা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, যার মধ্যে রয়েছে সব দলের সাথে কার্যকর সংলাপ, সরকারের পক্ষ থেকে গৃহীত পদক্ষেপগুলো তুলে ধরা, নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক হওয়ার ক্ষেত্রে বিরোধী দলের দাবি সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করা ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং নির্বাচন কমিশন স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সব সহযোগিতা নিশ্চিত করা।
- বিরোধী দলের বা জোটের পক্ষ থেকে কোনো অনড় অবস্থানে যাওয়ার পরিবর্তে নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ ও অংশগ্রহণমূলক করার জন্য জাতির সামনে বাস্তবায়নযোগ্য দাবি পেশ করতে হবে এবং এ লক্ষ্যে সরকার ও নির্বাচন কমিশনের সাথে আলোচনায় বসতে হবে।

আইনি সংস্কার

সুষ্ঠু, অবাধ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সহায়ক প্রয়োজনীয় আইনি সংস্কার করতে হবে; বিশেষ করে ক্ষমতাসীন মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যরা পদত্যাগ না করেই নির্বাচনে যাওয়ার সুযোগ গ্রহণ করলে অন্যান্য প্রার্থীর সাথে তাদের প্রতিযোগিতার সমান ক্ষেত্র নিশ্চিত করা সম্ভব নয় বিধায় এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আইনি সংস্কারের উদ্যোগ নিতে হবে। এ ছাড়া নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আইনি সংস্কারের উদ্যোগ নিতে হবে :

- নির্বাচনকালীন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, স্বরাষ্ট্র, জনপ্রশাসন, স্থানীয় সরকার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের পদায়ন ও বদলির ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের অনুমোদন নেওয়া বাধ্যতামূলক করা;

- নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পরবর্তী তিন মাস পর্যন্ত নির্বাচনকালীন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের (যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে) কমিশনের অধীনে রাখা;
- তৃণমূল থেকে মনোনয়নকৃত প্রার্থীদের মধ্য থেকেই মনোনয়নদান বাধ্যতামূলক করা;
- আচরণবিধি লঙ্ঘন-সংক্রান্ত শাস্তির ক্ষেত্রে আইনে সব ধরনের অসামঞ্জস্যতা দূর করা (যেমন এখনো গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ আইন ১৯৭২ এবং নির্বাচনী আচরণ বিধিমালায় একই ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান লক্ষ করা যায়) এবং কোনো ধরনের পক্ষপাতিত্ব ছাড়া নির্বাচনী আইন বাস্তবায়ন;
- রাজনৈতিক দলের আর্থিক বিবরণী প্রকাশ বাধ্যতামূলক করা;
- প্রার্থী ও রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন যাচাই-বাছাই করার ব্যবস্থাসংক্রান্ত ধারা নির্বাচনী আইনে অন্তর্ভুক্ত করা;
- জাতীয় নির্বাচন অধিকতর অন্তর্ভুক্তিমূলক করার লক্ষ্যে নির্বাচনে নারী, সংখ্যালঘু ও প্রতিবন্ধীদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য প্রযোজ্য আইন সংশোধনের মাধ্যমে সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করা। বর্তমানে কোনো আইনেই তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়নি।

ইভিএম ব্যবহার

১৫০টি পর্যন্ত আসনে ইভিএম ব্যবহারের বিতর্কিত সিদ্ধান্তটি প্রত্যাহার করতে হবে এবং এ বিষয়ে পুনরায় কোনো সিদ্ধান্তে আসার আগে ইভিএম ব্যবহারের রাজনৈতিক, আর্থিক এবং কারিগরি ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক বস্তুনিষ্ঠভাবে বিশ্লেষণ করে ইভিএম ব্যবহারের ফলে সম্ভাব্য প্রাপ্তি ও ঝুঁকির বিষয়গুলো দেশবাসীর সামনে স্বচ্ছতার সাথে তুলে ধরতে হবে।

নির্বাচনকালীন ও নির্বাচনোত্তর বিভিন্ন পদক্ষেপ

- প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণার ব্যয় ও আচরণবিধি লঙ্ঘনের ঘটনা নির্বাচন কমিশনকে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং আইন ও বিধি মোতাবেক পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রয়োজনে নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করে প্রার্থী ও দলনির্বিশেষে নির্বাচন বাতিল করার ক্ষমতাও প্রয়োগ করার মতো দৃঢ়তা দেখাতে হবে।
- সব দলের সভা-সমাবেশ করার সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে;
- প্রতিপক্ষের নেতা-কর্মীদের দমন-পীড়ন প্রতিরোধ ও প্রতিকারে ইসি কর্তৃক কঠোরভাবে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করা;
- সব দল ও প্রার্থীর প্রচারণার সমান সুযোগ এবং সব দলের প্রার্থী ও নেতা-কর্মীদের নিরাপত্তা সমানভাবে নিশ্চিত করতে হবে;
- ভোটকেন্দ্র বা বুথে অনাকাঙ্ক্ষিত হস্তক্ষেপ বা প্রভাব বিস্তার বা বলপ্রয়োগ বা সংঘর্ষ এবং জাল

ভোট প্রদান রোধে সবগুলো নির্বাচন কেন্দ্রে সিসি ক্যামেরা স্থাপন এবং ভোটদানকালীন এগুলো চালু থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

- সুষ্ঠ, নিরাপদ, গ্রহণযোগ্য ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের স্বার্থে নির্বাচন পর্যবেক্ষণে আগ্রহী সব দেশি ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের জন্য অবাধ ও সম্পূর্ণ প্রভাবমুক্ত সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট অনুমোদনের প্রক্রিয়ায় যথাযোগ্য সংস্কার করতে হবে।
- নির্বাচন পর্যবেক্ষক, গবেষক ও গণমাধ্যমের তথ্য সংগ্রহের জন্য অবাধ পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। নির্বাচন পর্যবেক্ষক ও সংবাদমাধ্যমের জন্য কোনো ধরনের নিয়ন্ত্রণ বা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা যাবে না, যেমন নির্বাচনের সময়ে ইন্টারনেটের গতি হ্রাস করা, মোবাইল ফোনের জন্য ফোর-জি ও থ্রি-জি নেটওয়ার্ক বন্ধ রাখা, জরুরি প্রয়োজন ছাড়া মোটরচালিত যানবাহন চলাচলে নিষেধাজ্ঞা আরোপ ইত্যাদি।
- ভোটকেন্দ্র বা বুথে অনাকাঙ্ক্ষিত হস্তক্ষেপ বা প্রভাব বিস্তার বা বলপ্রয়োগ বা সংঘর্ষ এবং জাল ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোকে নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালে অভিযোগ দায়েরে উৎসাহিত করতে হবে।
- নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালের অধীনে অভিযোগ দায়েরের পরবর্তী ছয় মাসের মধ্যে আপিলসহ অভিযোগ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।
- প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন যাচাই-বাছাই বাধ্যতামূলক করতে হবে।
- প্রার্থী এবং রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ব্যয়সহ অন্যান্য তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত করতে নির্বাচন কমিশনকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

অন্যান্য

- অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে রাজনৈতিক দলগুলোকে তাদের প্রার্থীদের নির্বাচনী আচরণবিধি মেনে প্রচারণা চালাতে উৎসাহিত করতে হবে।
- সংবাদমাধ্যমে প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়ের ওপর অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করতে হবে।
- নাগরিক সমাজ ও নির্বাচনসংক্রান্ত কাজে অভিজ্ঞ সংস্থাকে প্রার্থীদের নির্বাচনী বিধি লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে।
- প্রার্থী ও ভোটারদের নির্বাচনী আচরণবিধি এবং তা লঙ্ঘনজনিত শাস্তি সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য নির্বাচন কমিশনকে উদ্যোগ নিতে হবে।
- দীর্ঘ মেয়াদে নির্বাচন পদ্ধতি পরিবর্তন করে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতি প্রবর্তন করতে হবে।

মাত্র গতকালই নির্বাচন কমিশন আগামী সংসদ নির্বাচন 'অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ, গ্রহণযোগ্য ও অংশগ্রহণমূলক' করার ক্ষেত্রে ১৪টি চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করে তাদের করণীয় বিষয়ে একটি রোডম্যাপ ঘোষণা করেছে।[৩] এ উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলনে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে খোলাখুলি স্বীকার করা হয়েছে যে ইসি অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন এবং আস্থাশীলতার ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে। দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ, গ্রহণযোগ্য ও অংশগ্রহণমূলক করতে তারা যেসব চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করেছে, তা এই প্রবন্ধে আলোচিত চ্যালেঞ্জগুলো থেকে ভিন্নতর কিছু নয়। নির্বাচন অনুষ্ঠানের আগেই এসব চ্যালেঞ্জ উত্তরণে ইসি কতটুকু সফলতা লাভ করে, সেটাই মূল বিষয়। টিআইবি মনে করে, ইসির এই চ্যালেঞ্জ চিহ্নিতকরণ সময়োপযোগী, তবে চ্যালেঞ্জ উত্তরণে সব অংশীজন, বিশেষ করে সরকারের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ নির্ণায়ক ভূমিকা।

যে উপলক্ষে এই সংবাদ সম্মেলন আহ্বান করা হয়েছে, সেই আন্তর্জাতিক গণতন্ত্র দিবসের অন্যতম প্রতিপাদ্য হলো গণতান্ত্রিক নীতিগুলো ঊর্ধ্বে তুলে ধরা। অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ, গ্রহণযোগ্য ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন হলো সেই গণতান্ত্রিক মূলনীতিকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরার একটি অন্যতম উপকরণ। দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন এ ধরনের একটি নির্বাচন বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ নিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হতে যাচ্ছে, যা নিশ্চিত করার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সুশাসনের ধারাবাহিকতা রক্ষায় সংশ্লিষ্ট সব অংশীজনকে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। নিজ নিজ ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করে প্রত্যেক অংশীজনকে জাতীয় নির্বাচন কাঙ্ক্ষিতভাবে অনুষ্ঠিত করে দেশে গণতান্ত্রিক সুশাসনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে।

[৩] আমরা অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন: ইসি। প্রথম আলো (prothomalo.com)

তথ্যসূত্র

Transparency International Bangladesh, 'Bangladesh Election Commission: A Diagnostic Study', 2006.

টিআইবি, 'নির্বাচনী প্রক্রিয়া পর্যালোচনা: স্থগিত নবম সংসদ নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের দিন পর্যন্ত প্রার্থীদের নির্বাচনী বিধি লঙ্ঘনের ওপর একটি বিশ্লেষণ', ২০০৭।

টিআইবি, *জাতীয় সংসদ ও সংসদ সদস্যদের ভূমিকা : জনগণের প্রত্যাশা*, ২০০৮।

টিআইবি, *জাতীয় নির্বাচনে মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় অংশগ্রহণ ও প্রত্যাশা*, ২০১০।

টিআইবি, *নবম সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া নিরীক্ষা*, ২০১০।

টিআইবি, *নবম জাতীয় সংসদের সদস্যদের ইতিবাচক ও নেতিবাচক ভূমিকা পর্যালোচনা*, ২০১২।

টিআইবি, 'বাংলাদেশে নির্বাচনকালীন সরকারব্যবস্থা : প্রক্রিয়া ও কাঠামো প্রস্তাবনা', ২০১৩।

টিআইবি, 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল : বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি', ২০১৪।

টিআইবি, 'জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থার বিশ্লেষণ : বাংলাদেশ', ২০১৪।

টিআইবি, *কার্যকর নির্বাচন কমিশন : অগ্রগতি, চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়*, ২০১৪।

টিআইবি, 'ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ ও চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন নির্বাচন ২০১৫ : প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ', ২০১৫।

টিআইবি, 'রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহারে সুশাসন ও শুদ্ধাচার', ২০১৮।

টিআইবি, 'একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা', ২০১৯।

** প্রবন্ধটি লেখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপদেশনা দিয়েছেন টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান এবং উপদেষ্টা-নির্বাহী পরিচালনা ড. সুমাইয়া খায়ের। এ ছাড়া প্রবন্ধটির সম্পাদকীয় পাঠ ও এর ওপর মতামত দিয়ে একে ঋদ্ধ করেছেন টিআইবির সিনিয়র রিসার্চ ফেলো শাহজাদা এম. আকরাম। তাদের সবার কাছে আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। লেখাটি খুবই স্বল্প সময়ের পরিসরে প্রস্তুতকৃত, এটি কোনো গবেষণা উপস্থাপনা নয়, এটি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পর্কে আলোচনাকে উসকে দেওয়ার জন্য একটি কার্যপত্রের (Keynote Paper) মতো এবং এর সব ভুলত্রুটি সীমাবদ্ধতার জন্য লেখক নিজেই দায়ী।

দ্বিতীয় অধ্যায়
সেবা খাত

সেবা খাতে দুর্নীতি : জাতীয় খানা জরিপ ২০২১*

ফারহানা রহমান, মোহাম্মদ নূরে আলম, মো. সাজেদুল ইসলাম, মো. জুলকারনাইন, মো. নেওয়াজুল মওলা, মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান সাখিদার, কাওসার আহমেদ, মো. নূরুজ্জামান ফরহাদ, মো. মোস্তফা কামাল, মো. সহিদুল ইসলাম, রাবেয়া আক্তার কনিকা ও মো. সাজ্জাদুল করিম

প্রেক্ষাপট

দুর্নীতি উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায়বিচার ও দারিদ্র্য দূরীকরণের পথে অন্যতম প্রধান অন্তরায়। বাংলাদেশে দুর্নীতি গণমাধ্যমসহ সাধারণ জনগণের দৈনন্দিন আলোচনা ও উদ্বেগের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন নীতিমালা ও কৌশলপত্রেও দুর্নীতিকে কার্যকরভাবে প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, আইনের প্রয়োগ ও শাসনব্যবস্থাকে দরিদ্রদের জন্য উপযোগী করে তোলার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০২২-২০২৬,[১] জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০১২, পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ এবং বর্তমান ক্ষমতাসীন দলের ২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে[২] সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে শূন্য সহনশীলতার অঙ্গীকার করা হয়েছে। সরকার জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী আন্তর্জাতিক সনদে অনুস্বাক্ষরের মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধে কতগুলো অঙ্গীকারে সম্মত হয়েছে। এ ছাড়া সরকার সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্র প্রণয়ন, তথ্য অধিকার আইন ও তথ্যদাতা সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করেছে। এসব উদ্যোগ দুর্নীতি হ্রাস করার ক্ষেত্রে সহায়ক পরিবেশ তৈরি করেছে।

রাষ্ট্রীয় ও আর্থসামাজিক কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন পর্যায়ে দুর্নীতি ঘটতে পারে। নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে রাজনীতি, প্রশাসন ও বেসরকারি খাতের প্রভাবশালীদের যোগসাজশে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে বড় অঙ্কের অর্থের অবৈধ লেনদেন ঘটে, যার প্রভাব সামষ্টিক ও ব্যাষ্টিক পরিসরে ব্যাপক। এসব দুর্নীতি দেশের আর্থসামাজিক অবস্থায় সামষ্টিক ও ব্যাষ্টিক উভয় পর্যায়ে ব্যাপকভাবে নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। সাধারণত এসব দুর্নীতিকে বৃহৎ দুর্নীতি হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা

---

* ২০২২ সালের ৩১ আগস্ট ঢাকায় অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ। গবেষণাটি সম্পাদনা করেছেন টিআইবির গবেষণা ও পলিসি বিভাগের সিনিয়র রিসার্চ ফেলো শাহজাদা এম আকরাম এবং মো. মাহফুজুল হক।

১ বিস্তারিত দেখুন, http://plancomm.gov.bd/sites/default/files/files/plancomm.portal.gov.bd/files/68e32f08_13b8_4192_ab9b_abd5a0a62a33/2021-02-03-17-04-ec95e78e452a813808a483b3b22e14a1.pdf

২ বিস্তারিত দেখুন, https://pmo.portal.gov.bd/sites/default/files/files/pmo.portal.gov.bd/page/da1ed2d3_23e9_43a5_9859_50df7de24ee4/writeup_election_manifesto_2018_010921.pdf

হয়। অপরদিকে, সেবাগ্রহণকারীরা বিভিন্ন সংস্থা হতে সেবা গ্রহণকালে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হয়। কোনো সেবা গ্রহণকালে সেবার মূল্যের সাথে ছোট অঙ্কের আর্থিক লেনদেন এ পর্যায়ে এই দুর্নীতির উদাহরণ হিসেবে বলা যায়। এ ধরনের দুর্নীতিকে 'ক্ষুদ্র দুর্নীতি' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়, যা হাজার হাজার সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে এবং রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করে।

টিআইবি সেবা খাতে দুর্নীতির ধরন ও মাত্রা নির্ণয়ে ১৯৯৭ সাল থেকে দুই থেকে তিন বছর অন্তর দুর্নীতিবিষয়ক জাতীয় খানা জরিপ পরিচালনা করছে। বর্তমান খানা জরিপটি এ ধারার নবম জরিপ। ২০২০ সালের ডিসেম্বর থেকে শুরু করে ২০২১ সালের নভেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশের খানাগুলো বিভিন্ন খাত থেকে সেবা নিতে গিয়ে যে দুর্নীতির মুখোমুখি হয়েছে, তা তুলে ধরা হয়েছে এই জরিপের মাধ্যমে। দুর্নীতি মানব উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায়বিচার ও অর্থনৈতিক সমতার অন্তরায়– এ বিষয়ে কোনো সংশয় নেই। সেবা খাতে দুর্নীতির ক্ষেত্রে তা অধিকতর প্রযোজ্য। এই পরিপ্রেক্ষিতে দুর্নীতির ওপর খানাভিত্তিক জরিপ দুর্নীতির প্রকৃতি, ধরন ও মাত্রা নিরূপণ করার মাধ্যমে মানব উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করতে সহায়তা করবে। এই জরিপ বর্তমান সরকার, ক্ষমতাসীন জোট, রাষ্ট্রের দুর্নীতিবিরোধী অঙ্গীকার ও কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে সহায়ক হবে এবং সেবা খাতে দুর্নীতির প্রকৃতি অনুযায়ী যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এ ছাড়া জনগণকে দুর্নীতি বিষয়ে সচেতন করতে এবং এর বিরুদ্ধে সোচ্চার ও উদ্বুদ্ধ হতে এ জরিপ ভূমিকা পালন করবে।

২০১৫ সালে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) ১৬-এর লক্ষ্য ১৬.৫ এ ২০৩০ সালের মধ্যে সব পর্যায়ে দুর্নীতি ও ঘুষ উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কমিয়ে আনার কথা বলা হয়েছে। জাতিসংঘের সদস্যরাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ এ লক্ষ্য অর্জনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। বাংলাদেশে দুর্নীতিবিষয়ক একমাত্র জরিপ হিসেবে টিআইবির এই খানা জরিপে প্রাপ্ত তথ্য সেবা খাতগুলোয় দুর্নীতির হ্রাস বা বৃদ্ধি সম্পর্কে তুলনামূলক একটি চিত্র তুলে ধরে, যা এসডিজির এই অঙ্গীকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারকে সহায়তা করবে।

জরিপের উদ্দেশ্য

জরিপের মূল উদ্দেশ্য বাংলাদেশের খানাগুলোর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিভিন্ন সেবা খাতে দুর্নীতির প্রকৃতি, ধরন ও মাত্রা নিরূপণ করা। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো :

- খানাগুলো সেবামূলক খাত বা প্রতিষ্ঠান থেকে বিভিন্ন ধরনের সেবা গ্রহণে কোনো দুর্নীতির শিকার হয়েছে কি না, তা চিহ্নিত করা;
- খানাগুলো বিভিন্ন খাত, উপখাত ও প্রতিষ্ঠানে সেবা নিতে গিয়ে যে দুর্নীতি বা হয়রানির শিকার হয় তার প্রকৃতি, ধরন ও মাত্রা নিরূপণ করা;

- খানাগুলোর আর্থসামাজিক বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে দুর্নীতির শিকার হওয়ার মাত্রা বিশ্লেষণ করা; এবং
- দুর্নীতি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে দিকনির্দেশনামূলক সুপারিশ প্রদান করা।

জরিপের আওতা

এই জরিপে ব্যবহৃত দুর্নীতির সংজ্ঞা হচ্ছে 'সেবা খাতে ব্যক্তিগত স্বার্থে অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহার'। জরিপে ঘুষ নেওয়া বা ঘুষ দিতে বাধ্য করা ছাড়াও সম্পদ বা অর্থ আত্মসাৎ, প্রতারণা, দায়িত্বে অবহেলা, স্বজনপ্রীতি ও প্রভাব বিস্তার এবং সময়ক্ষেপণসহ বিভিন্ন ধরনের হয়রানিকে দুর্নীতির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জরিপে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানার ক্ষুদ্র দুর্নীতির অভিজ্ঞতা বিবেচনা করা হয়েছে; খানার সদস্যদের কাছ থেকে তাদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দুর্নীতিসংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

এই জরিপে ১৬টি প্রধান সেবা খাতের ওপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এসব খাত নির্বাচনের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও আর্থিক নিরাপত্তা বিধানে বিশেষ অবদানের বিষয় বিবেচনা করা হয়েছে। ২০১৭ সালে টিআইবি পরিচালিত জাতীয় খানা জরিপে যেসব খাত হতে সেবা গ্রহণের হার ন্যূনতম শতকরা ৫ ভাগ ছিল, সেগুলোকে এ জরিপে প্রধান খাত হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এভাবে নির্বাচিত খাতগুলো হচ্ছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, ভূমি, কৃষি, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, বিচারিক প্রক্রিয়া, বিদ্যুৎ, ব্যাংকিং, বিআরটিএ, কর ও শুল্ক, এনজিও, পাসপোর্ট, বিমা ও গ্যাস। এ ছাড়া আরেকটি নতুন খাত হিসেবে জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা এ জরিপে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উপরিউক্ত খাতগুলোর বাইরে অন্যান্য খাত বা প্রতিষ্ঠানে খানার অভিজ্ঞতা চিহ্নিত করার জন্য জরিপের প্রশ্নপত্রে আলাদা একটি অংশ 'অন্যান্য খাত' হিসেবে সংযোজন করা হয়। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, এর মধ্যে রয়েছে মোবাইল ব্যাংকিং, অনলাইন শপিং, ওয়াসা, নির্বাচন কমিশন, ডাক বিভাগ, সমাজসেবা অধিদপ্তর, বিটিসিএল, ডিসি অফিস, ইউএনও অফিস ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান হতে প্রদত্ত সেবা।

জরিপপদ্ধতি ও নমুনায়ন

এই জরিপে সারা দেশে খানা নির্বাচনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রণীত Integrated Multipurpose Sampling Frame (IMPS) ব্যবহার করে তিন পর্যায় বিশিষ্ট স্তরায়িত গুচ্ছ নমুনায়ন (Three Stage Stratified Cluster Sampling) পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে IMPS থেকে ৮টি বিভাগকে গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চল বিভাজনে ১৬টি স্তরের বিবেচনায় প্রতিটির স্তরে নির্দিষ্টসংখ্যক গ্রাম ও মহল্লা মোট ১ হাজার ৩২০টি (গ্রামাঞ্চল-৮৩১টি, শহরাঞ্চল-৪৮৯টি) নির্বাচন করা হয়েছে। তবে জরিপ করতে গিয়ে দেখা যায় কিছু এলাকা সরকার কর্তৃক শহরাঞ্চল ঘোষণা করায় এ সংখ্যা দাঁড়ায় গ্রামাঞ্চলে ৮২০টি ও শহরাঞ্চলে ৫০০টি। প্রতিটি স্তরের গ্রাম ও মহল্লার সংখ্যা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রতিটি স্তরের মোট জনসংখ্যার

square root transformation-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত ভরের আনুপাতিক হারে বের করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রতিটি গ্রাম বা মহল্লাকে ১০০টি খানাসংবলিত এক বা একাধিক গুচ্ছে বিভাজন করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে গুচ্ছগুলো থেকে ১০০ খানাসংবলিত একটি গুচ্ছ দৈবচয়নের মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়েছে। তৃতীয় পর্যায়ে নির্বাচিত গুচ্ছ থেকে নিয়মানুক্রমিক নমুনায়ন পদ্ধতিতে ১২টি খানা চূড়ান্তভাবে জরিপের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। নিচের সূত্রের মাধ্যমে ৫ শতাংশ 'মার্জিন অব এরর (Margin of Error)' বিবেচনায় প্রতিটি স্তরে নমুনার আকার নির্ধারণ করা হয়েছে।

$$n = \frac{p(1-p)z^2 * \text{design effect}}{e^2}$$

এখানে,

n= নমুনার আকার

p= ০.৬৬৫ (২০১৭ সালে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হারের অনুপাত)

z= ১.৯৬ (৯৫% confidence interval এ Sample Variate-এর মান)

e= ৫% (স্তরভিত্তিক Margin of Error)

design effect= ১.৫ (২০১৭ সালে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হারের design effect)

এভাবে নির্ধারিত স্তরপ্রতি নমুনার আকার দাঁড়ায় ৫১৩, যা ১৬টি স্তরের জন্য মোট ৮ হাজার ২০৮। তবে ২০১৭ সালের জরিপের প্রাপ্ত ফলাফলের যথার্থতা ও ত্রুটিসীমা নিশ্চিত করতে ২০২১ সালেও ২০১৭ সালের অনুরূপ জরিপের নমুনার সংখ্যা ১৫ হাজার ৮৪০টি রাখা হয়েছে। প্রতিটি স্তরে নমুনা নির্বাচনের ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলে ৬৩ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ৩৭ শতাংশ খানাকে বিবেচনায় আনা হলেও কিছু এলাকা শহরাঞ্চল হওয়ায় জরিপে প্রাপ্ত নমুনার সংখ্যা দাঁড়ায় গ্রামাঞ্চলে ৯ হাজার ৮৪০ এবং শহরাঞ্চলে ৬ হাজার।

চিত্র ১ : একনজরে নমুনায়ন পদ্ধতি

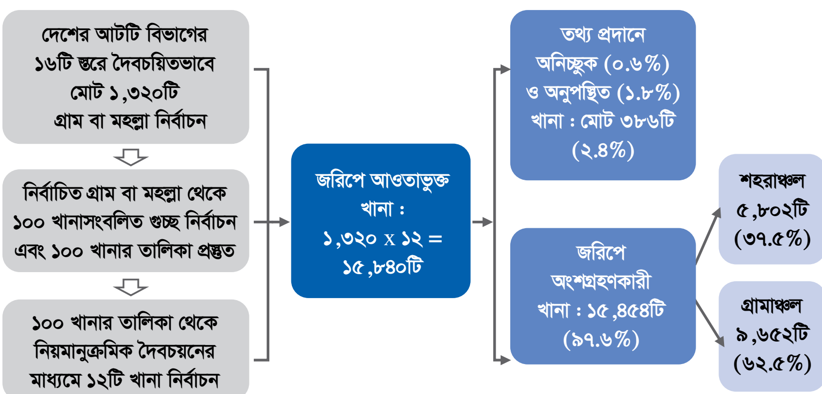

জরিপকালে ৩৮৬টি খানা অনুপস্থিত থাকা (১ দশমিক ৮ শতাংশ) বা উত্তরদানে অস্বীকৃতি জানানোয় (শূন্য দশমিক ৬ শতাংশ) চূড়ান্তভাবে ১৫ হাজার ৪৫৪টি খানায় জরিপ পরিচালনা করা হয়, যা জরিপের আওতাভুক্ত মোট খানার ৯৭ দশমিক ৬ শতাংশ। এসব খানা ৬৪টি জেলাসংশ্লিষ্ট ১ হাজার ৩২০টি পিএসইউতে (Primary Sampling Unit-PSU) বিন্যস্ত (গ্রামাঞ্চলে ৮২০টি, শহরাঞ্চলে ৫০০টি)। আটটি বিভাগের গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলভিত্তিক এ বিভাজনের মাধ্যমে এই জরিপের নমুনায়ন বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্বশীলতা এবং জরিপের সংখ্যাতাত্ত্বিক উৎকর্ষের মানদণ্ড নিশ্চিত করে। এই জরিপের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, এভাবে প্রণীত নমুনা থেকে জরিপের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক যেমন বিগত এক বছরে সার্বিকভাবে দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়া খানার হারের ত্রুটির সীমা (Margin of Error) যথাক্রমে পাওয়া গেছে ± ৩.৩ শতাংশ ও ± ২.৭ শতাংশ।

সারণি ১ : জরিপের অন্তর্ভুক্ত খানার বিভাগভিত্তিক বণ্টন

বিভাগ	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	মোট খানা
ঢাকা	১,৭৪২	১,১৪৫	২,৮৮৭
চট্টগ্রাম	১,৫১৯	৮৬৯	২,৩৮৮
রাজশাহী	১,৩২৮	৭১২	২,০৪০
খুলনা	১,১৮২	৭৩৯	১,৯২১
বরিশাল	৮২৬	৪৮০	১,৩৪২
রংপুর	১,১৯২	৭৪৬	১,৯৩৮
সিলেট	৮৪৫	৪৯৪	১,৩৩৯
ময়মনসিংহ	৯৮২	৬১৭	১,৫৯৯
মোট খানা	**৯,৬৫২**	**৫,৮০২**	**১৫,৪৫৪**

জরিপের সময়কাল

এই খানা জরিপের তথ্য সংগ্রহ ২০২১ সালের ১৩ ডিসেম্বর থেকে ৮ মার্চ ২০২২ পর্যন্ত সময়ে ৬৪টি জেলায় পরিচালিত হয়। নির্বাচিত খানাগুলো ২০২০ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০২১ সালের নভেম্বর পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন সেবা খাতে সেবা গ্রহণের সময় যেসব দুর্নীতি ও হয়রানির সম্মুখীন হয়েছে তার ওপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রতিটি খানায় একটি কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নমালার মাধ্যমে প্রধানত খানাপ্রধানের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। খানাপ্রধান বৃদ্ধ হলে তথ্য প্রদানে সক্ষম খানার অন্য একজন প্রাপ্তবয়স্ক সদস্য যিনি খানার সার্বিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ধারণা রাখেন বা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের সাথে জড়িত তার সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনে তিনবার পর্যন্ত একটি খানা পরিদর্শন করা হয়েছে।

জরিপের তথ্য বিশ্লেষণ টিআইবির নিজস্ব গবেষণা দলের দ্বারা সম্পন্ন করা হয়েছে। জরিপের বৈজ্ঞানিক মান নিশ্চিত করতে বিভিন্ন পর্যায়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আটজন বিশেষজ্ঞের সার্বিক সহায়তা ও পরামর্শ গ্রহণ করা হয়েছে।[৩]

খানার আর্থসামাজিক বৈশিষ্ট্য

এই জরিপে নমুনা হিসেবে খানাগুলোকে এমনভাবে নেওয়া হয়েছে যাতে করে এই নমুনায়ন বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করে। জরিপে দেখা যায়, নারী-পুরুষের শতকরা হার যথাক্রমে ৪৯ দশমিক ৭৭ শতাংশ, ৫০ দশমিক ২১ শতাংশ এবং তৃতীয় লিঙ্গ রয়েছে শূন্য দশমিক ০২ শতাংশ সদস্য। জরিপকৃত খানার গড় সদস্যসংখ্যা ৪ দশমিক ৫৫ জন।[৪] এ জরিপে অংশগ্রহণকারী খানা প্রধানের ৮৯ শতাংশ ইসলাম ধর্মাবলম্বী, ৯ দশমিক ১ শতাংশ হিন্দু ধর্মাবলম্বী এবং ১ দশমিক ৯ শতাংশ অন্যান্য (বিশেষ করে, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান) ধর্মাবলম্বী। জরিপে ৯৭ দশমিক ৫ শতাংশ খানাপ্রধান বাঙালি এবং ২ দশমিক ৫ শতাংশ খানাপ্রধান অন্যান্য নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।[৫]

জরিপে ১৭ দশমিক ১ শতাংশ খানাপ্রধানের পেশা ক্ষুদ্র ব্যবসা, ১৩ দশমিক ৯ শতাংশ খানাপ্রধানের পেশা বেসরকারি চাকরি, ১০ দশমিক ৪ শতাংশ কৃষিকর্ম বা মৎস্য চাষ এবং ৯ দশমিক ৭ শতাংশ খানাপ্রধান দিনমজুর বা খেতমজুর। এ ছাড়া ৩ দশমিক ২ শতাংশ খানাপ্রধানের পেশা সরকারি চাকরি, ১ দশমিক ১ শতাংশ শিক্ষকতা এবং শূন্য দশমিক ৫ শতাংশ বিভিন্ন পেশাজীবী (আইনজীবী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি)। জরিপকৃত খানার গড় মাসিক আয় ২৫ হাজার ১৮৭ টাকা এবং ব্যয় ২২ হাজার ৫৫ টাকা।[৬] গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলের গড় মাসিক আয় যথাক্রমে ২০ হাজার ২৯ টাকা ও ২৭ হাজার ৯২৮ টাকা এবং গড় ব্যয় যথাক্রমে ১৭ হাজার ১৮৬ টাকা ও ২৪ হাজার ৬৪৪ টাকা। জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য বাংলাদেশের জনমিতি ও আর্থসামাজিক অবস্থার তথ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

---

[৩] বিশেষজ্ঞ দলের সদস্য ছিলেন অধ্যাপক কাজী সালেহ আহমেদ, অধ্যাপক সেকান্দার হায়াত খান, অধ্যাপক পি কে মতিউর রহমান, অধ্যাপক সালাউদ্দিন এম আমিনুজ্জামান, অধ্যাপক মোহাম্মদ শোয়ায়েব, অধ্যাপক সৈয়দ শাহাদৎ হোসেন, অধ্যাপক এ. কে. এনামুল হক এবং অধ্যাপক নিয়াজ আহমেদ খান।

[৪] জাতীয়ভাবে নারী, পুরুষ এবং তৃতীয় লিঙ্গের শতকরা হার যথাক্রমে ৫০ দশমিক ৫ শতাংশ, ৪৯ দশমিক ৪৯ শতাংশ ও শূন্য দশমিক ০১ শতাংশ এবং গড় সদস্যসংখ্যা ৪ দশমিক ০৩ জন, জনশুমারি ও গৃহগণনা প্রতিবেদন, ২৭ জুলাই, ২০২২, বিবিএস।

[৫] জাতীয়ভাবে খানার ৯৯ দশমিক শূন্য এক শতাংশ বাঙালি এবং শূন্য দশমিক ৯৯ শতাংশ অন্যান্য নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী, জনশুমারি ও গৃহগণনা প্রতিবেদন, ২৭ জুলাই, ২০২২, বিবিএস।

[৬] আয়-ব্যয় খানা জরিপ (HIES) ২০১৬ অনুযায়ী জরিপকৃত খানাগুলোর মাসিক আয় ১৫ হাজার ৯৪৫ টাকা (ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত মূল্যস্ফিতি সমন্বয় করে ২০ হাজার ৯৯২ টাকা এবং খানাগুলোর মাসিক ব্যয় ১৫ হাজার ৭১৫ টাকা (ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত মূল্যস্ফীতি সমন্বয় করে ২০ হাজার ৬৮৯ টাকা)। বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিস্টিকস (বিবিএস); বিস্তারিত: http://hies.bbs.gov.bd/content/files/HIES%20Preliminary%20Report%202016.pdf

সেবা খাতে দুর্নীতির সার্বিক চিত্র

২০২১ সালের খানা জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানাগুলোর ৯৯ দশমিক ৫ শতাংশ কোনো না কোনো খাত থেকে সেবা নিয়েছে এবং সেবাগ্রহণকারী খানার ৭০ দশমিক ৯ শতাংশ সেবা নিতে গিয়ে কোনো না কোনো দুর্নীতির শিকার হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার কাছ থেকে সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর দুর্নীতির শিকার হওয়ার মাত্রা ছিল সর্বাধিক (৭৪ দশমিক ৪ শতাংশ), যার পরের অবস্থানে রয়েছে পাসপোর্ট (৭০ দশমিক ৫ শতাংশ), বিআরটিএ (৬৮ দশমিক ৩ শতাংশ), বিচারিক সেবা (৫৬ দশমিক ৮ শতাংশ), স্বাস্থ্য (৪৮ দশমিক ৭ শতাংশ), স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (৪৬ দশমিক ৬ শতাংশ) এবং ভূমি (৪৬ দশমিক ৩ শতাংশ)।

চিত্র ২ : বিভিন্ন খাতে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)

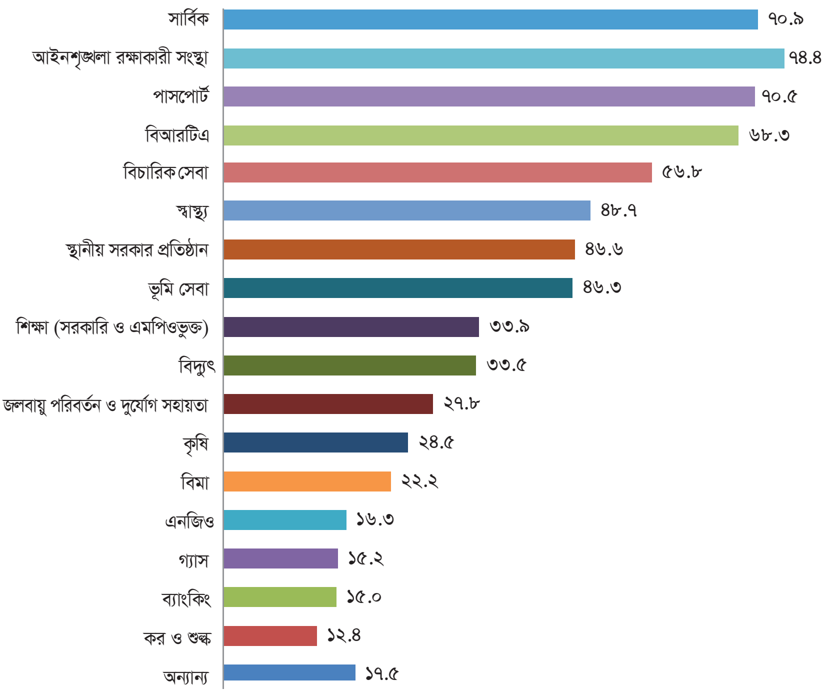

দুর্নীতির ধরন

সেবা নিতে গিয়ে খানাগুলোকে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হতে হয়। জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানার ৪০ দশমিক ১ শতাংশ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে বাধ্য হয়েছে। এ ছাড়া খানাগুলো দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দায়িত্ব পালনে অবহেলা (৫৫ দশমিক ৫ শতাংশ) এবং অসদাচরণ ও বিভিন্ন ধরনের হয়রানির শিকার (২৩ দশমিক ৪ শতাংশ) হয় (চিত্র ৩)।

চিত্র ৩ : সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার*(%)

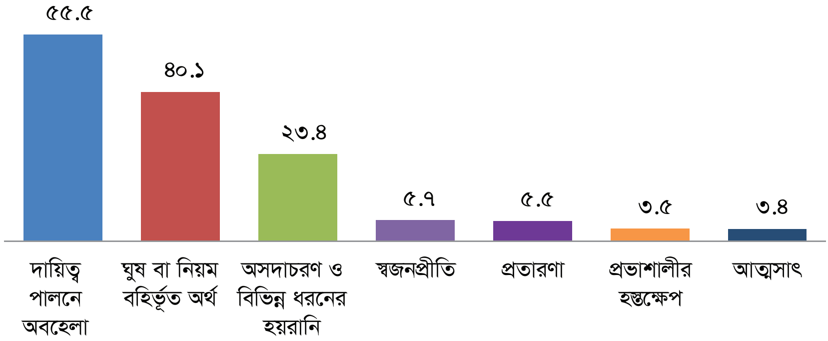

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য।

ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ

বাংলাদেশে সেবা খাতে সংঘটিত দুর্নীতিগুলোর মধ্যে নিয়মবহির্ভূতভাবে অর্থ দেওয়া অন্যতম। দেখা যায় সার্বিকভাবে সেবা খাতগুলো থেকে সেবা নেওয়া খানাগুলোর ৪০ দশমিক ১ শতাংশ নিয়মবহির্ভূতভাবে অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে (সারণি ২)। জরিপে অংশগ্রহণকারী খানাগুলো সেবা নিতে গিয়ে সর্বাধিক হারে (৫৫ দশমিক ৮ শতাংশ) ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে পাসপোর্ট খাতে। এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে আছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা এবং বিআরটিএ, যেখানে সেবাগ্রহীতা খানার যথাক্রমে ৫৫ দশমিক ৭ শতাংশ ও ৫০ দশমিক ২ শতাংশ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূতভাবে অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে। অপরদিকে এনজিও, ব্যাংকিং ও দুর্যোগ সহায়তা খাতে সেবা গ্রহণকারী খানাগুলো তুলনামূলক কম হারে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে।

সারণি ২ : বিভিন্ন সেবা খাতে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের হার (%) ও পরিমাণ (টাকা)

ক্রমিক নং	খাত	ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের শিকার খানা (%)	গড় ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ (টাকা)
	সার্বিক	**৪০.১**	**৬,৬৩৬**
১	পাসপোর্ট	৫৫.৮	৫,০৫৫
২	আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৫৫.৭	৬,৬৯৮
৩	বিআরটিএ	৫০.২	৫,১৪৭
৪	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	৩৩.৫	১,০১২
৫	ভূমি সেবা	৩১.৫	৭,২৭১

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন...

...পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পরের অংশ

ক্রমিক নং	খাত	ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের শিকার খানা (%)	গড় ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ (টাকা)
৬	বিচারিক সেবা	২৩.৭	১৯,০৯৬
৭	শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	১৬.৯	৭০২
৮	কর ও শুল্ক	১০.৪	৪,৭৮৮
৯	বিদ্যুৎ	৭.৯	৩,২৮৬
১০	গ্যাস	৬.৪	১১,৭১০*
১১	স্বাস্থ্য (সরকারি)	৬.২	৬৮০
১২	বিমা	৫.৫	২১,৭৬৫
১৩	কৃষি	৪.৯	২৬৬
১৪	জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা	২.২	১,৩৬৫
১৫	ব্যাংকিং	১.০	৪,৬৬০
১৬	এনজিও	০.৪	১,৮৭৯
১৭	অন্যান্য	৪.২	২,৭১১

*সীমিত উপাত্তের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

জরিপের বিবেচ্য সময়ে সেবাগ্রহীতা খানাগুলোকে সার্বিকভাবে বিভিন্ন সেবা গ্রহণের সময় গড়ে ৬ হাজার ৬৩৬ টাকা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূতভাবে অর্থ দিতে হয়েছে। এর পরিমাণ বিমা সেবার খাতে সবচেয়ে বেশি, যেখানে সেবাগ্রহীতা খানাকে গড়ে ২১ হাজার ৭৬৫ টাকা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে। এর পরে আছে বিচারিক সেবা ও গ্যাস সেবা, যেখানে সেবাগ্রহীতা খানাগুলো গড়ে যথাক্রমে ১৯ হাজার ৯৬ টাকা ও ১১ হাজার ৭১০ টাকা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূতভাবে দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে। অন্যদিকে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ সেবা খাতে খানাগুলো যথাক্রমে গড়ে ৭০২ ও ৬৮০ টাকা নিয়মবহির্ভূতভাবে দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে (সারণি ২)। জরিপের তথ্য অনুযায়ী সেবা খাতে মাথাপিছু প্রাক্কলিত গড় ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ বার্ষিক ৬৭১ টাকা।

ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ

বিভিন্ন সেবা নিতে গিয়ে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূতভাবে অর্থ দেওয়ার কারণ হিসেবে সেবাগ্রহীতা খানাগুলো এক বা একাধিক কারণ উল্লেখ করেছে। জরিপে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ৭২ দশমিক ১ শতাংশ খানা 'ঘুষ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না' উল্লেখ করেছে। এ ছাড়া ৫৯ দশমিক ২ শতাংশ

খানা হয়রানি বা ঝামেলা এড়ানো, ৪৪ দশমিক ৬ শতাংশ খানা নির্ধারিত সময়ে সেবা পাওয়ার জন্য এবং ৩৯ দশমিক ৯ শতাংশ খানা নির্ধারিত ফি জানা না থাকায় ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে (চিত্র ৪)।

চিত্র ৪ : ঘুষের শিকার হওয়া খানার ঘুষ দেওয়ার কারণ* (%)

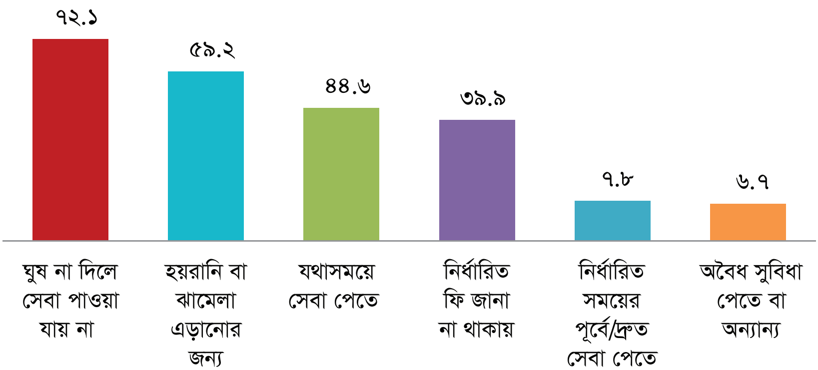

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য।

জাতীয় পর্যায়ে প্রাক্কলিত নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ

২০২২ সালের জনশুমারি ও গৃহগণনা প্রতিবেদনের তথ্যের ভিত্তিতে ২০২১ সালের নভেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশে প্রাক্কলিত মোট খানার সংখ্যা ৪ দশমিক ০৭ কোটি। এই হিসাবে ডিসেম্বর ২০২০ থেকে নভেম্বর ২০২১ সময়কালে জাতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশের খানাগুলো বিভিন্ন সেবা খাতে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূতভাবে যে অর্থ দিয়েছে তার প্রাক্কলিত পরিমাণ ১০ হাজার ৮৩০ দশমিক ১ কোটি টাকা (সারণি ৩)। উল্লেখ্য, ২০২১ সালের এই পরিমাণ ২০১৭ সালের চেয়ে তুলনাযোগ্য খাতের ভিত্তিতে ১৩৩ দশমিক ২ কোটি টাকা (১ দশমিক ২ শতাংশ) বেশি। জাতীয় পর্যায়ে ২০২১ সালে বাংলাদেশের খানাগুলোর প্রাক্কলিত মোট ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের এই পরিমাণ চলতি বাজারমূল্যে ২০২০-২১ অর্থবছরের জিডিপির[৭] শূন্য দশমিক ৪ শতাংশ এবং জাতীয় বাজেটের[৮] ৫ দশমিক ৯ শতাংশ। উল্লেখ্য, প্রাক্কলিত নিয়মবহির্ভূত অর্থের মোট পরিমাণ শুধু জরিপে অন্তর্ভুক্ত খাতের বিবেচনায় করা হয়েছে, অর্থাৎ এটি বাংলাদেশের সব সেবা খাতের ভিত্তিতে প্রাক্কলিত নয়।

[৭] চলতি বাজারমূল্যে ২০২০-২১ অর্থবছরের জিডিপির আকার ৩০ লাখ ৮৭ হাজার ৩০০ কোটি টাকা (সূত্র: জাতীয় বাজেট ২০২১-২২)।

[৮] ২০২০-২১ অর্থবছরে জাতীয় বাজেট (সংশোধিত) ১ লাখ ৮৩ হাজার ৪৬৬ কোটি টাকা।

সারণি ৩ : জাতীয় পর্যায়ে প্রাক্কলিত ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের মোট পরিমাণ (কোটি টাকা)

সেবা খাত	জাতীয় পর্যায়ে প্রাক্কলিত মোট ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ (কোটি টাকা)	জাতীয় পর্যায়ে প্রাক্কলিত মোট ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ (কোটি টাকা)
	২০১৭	২০২১
বিচারিক সেবা	১,২৪১.৯	১,৬০৮.৯
আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	২,১৬৬.৯	১,৪৮৮.৮
ভূমি	২,৫১২.৯	১,৩৩৬.৮
বিমা	৫০৯.৯	৯৩২.৫
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	৩৩৮.৭	৭৫৬.৪
পাসপোর্ট	৪৫১.৬	৬৮৪.৪
বিআরটিএ	৭১০.২	৬৪০.৪
বিদ্যুৎ	৯১৪.১	৫২০.৩
গ্যাস	৫২৮.১	৪২০.২
শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	৪৫৫.২	২২৮.১
স্বাস্থ্য	১৬০.২	১৯২.১
ব্যাংকিং	১১২.৯	৯৬.১
কর ও শুল্ক	১২৩.৮	৯২.১
এনজিও	৩৬.৪	২৪.০
জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা	-	৮.০
কৃষি	৫১.০	৪.০
অন্যান্য	৩৭৫.১	১,৭৯৭.০
মোট প্রাক্কলিত ঘুষের পরিমাণ	**১০,৬৮৮.৯**	**১০,৮৩০.১**

দুর্নীতি ও অনিয়ম : অবস্থান, খানাপ্রধানের শিক্ষাগত যোগ্যতা, আয়-ব্যয়ের শ্রেণি ও লিঙ্গভেদে পার্থক্য

জরিপে দেখা যায়, গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলের খানাগুলোর সেবা খাত থেকে দুর্নীতির শিকার হওয়ার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কোনো তারতম্য নেই। গ্রামাঞ্চলে দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার ৭১ দশমিক ২ শতাংশ, যেখানে শহরাঞ্চলে এ হার ৭০ দশমিক ৭ শতাংশ। তবে সেবা খাত থেকে ঘুষের শিকার হওয়ার ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলের খানার হার শহরাঞ্চলের তুলনায় বেশি। ঘুষ দেওয়ার ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলের খানাগুলোর ৪৬ দশমিক ৫ শতাংশ সেবা খাতে ঘুষ দিয়েছে, অন্যদিকে শহরাঞ্চলে এ হার ৩৬ দশমিক ৬ শতাংশ।

খানাপ্রধানের শিক্ষাগত যোগ্যতাভেদে দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়ার হারে উল্লেখযোগ্য তারতম্য লক্ষ করা যায় না। অপরদিকে যেসব খানার খানাপ্রধানের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই, কিন্তু পড়তে ও লিখতে পারে, সেই সব খানার দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়ার হার যথাক্রমে ৮০ দশমিক ৮ শতাংশ ও ৪৪ দশমিক ৪ শতাংশ এবং স্নাতকোত্তর বা সমমান খানাপ্রধানের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৭৬ দশমিক ৪ শতাংশ ও ৩৮ দশমিক ২ শতাংশ (চিত্র ৫)।

চিত্র ৫: খানাপ্রধানের শিক্ষাগত যোগ্যতাভেদে দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়া খানার হার* (%)

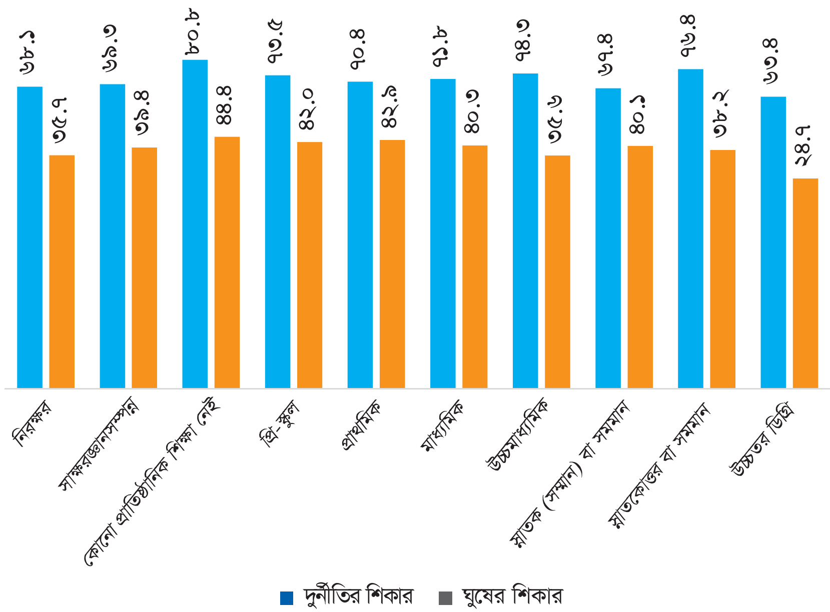

*'z-test' অনুযায়ী খানাপ্রধানের শিক্ষাগত যোগ্যতাভেদে খানার দুর্নীতি ও ঘুষের মাত্রায় উল্লেখযোগ্য তারতম্য লক্ষ করা যায় না।

তবে খানাপ্রধানের পেশার ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়ার হারে কিছুটা তারতম্য লক্ষণীয়। সরকারি চাকরিজীবী এবং বিভিন্ন পেশাজীবীদের (আইনজীবী, ডাক্তার, প্রকৌশলী, ইত্যাদি) তুলনায় অন্যান্য পেশার খানার দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়ার হার বেশি। জরিপে যেসব খানাপ্রধান পেশাজীবী ও সরকারি চাকরি চাকরিজীবী, সেই সব খানার দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার যথাক্রমে ৪৮ দশমিক ৩ শতাংশ ও ৫১ দশমিক ৩ শতাংশ। এ হার মাঝারি ও বৃহৎ ব্যবসার ক্ষেত্রে ৭৭ শতাংশ, গৃহকর্ম ৭৫ দশমিক ১ শতাংশ, শিক্ষকতা (সরকারি ও বেসরকারি) ৭৪ দশমিক ৭ শতাংশ এবং কৃষিকর্ম/মৎস্য চাষের সাথে জড়িত খানাপ্রধানের ক্ষেত্রে ৭৪ দশমিক ৩ শতাংশ (চিত্র ৬)।

চিত্র ৬ : খানাপ্রধানের পেশাভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার*** (%)

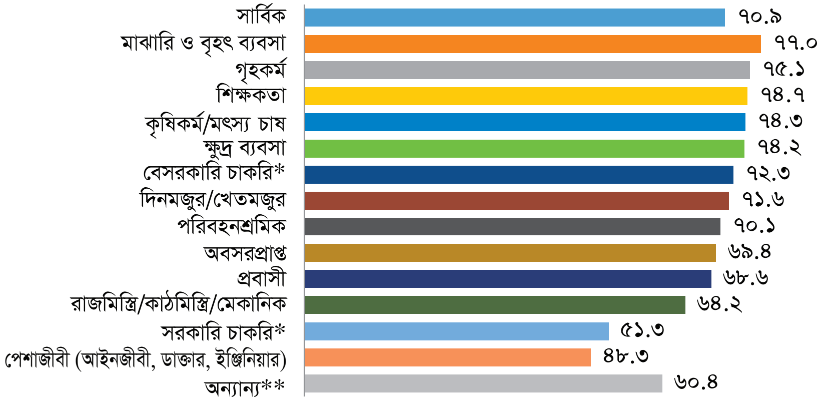

* শিক্ষকতা (সরকারি ও বেসরকারি) ও পেশাজীবী বাদে।
** জেলে, দর্জি, রিকশা-ভ্যানচালক, পল্লিচিকিৎসক, গার্মেন্টসশ্রমিক, নাপিত, স্বর্ণকার, নৈশপ্রহরী ইত্যাদি।
*** 'z-test' অনুযায়ী খানাপ্রধানের পেশাগত যোগ্যতাভেদে খানার দুর্নীতির মাত্রায় উল্লেখযোগ্য তারতম্য লক্ষ করা যায় না।

অনুরূপভাবে ঘুষের শিকার খানার হারের ক্ষেত্রে, যেসব খানাপ্রধান সরকারি চাকরিজীবী বা পেশাজীবী (আইনজীবী, ডাক্তার, প্রকৌশলী, ইত্যাদি) সেই সব খানার তুলনায় পরিবহন শ্রমিক, কৃষিকর্ম/মৎস্য চাষ, ক্ষুদ্র ব্যবসার সাথে জড়িত খানাগুলোর ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার হার বেশি। পেশাজীবী ও সরকারি চাকরিজীবী খানাপ্রধান এমন খানাগুলোর ঘুষের শিকার হওয়ার হার যথাক্রমে ২০ দশমিক ৮ শতাংশ এবং ২৪ দশমিক ৭ শতাংশ, যেখানে এ হার পরিবহনশ্রমিক, কৃষিকর্ম/মৎস্য চাষ ও ক্ষুদ্র ব্যবসার সাথে জড়িত খানাপ্রধানের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৫০ দশমিক ৩ শতাংশ, ৪৭ দশমিক ২ শতাংশ এবং ৪৩ দশমিক ৬ শতাংশ (চিত্র ৭)।

চিত্র ৭ : খানাপ্রধানের পেশাভেদে ঘুষের শিকার হওয়া খানার হার*** (%)

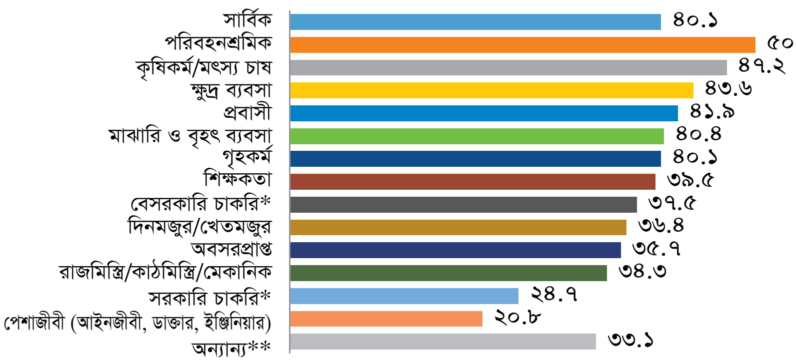

*শিক্ষকতা (সরকারি ও বেসরকারি) ও পেশাজীবী (আইনজীবী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার) বাদে।
**জেলে, দর্জি, রিকশা-ভ্যানচালক, পল্লিচিকিৎসক, গার্মেন্টসশ্রমিক, নাপিত, স্বর্ণকার, নৈশপ্রহরী ইত্যাদি।
***'z-test' অনুযায়ী খানাপ্রধানের পেশাগত যোগ্যতাভেদে খানার ঘুষের মাত্রায় উল্লেখযোগ্য তারতম্য লক্ষ করা যায় না।

খানাপ্রধানের বিভিন্ন ধরনের শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধিতা রয়েছে এ রকম খানার দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়ার হার তুলনামূলক বেশি। জরিপে যেসব খানায় খানাপ্রধানের প্রতিবন্ধিতা রয়েছে, সেই সব খানার দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়ার হার যথাক্রমে ৮০ দশমিক ৩ শতাংশ এবং ৫১ দশমিক ৮ শতাংশ, যা খানাপ্রধানের প্রতিবন্ধিতা নেই এ রকম খানার ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৭০ দশমিক ৬ শতাংশ এবং ৩৯ দশমিক ৮ শতাংশ (চিত্র ৮)।

চিত্র ৮ : খানাপ্রধানের প্রতিবন্ধিতা রয়েছে এমন খানার দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়ার হার* (%)

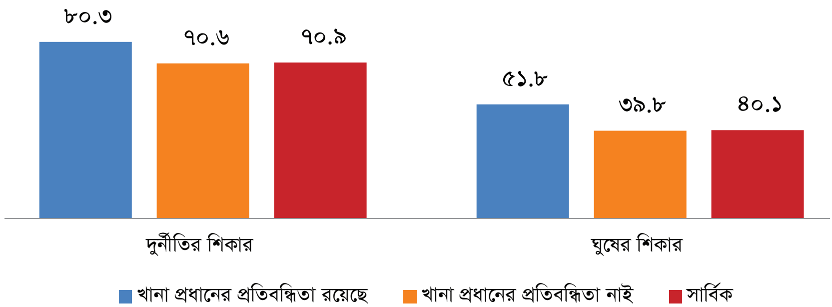

*'z-test' অনুযায়ী যেসব খানাপ্রধানের প্রতিবন্ধিতা রয়েছে, সেসব খানার দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়ার প্রবণতা তুলনামূলকভাবে বেশি।

আয় ও ব্যয়ের বিভিন্ন শ্রেণিভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার তুলনামূলক একই রকম হলেও ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের আপেক্ষিক বোঝা (relative cost of corruption) দরিদ্র খানাগুলোর ওপর বেশি। আটটি ভিন্ন ভিন্ন আয় ও ব্যয় শ্রেণিতে খানাগুলোর ঘুষের পরিমাণ বিশ্লেষণে দেখা যায়, যেসব খানার মাসিক আয় ও ব্যয় ২৪ হাজার টাকার কম, তাদের তুলনায় যেসব খানার মাসিক আয় ও ব্যয় ৮৫ হাজার টাকা বা এর বেশি তাদের ওপর ঘুষের বোঝা কম।

জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানাগুলো গড়ে তাদের বার্ষিক আয় ও ব্যয়ের যথাক্রমে ১ দশমিক ৬ শতাংশ ও ১ দশমিক ৮ শতাংশ অর্থ ঘুষ হিসেবে দেয়। ঘুষ দেওয়ার পরিমাণের ক্ষেত্রে যে খানাগুলোর আয় এবং ব্যয় নিম্ন, তাদের ওপর ঘুষের ভার বা বোঝা তুলনামূলক বেশি (চিত্র ৯ ও ১০)। জরিপের তথ্য অনুযায়ী যেসব খানার মাসিক আয় ও ব্যয় ২৪ হাজার টাকার নিচে, সেই সব খানা বছরে মোট যে পরিমাণ অর্থ ঘুষ হিসেবে দেয় তা তাদের মোট বার্ষিক আয় ও ব্যয়ের যথাক্রমে ২ দশমিক ১ শতাংশ ও ২ দশমিক ২ শতাংশ। অন্যদিকে যেসব খানার মাসিক আয় এবং ব্যয় ৮৫ হাজার টাকার ঊর্ধ্বে, তারা মোট বার্ষিক আয় এবং ব্যয়ের শূন্য দশমিক ৩ শতাংশ ঘুষ বাবদ ব্যয় করেছে।

চিত্র ৯ : আয়ের তুলনায় ঘুষের বোঝা (%)

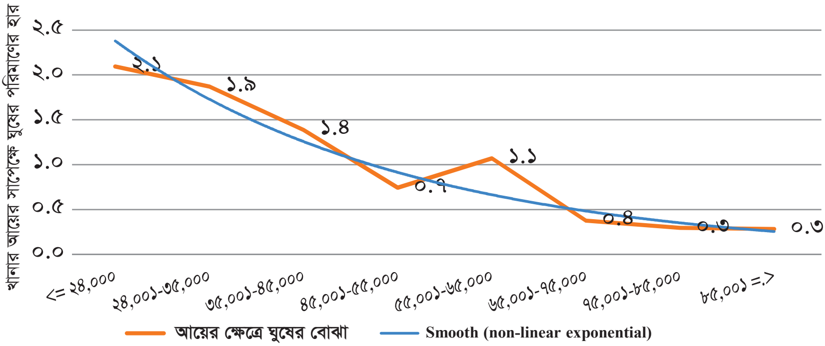

চিত্র ১০ : ব্যয়ের তুলনায় ঘুষের বোঝা (%)

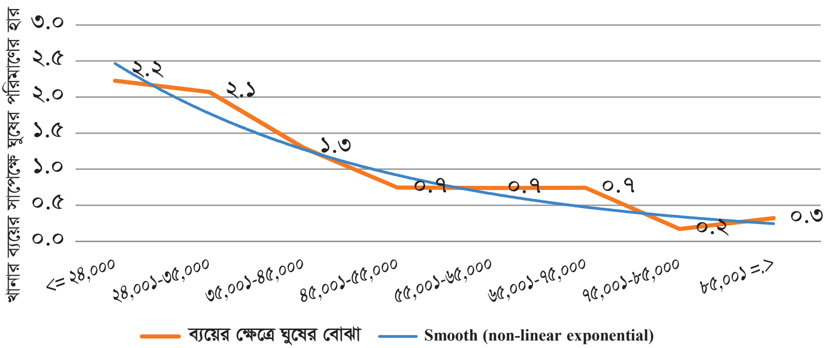

খানার পক্ষে সেবা গ্রহণকারীর লিঙ্গ ও বয়সভেদে দুর্নীতি

দুর্নীতির শিকার ও ঘুষের শিকার হওয়ার ক্ষেত্রে খানাপ্রধানের লিঙ্গভেদে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য পরিলক্ষিত না হলেও দুর্নীতির শিকার হওয়ার ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতার লিঙ্গভেদে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। জরিপে নারীপ্রধান খানার ৭২ দশমিক ৪ শতাংশ দুর্নীতি এবং ৩৯ দশমিক ৪ শতাংশ ঘুষের শিকার হয়, এ হার পুরুষপ্রধান খানার ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৭০ দশমিক ৭ শতাংশ এবং ৪০ দশমিক ২ শতাংশ।

তবে পরিসংখ্যান টেস্টে সেবাগ্রহণকারীর দুর্নীতির শিকার হওয়ার ক্ষেত্রে লিঙ্গভেদে পার্থক্য লক্ষ করা যায় না। জরিপে সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে ৪৭ দশমিক ৩ শতাংশ নারী এবং ৫২ দশমিক ৭ শতাংশ পুরুষ। সার্বিকভাবে নারীদের মধ্যে দুর্নীতির শিকার হয়েছে ৪৩ দশমিক ২ শতাংশ, যেখানে পুরুষদের ৫২ দশমিক ৪ শতাংশ দুর্নীতির শিকার হয়েছে। জরিপে প্রাপ্ত উপাত্তের পরিসংখ্যান টেস্টে দেখা যায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যসেবা ও অন্যান্য খাত থেকে সেবা নিতে গিয়ে পুরুষদের তুলনায় নারীরা বেশি হারে দুর্নীতির শিকার হয়েছে (চিত্র ১১)। তবে সার্বিকভাবে এবং ভূমি ও শিক্ষা খাতে পুরুষ সেবা গ্রহণকারী নারী সেবা গ্রহণকারীর তুলনায় বেশি দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

চিত্র ১১ : খানার পক্ষে সেবা গ্রহণকারী নারী-পুরুষভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার* (%)

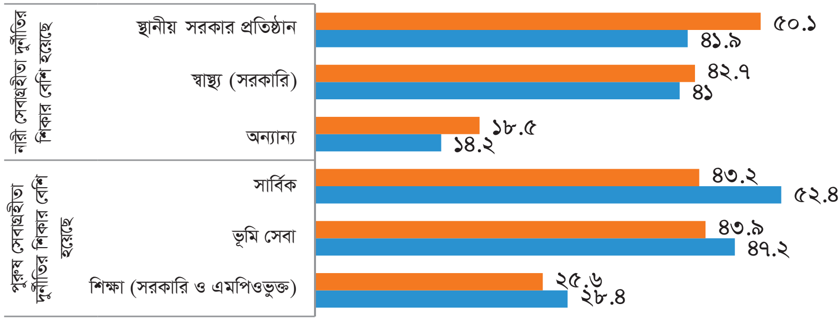

* 'Chi-square test' অনুযায়ী সার্বিকভাবে ও উপরিউক্ত খাতগুলোতে নারী-পুরুষের দুর্নীতির শিকার হওয়ার হারে তারতম্য লক্ষ করা যায়।

'Chi-square test' অনুযায়ী খানার পক্ষে সেবা গ্রহণকারীর বয়সভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়ার ক্ষেত্রে দেখা যায় ১৮-৩৫ বছর বয়সের সেবাগ্রহীতারা অন্যান্য বয়স শ্রেণির তুলনায় কম দুর্নীতির শিকার হয়। ১৮ বছর বা তার কম বয়সের সেবা গ্রহণকারীর ৩০ দশমিক ৩ শতাংশ সেবা নিতে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হয়েছে, এ হার ৫৬-৬৫ বয়সের সেবা গ্রহণকারীর ৫৫ দশমিক ৯ শতাংশ এবং ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের সেবা গ্রহণকারীর ৫০ শতাংশ (চিত্র ১২)।

চিত্র ১২ : খানার পক্ষে সেবা গ্রহণকারীর বয়সভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার* (%)

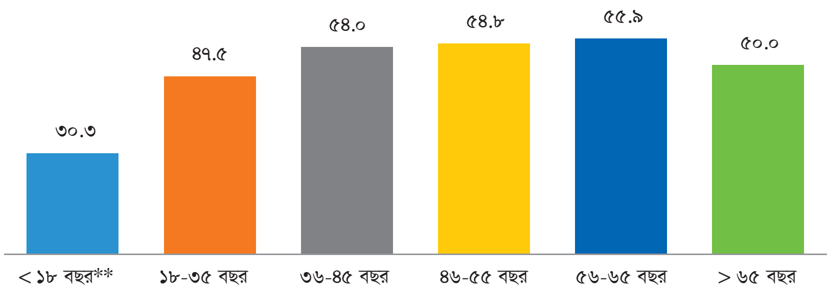

* 'Chi-square test' অনুযায়ী ১৮-৩৫ বছর বয়সের সেবাগ্রহীতারা অন্যান্য বয়স শ্রেণির তুলনায় কম দুর্নীতির শিকার হয়।

** ১৮ বছরের নিচের সেবাগ্রহীতারা (মোট সেবাগ্রহীতার ১৩.৭%) শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে জন্মনিবন্ধন সেবাসহ অন্যান্য সেবা নিয়েছে।

দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার অভিযোগ দায়ের সংশ্লিষ্ট তথ্য

দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার ক্ষেত্রে দেখা যায়, সার্বিকভাবে ৭৯ দশমিক ১৪ শতাংশ খানা কোনো অভিযোগ করেনি, ১৮ দশমিক ৯৪ শতাংশ খানা অভিযোগ করেছে এবং ১ দশমিক ৯২ শতাংশ খানার অভিযোগ গ্রহণ করা হয়নি। যেসব খানা অভিযোগ করেছে, তাদের ৯৭ দশমিক ৫ শতাংশ

খানা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করেছে, শূন্য দশমিক ২ শতাংশ দুদকের কাছে এবং ৩ দশমিক ৫ শতাংশ অন্যান্য ব্যক্তি (চেয়ারম্যান, কাউন্সিলর, সাংবাদিক ইত্যাদি) বা প্রতিষ্ঠানে (থানা, ইউএনও, ডিসি অফিস ইত্যাদি) অভিযোগ করেছেন।[৯] যেসব খানা অভিযোগ করেছে, তাদের অভিযোগ দায়েরের পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত পদক্ষেপের ক্ষেত্রে দেখা যায়, ৭২ দশমিক ৩ শতাংশ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি এবং ১৪ দশমিক ৮ শতাংশ ক্ষেত্রে সমাধান হয়েছে।

অপরদিকে যেসব খানা অভিযোগ করেনি, তারা অভিযোগ দায়ের না করার একাধিক কারণ উল্লেখ করেছে (চিত্র ১৩)। অভিযোগ দায়ের না করার কারণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঝামেলা, হয়রানি ও নেতিবাচক পরিস্থিতির ভয় (৫৫ শতাংশ) এবং সবখানেই দুর্নীতি হয় তাই প্রয়োজন না মনে করা বা সয়ে যাওয়া (৪৯ দশমিক ১ শতাংশ)। এ ছাড়া ৩৮ দশমিক ৮ শতাংশ খানা উল্লেখ করেছে, কীভাবে অভিযোগ করতে হয় জানা নেই।

চিত্র ১৩ : দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার অভিযোগ দায়ের না করার কারণ* (%)

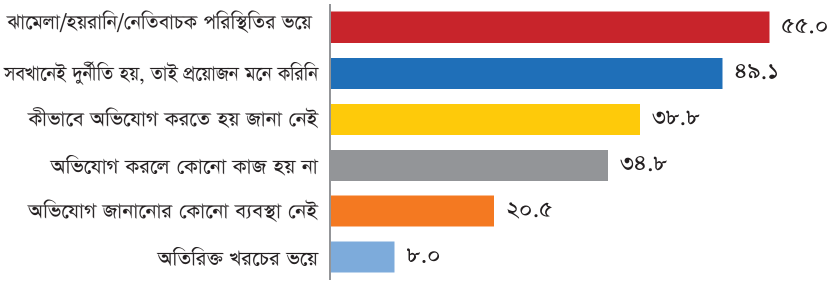

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য।

খাতভেদে দুর্নীতির শিকার খানার হারের তুলনামূলক চিত্র : ২০১৭-২০২১

২০১৭ সালে বিভিন্ন খাত থেকে সেবাগ্রহণকারী খানাগুলোর মধ্যে ৬৬ দশমিক ৫ শতাংশ খানা কোনো না কোনো খাতে দুর্নীতির শিকার হয়, যার মাত্রা ২০২১ সালে দাঁড়িয়েছে ৭০ দশমিক ৮ শতাংশে (সারণি ৪)। ২০২১ সালের জরিপে ব্যবহৃত একই খাত ব্যবহার করে ২০১৭ সালের তথ্য তুলনা করে দেখা যায়, ২০১৭ সালের তুলনায় ২০২১ সালে স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, বিমা, এনজিও এবং ব্যাংকিং সেবায় দুর্নীতি বেড়েছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, পাসপোর্ট, বিআরটিএ, বিচারিক সেবা, ভূমি সেবা, কর ও শুল্ক এবং অন্যান্য সেবায় দুর্নীতির পরিবর্তন উল্লেখযোগ্য নয়, অর্থাৎ একই অবস্থায় আছে। শিক্ষা, বিদ্যুৎ, কৃষি ও গ্যাস সেবায় দুর্নীতি কমেছে। যেসব খাতে দুর্নীতি হ্রাস পেয়েছে তার মধ্যে সর্বনিম্ন পাওয়া গেছে বিদ্যুৎ খাতে (৫ দশমিক ৪ শতাংশ) এবং সর্বোচ্চ পাওয়া গেছে গ্যাস সেবায় (২৩ দশমিক ১ শতাংশ)। পক্ষান্তরে পাঁচটি খাতে ২০১৭ সালের তুলনায় ২০২১ সালে দুর্নীতির পরিমাণ বেড়েছে, যা সর্বনিম্ন ৬ দশমিক ২ শতাংশ (স্বাস্থ্য) থেকে সর্বোচ্চ ১৯ দশমিক ৯ শতাংশ (স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান) পর্যন্ত।

[৯] একাধিক উত্তর প্রযোজ্য।

সারণি ৪ : বিভিন্ন সেবা খাতে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (২০১৭ ও ২০২১-এর জরিপের তুলনা)*

ক্রমিক নং	খাত	দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)	
		২০১৭	২০২১
	সার্বিক	৬৬.৫	৭০.৮
১	আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৭২.৫	৭৪.৪
২	পাসপোর্ট	৬৭.৩	৭০.৫
৩	বিআরটিএ	৬৫.৪	৬৮.৩
৪	বিচারিক সেবা	৬০.৫	৫৬.৮
৫	ভূমি সেবা	৪৪.৯	৪৬.৩
৬	কর ও শুল্ক	১১.১	১২.৪
৭	স্বাস্থ্য (সরকারি)	৪২.৫	৪৮.৭
৮	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	২৬.৭	৪৬.৬
৯	বিমা	১২.৩	২২.২
১০	এনজিও	৫.৪	১৬.৩
১১	ব্যাংকিং	৫.৭	১৫.০
১২	শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	৪২.৯	৩৩.৯
১৩	বিদ্যুৎ	৩৮.৯	৩৩.৫
১৪	কৃষি	৪১.৬	২৪.৫
১৫	গ্যাস	৩৮.৩	১৫.২
১৬	অন্যান্য	২২.০	১৭.৫

* *কোভিড-১৯ থাকার কারণে সেবা ও অনিয়ম দুর্নীতির ধরন পরিবর্তন হয়েছে এবং মানুষের সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে অভ্যাসগত পরিবর্তন হয়েছে। এ কারণে ২০১৭ ও ২০২১-এর তুলনা করার সময় একই খাত ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে **কালো** সংখ্যা দিয়ে 'z-test' অনুযায়ী পরিবর্তন তাৎপর্যপূর্ণ (significant) নয়, **লাল** দিয়ে বৃদ্ধি এবং **সবুজ** দিয়ে হ্রাস বোঝাচ্ছে।*

সার্বিকভাবে ২০১৭ সালে বিভিন্ন খাত থেকে সেবাগ্রহণকারী খানাগুলোর মধ্যে ৪৯ দশমিক ৮ শতাংশ খানা কোনো না কোনো খাতে ঘুষের শিকার হয়, যার মাত্রা ২০২১-তে দাঁড়িয়েছে ৪০ দশমিক ১ শতাংশে (সারণি ৫)। ২০১৭ সালের তুলনায় ২০২১ সালে মোট সাতটি খাতে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়া খানার হার কমেছে, যা সর্বনিম্ন ১ দশমিক ১ শতাংশ (এনজিও) হতে সর্বোচ্চ ২৫ দশমিক ৬ শতাংশ (কৃষি) পর্যন্ত। পক্ষান্তরে এই হার ২০১৭ সালের তুলনায় ২০২১ সালে বৃদ্ধি পেয়েছে এমন খাতের সংখ্যা একটি, যেখানে বৃদ্ধির হার ১৫ দশমিক ২ শতাংশ (স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান)।

সারণি ৫ : বিভিন্ন সেবা খাতে নিয়মবহির্ভূত অর্থ বা ঘুষের শিকার খানার হার (২০১৭ ও ২০২১-এর জরিপের তুলনা)*

ক্রমিক নং	খাত	ঘুষের শিকার হওয়া খানার হার (%)	
		২০১৭	২০২১
	সার্বিক	৪৯.৮	৪০.১
১	পাসপোর্ট	৫৯.৩	৫৫.৮
২	আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৬০.৭	৫৫.৭
৩	বিআরটিএ	৬৩.১	৫০.২
৪	ভূমি সেবা	৩৭.৯	৩১.৫
৫	কর ও শুল্ক	৯.৪	১০.৪
৬	বিমা	৪.৯	৫.৫
৭	ব্যাংকিং	১.১	১.০
৮	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	১৮.৩	৩৩.৫
৯	বিচারিক সেবা	৩২.৮	২৩.৭
১০	শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	৩৪.১	১৬.৯
১১	বিদ্যুৎ	১৮.৬	৭.৯
১২	গ্যাস	১১.৯	৬.৪
১৩	স্বাস্থ্য	১৯.৮	৬.২
১৪	কৃষি	৩০.৫	৪.৯
১৫	এনজিও	১.৫	০.৪
১৬	অন্যান্য	৫.৭	৪.২

* *২০১৭ ও ২০২১-এর তুলনা করার সময় একই খাত ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে 'z-test' অনুযায়ী **কালো** সংখ্যা দিয়ে ২০১৭ সালের সাথে তুলনায় পরিবর্তন তাৎপর্যপূর্ণ (significant) নয়, **লাল** দিয়ে বৃদ্ধি এবং **সবুজ** দিয়ে হ্রাস বোঝাচ্ছে।*

উপসংহার ও সুপারিশ

সেবা খাতে দুর্নীতি ২০২১ জরিপের ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, সার্বিকভাবে ২০১৭ সালের তুলনায় সেবা খাতে দুর্নীতির শিকার খানার হার বৃদ্ধি পেয়েছে (২০২১ সালে যেখানে দুর্নীতির শিকার খানার হার একই খাত বিবেচনায় পাওয়া গেছে ৭০ দশমিক ৮ শতাংশ, ২০১৭ সালে এই হার ছিল ৬৬ দশমিক ৫ শতাংশ)। ২০১৭ সালের তুলনায় ২০২১ সালে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের হার কমেছে কিন্তু ঘুষ আদায়ের পরিমাণ বেড়েছে। অপরদিকে অন্যান্য অনিয়ম-দুর্নীতি বেড়ে যাওয়ায় সার্বিকভাবে সেবা খাতে দুর্নীতি বেড়েছে। বিভিন্ন খাতে ডিজিটালাইজেশন প্রক্রিয়া চলমান থাকলেও কোনো কোনো সেবা খাতে তা পুরোপুরি কার্যকর না হওয়ায় দুর্নীতি একই অবস্থায় রয়েছে (যেমন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, পাসপোর্ট, বিআরটিএ ইত্যাদি) এবং কিছু খাতে বৃদ্ধি পেয়েছে (স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, এনজিও, বিমা ইত্যাদি)। এ ছাড়া ২০১৭ সালের তুলনায় ২০২১ সালে কোনো কোনো খাতে ঘুষের শিকার খানার হার বেড়েছে (স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান) এবং কোনো কোনো খাতে কমেছে (কৃষি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা)।

আর্থসামাজিক অবস্থানভেদে খানার দুর্নীতির শিকার হওয়ার হারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য তারতম্য লক্ষ করা যায়নি, তবে ঘুষের ক্ষেত্রে শহরাঞ্চলের চেয়ে গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী খানার শিকার হওয়ার হার বেশি (৩৬ দশমিক ৬ বনাম ৪৬ দশমিক ৫ শতাংশ)। উচ্চ আয়ের তুলনায় নিম্ন আয়ের খানার ওপর দুর্নীতির বোঝাও অপেক্ষাকৃত বেশি। সেবা নিতে গিয়ে উচ্চ আয়ের তুলনায় নিম্ন আয়ের খানা তাদের বার্ষিক আয়ের অপেক্ষাকৃত বেশি অংশ ঘুষ দিতে বাধ্য হয়। জরিপের ফলাফল বিশ্লেষণে আরও পাওয়া যায়, পুরুষ সেবাগ্রহীতার তুলনায় নারী সেবাগ্রহীতারা কোনো কোনো খাতে বেশি দুর্নীতির শিকার হয়েছেন (স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, অন্যান্য খাত) এবং কোনো কোনো সেবা খাতে নারীদের তুলনায় পুরুষ সেবাগ্রহীতারা বেশি দুর্নীতির শিকার হয়েছেন (শিক্ষা, ভূমি সেবা)। এ ছাড়া ৩৫ বছরের নিচের সেবাগ্রহীতাদের তুলনায় ৩৬ ও এর বেশি বয়সের সেবাগ্রহীতারা অপেক্ষাকৃত বেশি দুর্নীতির শিকার হন।

জরিপে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে নীতিনির্ধারণী এবং প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য নিচের সুপারিশমালা প্রস্তাব করা হচ্ছে–

১. বিভিন্ন সেবা খাতে দুর্নীতির সাথে জড়িত ব্যক্তিদের অবস্থান ও পরিচয়নির্বিশেষে আইনানুগভাবে জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে; এ ক্ষেত্রে বিভাগীয় পদক্ষেপের পাশাপাশি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশনকে (দুদক) সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

২. সেবাগ্রহীতার সাথে সেবাদাতার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হ্রাসে সব সেবা ডিজিটালাইজ করতে হবে। সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানে 'ওয়ান স্টপ' সার্ভিস চালু করতে হবে এবং তার প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

৩. সেবাপ্রদানকারী প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে সেবাপ্রদানকারীদের আচরণগত বিষয়গুলো জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রণয়ন ও কার্যকর করতে হবে।

৪. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সেবাদানের সাথে জড়িত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেশাগত মানদণ্ডের ওপর ভিত্তি করে পুরস্কার ও শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের শুদ্ধাচার পুরস্কার দেওয়া বন্ধ করতে হবে।

৫. সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধির লক্ষ্যে গণশুনানির মতো জনগণের অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম নিশ্চিত করতে হবে।

৬. সংশ্লিষ্ট সেবা খাতে নাগরিক সনদে সেবামূল্য সম্পর্কিত তথ্য হালনাগাদ করতে হবে এবং তা দৃষ্টিগোচর স্থানে স্থাপন করতে হবে। প্রতিষ্ঠানের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম কার্যকর করতে হবে, যেখানে সাধারণ সেবাগ্রহীতার সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকবে।

৭. সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ নিরসন-প্রক্রিয়া (জিআরএস) সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে।

৮. যেসব খাতে জনবল, অবকাঠামো ও লজিস্টিকসের কারণে সেবাদান ব্যাহত হয়, সেসব খাতে বিদ্যমান ঘাটতি দূর করতে হবে।

৯. দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনগণের সচেতনতা ও অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য সামাজিক আন্দোলনের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

১০. দুর্নীতি প্রতিরোধে সব পর্যায়ে রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও তার কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

করোনাভাইরাস সংকট মোকাবিলায় সুশাসন
অন্তর্ভুক্তি ও স্বচ্ছতার চ্যালেঞ্জ*

রাবেয়া আক্তার কনিকা, কাওসার আহমেদ ও মো. জুলকারনাইন

প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশে ২০২০ সালে সংক্রমণের শুরু থেকে সরকার করোনাভাইরাস সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ এবং আক্রান্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করে আসছে। এর মধ্যে বিদেশ থেকে আসা ব্যক্তিদের স্ক্রিনিং ব্যবস্থা, নমুনা পরীক্ষার মাধ্যমে আক্রান্ত ব্যক্তি চিহ্নিত ও আইসোলেশন, সংক্রমণ বিস্তার রোধে চলাচল ও বিভিন্ন কার্যক্রমে বিধি-নিষেধ আরোপ করা, করোনায় আক্রান্ত জটিল রোগীদের চিকিৎসাসেবা প্রদান অন্যতম। বাংলাদেশে সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ, রোগের তীব্রতা ও মৃত্যুর সংখ্যা হ্রাস এবং স্বাভাবিক অর্থনৈতিক অবস্থায় ফিরে আসতে মোট চার ধাপে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে দেশের জনসংখ্যার ৮০ শতাংশ (প্রায় ১৩ দশমিক ৮২ কোটি) মানুষকে টিকাদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।[১] পরবর্তী সময়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রস্তাবিত কৌশল অনুসরণ করে নতুন করে টিকার লক্ষ্যমাত্রা মোট জনসংখ্যার ৭০ শতাংশ (১১ দশমিক ৯২ কোটি) ধরা হয়েছে।[২] বাংলাদেশে ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ থেকে শুরু হওয়া টিকা কার্যক্রম[৩] কয়েকটি এলাকায় বিচ্ছিন্নভাবে সাময়িক সময়ের জন্য বন্ধ থাকলেও[৪] সামগ্রিকভাবে দেশব্যাপী টিকা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এ ছাড়া করোনাভাইরাসের অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবিলায় ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন পেশা-জনগোষ্ঠীর জন্য প্রণোদনা কর্মসূচি[৫] গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে।

মার্চ ২০২০ সালে বাংলাদেশে করোনাভাইরাস সংক্রমণের শুরুর পর থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত সময়ে এই সংকট মোকাবিলায় সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা, এই চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণের উপায় খুঁজে বের করা এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের সাথে অধিপরামর্শমূলক কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে টিআইবি ধারাবাহিকভাবে তিনটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। ওই তিনটি গবেষণায় করোনাভাইরাস মোকাবিলায় প্রস্তুতি, পরিকল্পনা, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে দ্রুত সাড়া প্রদান এবং অনিয়ম-দুর্নীতিসহ সুশাসনের সব সূচকে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়।[৬] করোনাভাইরাস মোকাবিলায় সরকার এ-সংক্রান্ত কার্যক্রমে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ দূর করতে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করলেও জুন ২০২১ পরবর্তী সময়েও দেশের বিভিন্ন প্রবেশপথ বা বন্দরগুলোতে স্ক্রিনিং, নমুনা পরীক্ষা, চিকিৎসাসেবা, কমিউনিটি পর্যায়ে সংক্রমণ

---

* ২০২২ সালের ১২ এপ্রিল ঢাকায় ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ।

প্রতিরোধ, প্রণোদনা প্রদান, টিকা প্রদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে সুশাসনের ঘাটতি-সংক্রান্ত তথ্য গণমাধ্যমে প্রকাশ হতে দেখা গেছে। উল্লিখিত কার্যক্রমে বিদ্যমান সুশাসনের চ্যালেঞ্জ সাধারণ জনগণ, বিশেষ করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কোভিড-১৯ সংশ্লিষ্ট সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বাধা হিসেবে কাজ করছে। এমতাবস্থায় করোনাভাইরাস মোকাবিলায় সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ সুশাসনের, বিশেষ করে অন্তর্ভুক্তি ও স্বচ্ছতার আলোকে পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে চতুর্থ দফা গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য করোনাভাইরাস অতিমারি সৃষ্ট সংকট মোকাবিলায় সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম সুশাসন, বিশেষ করে স্বচ্ছতা ও অন্তর্ভুক্তির আঙ্গিকে পর্যালোচনা করা। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে :

- করোনাভাইরাস মোকাবিলায় গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা;
- কার্যক্রমে বিদ্যমান সুশাসন, বিশেষ করে স্বচ্ছতার ঘাটতি ও ফলাফল উদঘাটন করা;
- কোভিড-১৯ সেবায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তিতে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ উদঘাটন করা এবং
- গবেষণার ফলাফলের আলোকে সুপারিশ প্রণয়ন করা।

গবেষণার পদ্ধতি

এ গবেষণাটি মূলত মিশ্র পদ্ধতিনির্ভর। গুণগত ও পরিমাণগত তথ্য এই গবেষণায় ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে এই গবেষণায় ব্যবহার করা হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহপদ্ধতি ও তথ্যের উৎস

প্রত্যক্ষ তথ্য

প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি হিসেবে কোভিড-১৯ নমুনা পরীক্ষা, চিকিৎসাসেবা, কোভিড-১৯ টিকা গ্রহণ, প্রণোদনা প্রাপ্তি ইত্যাদি সম্পর্কিত বিভিন্ন জরিপ ও সাক্ষাৎকার পরিচালনার মাধ্যমে সেবাগ্রহীতা ও সেবা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ১. জরিপ ২. টিকাকেন্দ্র পর্যবেক্ষণ ৩. প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সদস্যদের সাক্ষাৎকার এবং ৪. মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার।

জরিপ : গবেষণায় সেবাগ্রহীতাদের অভিজ্ঞতা সংগ্রহের জন্য দুটি জরিপ এবং কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের ওপর একটি জরিপ করা হয়েছে (সারণি ১ দ্রষ্টব্য)।

সারণি ১ : গবেষণা জরিপপদ্ধতি ও নমুনায়ন

জরিপ	পদ্ধতি	নমুনা*
কোভিড-১৯ সেবাগ্রহীতার অভিজ্ঞতা জরিপ (নমুনা পরীক্ষা, চিকিৎসাসেবা, টিকা গ্রহণ)	৪৪টি জেলায় কোভিড-১৯ সেবাগ্রহীতার তালিকা প্রণয়ন ও দৈবচয়নের ভিত্তিতে টেলিফোন জরিপ	১,৮৫০ জন (প্রতি জেলায় ৪০-৪৫ জন)
টিকাগ্রহীতার ‘এক্সিট-পোল’ জরিপ	৪৩টি জেলার ১০৫টি টিকাকেন্দ্র থেকে দৈবচয়নের ভিত্তিতে টিকাগ্রহীতার অভিজ্ঞতা জরিপ	অস্থায়ী কেন্দ্র থেকে ৬২২ জন স্থায়ী কেন্দ্র থেকে ৩,৩৯৩ জন
কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা জরিপ	উদ্যোক্তার তালিকা থেকে দৈবচয়নের ভিত্তিতে টেলিফোন জরিপ	৪২৫ জন

টিকাকেন্দ্র পর্যবেক্ষণ : ৪৩টি জেলায় ১০৫টি টিকাকেন্দ্র পর্যবেক্ষণ, যার মধ্যে ৬০টি অস্থায়ী এবং ৪৫টি স্থায়ী টিকাকেন্দ্র।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সদস্যদের সাক্ষাৎকার : ৪৩ জেলার ৪৮টি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ৬৭১ জনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।

মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার : কোভিড-১৯ সংশ্লিষ্ট জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, সাংবাদিক, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।

পরোক্ষ তথ্য

সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য এবং গণমাধ্যমে (প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক) প্রকাশিত প্রতিবেদন সংগ্রহ, যাচাই-বাছাই ও পর্যালোচনা করে এ গবেষণায় ব্যবহার করা হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহের সময়কাল

এই গবেষণায় ব্যবহৃত সব তথ্য আগস্ট ২০২১ থেকে মার্চ ২০২২ পর্যন্ত সময়ে সংগ্রহ করা হয়েছে।

* জরিপের বিষয় বিবেচনায় পরিসংখ্যানের বিভিন্ন নমুনাসূত্র ব্যবহার করে জরিপসমূহের নমুনা নির্ধারণ করা হয়েছে। বিস্তারিত দেখুন, টিআইবি, করোনাভাইরাস সংকট মোকাবিলায় সুশাসন: অন্তর্ভুক্তি ও স্বচ্ছতার চ্যালেঞ্জ, মূল প্রতিবেদন, ১২ এপ্রিল ২০২২, https://www.ti-bangladesh.org/beta3/index.php/en/research-policy/92-diagnostic-study/6441-2022-04-12-04-04-49

গবেষণার পরিধি

আগের গবেষণাগুলোর ধারাবাহিকতায় করোনাভাইরাস এবং এর অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবিলায় গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে নিচের বিষয়ে এই গবেষণায় তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে :

কোভিড-১৯ স্বাস্থ্যসেবাব্যবস্থা : নমুনা পরীক্ষা ও চিকিৎসাব্যবস্থার পরিকল্পনা, কৌশল, উদ্যোগ, অগ্রগতি, সক্ষমতা।

টিকা ব্যবস্থাপনা : টিকা পরিকল্পনা ও কৌশল, অগ্রাধিকার নির্ধারণ, টিকা ক্রয় বা সংগ্রহ, টিকা সংরক্ষণ, পরিবহন, টিকাকেন্দ্র ব্যবস্থাপনা, নিবন্ধন ও টিকা প্রদান।

কোভিড-১৯ মোকাবিলা সংশ্লিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়ন, সরকারি ক্রয় ও সরবরাহ।

করোনাভাইরাসের প্রভাব মোকাবিলায় প্রণোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন।

এই গবেষণায় করোনাভাইরাস মোকাবিলা কার্যক্রমের ক্ষেত্রে এবং টিআইবির দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে গৃহীত কার্যক্রমের সাথে প্রাসঙ্গিক ছয়টি সুশাসনের নির্দেশকের আলোকে গবেষণায় আওতাভুক্ত বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সুশাসনের নির্দেশকগুলো হচ্ছে দ্রুত সাড়াদান, সক্ষমতা ও কার্যকারিতা, অংশগ্রহণ ও সমন্বয়, জবাবদিহি, স্বচ্ছতা এবং অনিয়ম ও দুর্নীতি।

গবেষণার উল্লেখযোগ্য ফলাফল

কোভিড-১৯ মোকাবিলায় ইতিবাচক পদক্ষেপ

সারা বিশ্বে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকার কর্তৃক টিকা রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপের ফলে সেরাম ইনস্টিটিউট বাংলাদেশে টিকা সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। একক উৎসের ওপর নির্ভরতার ফলে ২৬ এপ্রিল, ২০২১ থেকে বাংলাদেশে টিকার প্রথম ডোজ দেওয়া বন্ধ হয়ে যায়।[৭] পরে বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন উৎস থেকে টিকা সংগ্রহের চেষ্টা শুরু করে। দ্বিপক্ষীয় চুক্তির মাধ্যমে চীন থেকে টিকা ক্রয়, কোভ্যাক্স উদ্যোগ থেকে কস্ট শেয়ারিং বা বিনা মূল্যে টিকা সংগ্রহ এবং বিভিন্ন দেশ থেকে প্রাপ্ত অনুদান দিয়ে জুলাই ২০২১ থেকে গণটিকা কার্যক্রম শুরু হয়।[৮] টিকা সংগ্রহে সরকারের তৎপরতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ৩১ মার্চ, ২০২২ পর্যন্ত প্রায় ২৯ দশমিক ৬৪ কোটি ডোজ টিকা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়।[৯] সংগৃহীত টিকা থেকে ৩১ মার্চ, ২০২২ পর্যন্ত প্রায় ১২ দশমিক ৭৭ কোটি মানুষকে প্রথম ডোজ (মোট জনসংখ্যার ৭৪ দশমিক ৯৬ শতাংশ) এবং ১১ দশমিক ২৪ কোটি মানুষকে দ্বিতীয় ডোজ (৬৬ দশমিক শূন্য শতাংশ) টিকার আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে।[১০] ষাটোর্ধ্ব ব্যক্তিদের বুস্টার ডোজ দেওয়া শুরু করা হয় ২৮ ডিসেম্বর, ২০২১ থেকে[১১] এবং এ সময়ের মধ্যে প্রায় ৯৫ লাখ মানুষকে বুস্টার ডোজ টিকার আওতায় নিয়ে আসা হয়।[১২] বিভিন্ন পেশা-জনগোষ্ঠীর মানুষকে টিকার আওতায় নিয়ে আসতে সিটি করপোরেশন, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ, কমিউনিটি ক্লিনিক ইত্যাদি থেকে টিকা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এ ছাড়া ১২ থেকে ১৭ বছর বয়সী স্কুলশিক্ষার্থী, কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থী, বস্তিবাসী ও ভাসমান জনগোষ্ঠীকে টিকার আওতায় আনতে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

কোভিড-১৯ নমুনা পরীক্ষা ও চিকিৎসাব্যবস্থায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

কোভিড-১৯ নমুনা পরীক্ষায় সক্ষমতার ঘাটতি

করোনাভাইরাসের সংক্রমণের দুই বছর অতিক্রান্ত হলেও প্রয়োজনের চেয়ে পরীক্ষাগার স্বল্পতা, পরীক্ষাগারে সক্ষমতার অধিক সেবাগ্রহীতা ও দুর্বল ব্যবস্থাপনার কারণে নমুনা পরীক্ষায় নানাবিধ সমস্যা এখনো বিদ্যমান। সেবাগ্রহীতা জরিপে যারা নমুনা পরীক্ষা করতে গিয়েছিল, তাদের ২৬ দশমিক ১ শতাংশ নমুনা দিতে গিয়ে বহুমুখী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে, যার মধ্যে ৬৮ দশমিক ৬ শতাংশ বলেছেন, নমুনা প্রদানের সময় পরীক্ষাগারগুলোতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা হয়নি। এ ছাড়া নমুনা পরীক্ষায় বিদ্যমান সমস্যাগুলোর মধ্যে রয়েছে নমুনা দিতে গিয়ে দীর্ঘ সময় অপেক্ষার পর ফিরে আসা (১৭ দশমিক ৩ শতাংশ), পরীক্ষাগারে কর্মীদের দুর্ব্যবহার (১৬ দশমিক ৭ শতাংশ), নিজ বাসা থেকে নমুনা দিতে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা (১০ দশমিক ৩ শতাংশ), নমুনা দিতে একাধিকবার কেন্দ্রে যাওয়া (১০ দশমিক ৩ শতাংশ), ভুল প্রতিবেদন দেওয়ার কারণে পুনরায় পরীক্ষা করতে বাধ্য হওয়া (৩ দশমিক ২ শতাংশ) উল্লেখযোগ্য।

চিত্র ১ : নমুনা প্রদানের ক্ষেত্রে সমস্যার ধরন : সেবাগ্রহীতা জরিপ

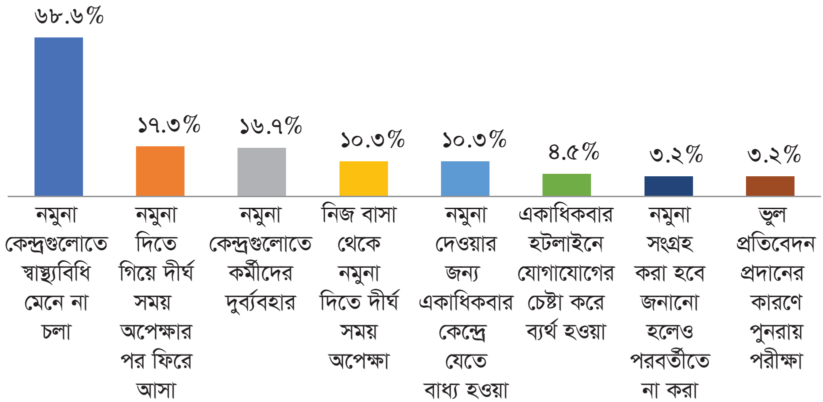

সব জেলায় আরটি-পিসিআর পরীক্ষাগার না থাকার কারণে ওই সব জেলা থেকে নমুনা সংগ্রহ করে অন্য জেলায় পাঠানো হয় বা মানুষ অন্য জেলায় গিয়ে নমুনা পরীক্ষা করে আসে। গবেষণার জরিপে ৪ দশমিক ৮ শতাংশ সেবাগ্রহীতাকে অন্য জেলায় গিয়ে নমুনা প্রদান করতে হয়েছে। ফলে অন্য জেলা থেকে নমুনা পরীক্ষার প্রতিবেদন পেতে অনেক বিলম্ব হয়। জরিপে দেখা যায়, সেবাগ্রহীতাদের কোভিড-১৯ নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট পেতে গড়ে ২ দশমিক ৫ দিন অপেক্ষা করতে হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ নয়দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। এ ছাড়া পরীক্ষাগারে নমুনা দিতে গিয়ে সেবাগ্রহীতাদের গড়ে তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়েছে (সর্বোচ্চ ১০ ঘণ্টা)।

কিছু ক্ষেত্রে নমুনা পরীক্ষায় অনলাইন নিবন্ধনের সুযোগ রাখা হয়েছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে শুধু একটি মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমাদানের সুযোগ রাখার ফলে যাদের এই অ্যাকাউন্ট

নেই, তারা নমুনা পরীক্ষার ফি জমা দিতে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। ভিড় এড়িয়ে দ্রুত ও নির্ভুল প্রতিবেদন পেতে ৯ দশমিক ৭ শতাংশ সেবাগ্রহীতা বিভিন্ন বেসরকারি পরীক্ষাগারে নমুনা পরীক্ষা করিয়েছেন।

অন্য জেলায় গিয়ে এবং বেসরকারি হাসপাতালে নমুনা পরীক্ষা করতে সেবাগ্রহীতাদের ওপর আর্থিক বোঝা তৈরি হয়েছে। নমুনা পরীক্ষায় যাতায়াত বাবদ সেবাগ্রহীতাদের গড়ে ১৪০ টাকা খরচ করতে হয়েছে (সর্বোচ্চ ৩ হাজার টাকা পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে)। যারা সরকারি পরীক্ষাগারে নমুনা পরীক্ষা করিয়েছে, তাদের যাতায়াত, পরীক্ষা ফি ও অন্যান্য খরচ মিলিয়ে গড়ে ৩৯৯ টাকা খরচ করতে হয়েছে। পক্ষান্তরে যারা বেসরকারি পরীক্ষাগারে নমুনা পরীক্ষা করিয়েছে, তাদের গড়ে ৩ হাজার ৩৮১ টাকা খরচ হয়েছে। পরীক্ষাগারের স্বল্পতা, অতিরিক্ত ভিড়, নমুনা প্রদানে জটিলতা, অতিরিক্ত খরচ ইত্যাদি সমস্যা বা চ্যালেঞ্জ কোভিড-১৯ নমুনা পরীক্ষার ক্ষেত্রে মানুষকে, বিশেষ করে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষকে নিরুৎসাহিত করেছে।

কোভিড-১৯ চিকিৎসাব্যবস্থায় সক্ষমতার ঘাটতি

কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসাব্যবস্থায় সক্ষমতার ঘাটতি বিদ্যমান, যা কোভিড-১৯ আক্রান্ত ব্যক্তিদের যথাসময়ে যথাযথ জরুরি সেবাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে। নিজ জেলায় আইসিইউ সুবিধা না থাকায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত জটিল রোগীদের ভিন্ন জেলা থেকে সেবা গ্রহণ করতে হয়েছে। জরিপে দেখা যায়, যারা কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে হাসপাতাল থেকে সেবা গ্রহণ করেছে, তাদের ১৮ দশমিক ৯ শতাংশ সেবাগ্রহীতা অন্য জেলা থেকে চিকিৎসা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে, যা তাদের ওপর অতিরিক্ত খরচের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। সেবাপ্রাপ্তির জন্য জেলার ভেতরে বা বাইরে শুধু যাতায়াত বাবদই সেবাগ্রহীতাদের গড়ে ৩ হাজার ৫৩৫ টাকা খরচ করতে হয়েছে। করোনায় আক্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে যারা বাড়িতে থেকে চিকিৎসা গ্রহণ করেছে, তাদের ৫ দশমিক ৪ শতাংশ সেবাগ্রহীতা জটিলতা থাকা সত্ত্বেও হাসপাতালে শয্যা না পাওয়ায় বাড়িতে থেকে চিকিৎসা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে।

হাসপাতালে পৌঁছানোর পর থেকে শয্যা পেতে সেবাগ্রহীতাদের গড়ে ৩ দশমিক ৫ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়েছে। এ ছাড়া হাসপাতালে ভর্তি হওয়া সেবাগ্রহীতাদের ১৪ দশমিক ১ শতাংশ অনিয়মিতভাবে চিকিৎসকের সেবা পেয়েছে। চিকিৎসার সময়ে জরুরি প্রয়োজনে ১৪ দশমিক ৯ শতাংশ সেবাগ্রহীতার অক্সিজেন পেতে বিলম্ব হয়েছে এবং ১ দশমিক ৭ শতাংশ সেবাগ্রহীতা প্রয়োজন থাকলেও হাসপাতালে চিকিৎসার সময়ে একবারও অক্সিজেন পায়নি। হাসপাতালে ভর্তি হওয়া সেবাগ্রহীতাদের ১৫ শতাংশ প্রয়োজনে তাৎক্ষণিক ভেন্টিলেশন-সুবিধা পায়নি, ১৩ দশমিক ৮ শতাংশ প্রয়োজনে যথাসময়ে আইসিইউ সেবা পায়নি এবং ৯ শতাংশ হাসপাতালে চিকিৎসাকালীন একবারও আইসিইউ সেবা পায়নি। হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণের সময় ২২ দশমিক ২ শতাংশ সেবাগ্রহীতা চিকিৎসাসেবা গ্রহণে বহুমুখী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে, যার মধ্যে প্রয়োজনীয় ওষুধ না পাওয়া (৬৪ দশমিক ৭ শতাংশ), প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সেবা না পাওয়া (৩৩ দশমিক ৩ শতাংশ), ট্রলি, স্ট্রেচার বা হুইলচেয়ার না পাওয়া (৯ দশমিক ৮ শতাংশ), অ্যাম্বুলেন্স সেবা না পাওয়া (৩ দশমিক ৯ শতাংশ) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। সেবাগ্রহণকারীদের মতে, চিকিৎসাসেবার অপ্রতুলতার কারণে যথাসময়ে সেবা না পাওয়ায় হাসপাতাল থেকে সেবা নেওয়া ব্যক্তিদের ৭ দশমিক

৮ শতাংশ ক্ষেত্রে রোগীর মৃত্যু হয়েছে এবং ১১ দশমিক ৮ শতাংশ ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতার রোগের জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

চিত্র ২ : হাসপাতালে কোভিড-১৯ সেবা গ্রহণে সমস্যার ধরন

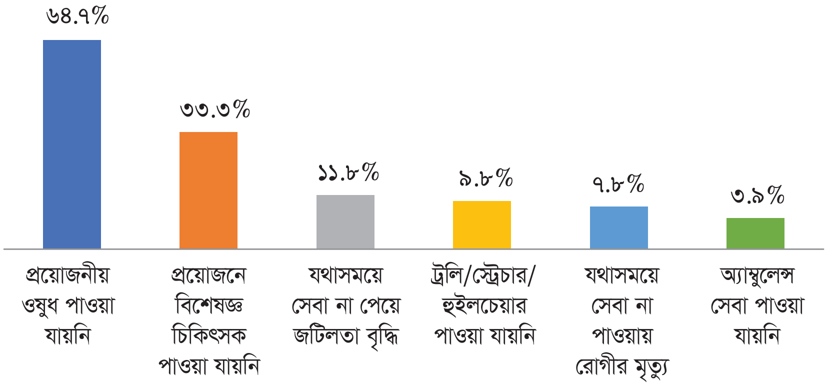

সরকারি হাসপাতালে সেবার অপ্রতুলতার কারণে ও ভালো সেবা পেতে ২৬ দশমিক ৫ শতাংশ সেবাগ্রহীতা বেসরকারি হাসপাতাল থেকে সেবা গ্রহণ করেছে। বেসরকারি হাসপাতাল থেকে সেবা গ্রহণের কারণ হিসেবে তারা যে বিষয়গুলো উল্লেখ করেছে, তার মধ্যে বেসরকারি হাসপাতালে সেবার মান ভালো (৬০ দশমিক ৯ শতাংশ), বেসরকারি হাসপাতালে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক পাওয়া যায় (৪৪ দশমিক ৯ শতাংশ), ডাক্তার বা পরিচিত কোনো ব্যক্তির পরামর্শে (৪২ দশমিক শূন্য শতাংশ), আইসিইউ শয্যা পাওয়ার জন্য (২৯ দশমিক শূন্য শতাংশ), সরকারি হাসপাতালে শয্যা খালি না পাওয়া (২৩ দশমিক ২ শতাংশ) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

তবে বেসরকারি হাসপাতালে সেবা গ্রহণ সেবাগ্রহীতার ওপর অর্থনৈতিক বোঝা তৈরি করেছে। সরকারি হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা গ্রহণে শয্যা, ওষুধ, আইসিইউ, অক্সিজেন এবং অন্যান্য খরচসহ সেবাগ্রহীতা পর্যায়ে মোট গড় চিকিৎসা খরচ যেখানে ৩৫ হাজার ৯৩৮ টাকা, পক্ষান্তরে বেসরকারি হাসপাতাল থেকে চিকিৎসার ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতা পর্যায়ে মোট গড় চিকিৎসা খরচ ৪ লাখ ৫৮ হাজার ৫৩৭ টাকা। জরিপে ৩ দশমিক ৭ শতাংশ সেবাগ্রহীতা আর্থিক সামর্থ্য না থাকায় বাড়ি থেকে চিকিৎসা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে।

কোভিড-১৯ চিকিৎসাসেবা ও নমুনা পরীক্ষার সুবিধা সম্প্রসারণে সাড়া প্রদানে ঘাটতি

করোনাভাইরাস সংক্রমণের দুই বছরে পরীক্ষাগার ও আইসিইউ শয্যার সংখ্যা বৃদ্ধি করা হলেও তা অল্প কিছু জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ। ২০২১ সালের ৩০ জুন মোট আরটি-পিসিআর পরীক্ষাগারের সংখ্যা ছিল ১২৮টি, যা ফেব্রুয়ারি ২০২২–এ বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১৫৮টি। কিন্তু ৩০ জুন, ২০২১ পরবর্তী সময়ে মাত্র একটি জেলায় পরীক্ষাগার সম্প্রসারণ করা হয়। এখনো ৩৪ জেলায় আরটি-পিসিআর পরীক্ষার সুবিধা নেই।

সারণি ২ : পরীক্ষাগার ও আইসিইউ শয্যা সম্প্রসারণে অগ্রগতি

পরীক্ষাগারের সংখ্যা		আইসিইউ শয্যা	
৩০ জুন, ২০২১	১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২২	৩০ জুন, ২০২১	১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২২
আরটি-পিসিআর-১২৮	আরটি-পিসিআর-১৫৮	আইসিইউ-১,১৬৫	আইসিইউ-১,২৫৯
জিন-এক্সপার্ট-৪৭	জিন-এক্সপার্ট-৫৭	২৯টি জেলায় বিদ্যমান	৩৩টি জেলায় বিদ্যমান
র‍্যাপিড এন্টিজেন-৩৯১	র‍্যাপিড এন্টিজেন-৬৫৯		
২৯টি জেলায় আরটি-পিসিআর পরীক্ষার সুবিধা	৩০টি জেলায় আরটি-পিসিআর পরীক্ষার সুবিধা		

অন্যদিকে জুন, ২০২১ পরবর্তী সময়ে আইসিইউ শয্যাসংখ্যা ৯৪টি বৃদ্ধি পেলেও অধিকাংশই শহরকেন্দ্রিক এবং বেসরকারি। বর্তমানে বিদ্যমান আইসিইউ শয্যার মধ্যে ৬১ শতাংশ ঢাকা শহরে অবস্থিত এবং মোট আইসিইউ শয্যার ৩৭ শতাংশ বেসরকারি হাসপাতালে। আইসিইউ শয্যা বৃদ্ধি করা হলেও তা মাত্র চারটি জেলায় সম্প্রসারণ করা হয়েছে। পরীক্ষাগার, আইসিইউ ইত্যাদি অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্প বাজেট ও পরিকল্পনা থাকা সত্ত্বেও বর্তমানে আইসিইউ না থাকা ৩১টি জেলায় আইসিইউ শয্যা সম্প্রসারণ করা হয়নি।

প্রকল্প বাস্তবায়নে উদ্যোগের ঘাটতি

বাংলাদেশ সরকারের কোভিড-১৯ প্রিপেয়ার্ডনেস অ্যান্ড রেসপন্স পরিকল্পনায় প্রতিটি জেলা হাসপাতালে পাঁচটি করে আইসিইউ শয্যা প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করা হয়। এ ছাড়া ২০২০ সালের জুন মাসে সরকার থেকে সব জেলা হাসপাতালে ১০টি করে আইসিইউ শয্যা স্থাপনের ঘোষণা করা হয়। এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ৬ হাজার ৭৮৬ কোটি টাকার *কোভিড-১৯ ইমার্জেন্সি রেসপন্স অ্যান্ড প্যান্ডেমিক প্রিপেয়ার্ডনেস প্রকল্প* গ্রহণ করা হয়।[১৩] এই প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে জেলা পর্যায়ের হাসপাতালগুলোতে আইসিইউ শয্যা, সেন্ট্রাল অক্সিজেন সিস্টেম, নমুনা পরীক্ষাগার স্থাপন, টিকা ও বিভিন্ন চিকিৎসাসামগ্রী ক্রয় করার কথা। কিন্তু প্রায় দুই বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রকল্প বরাদ্দ থাকলেও তা বাস্তবায়ন করা হয়নি। ৩১টি জেলা হাসপাতালে এখনো আইসিইউ শয্যা স্থাপন করা হয়নি। একটি প্রতিবেদনে দেখা যায়, ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত বিশ্বব্যাংকের অনুদানের মাত্র ৬ দশমিক ৭ শতাংশ ব্যয় করা হয়েছে।[১৪] প্রকল্প বরাদ্দ বাস্তবায়ন করতে না পারার কারণ হিসেবে যে বিষয়গুলো উঠে আসে, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কর্তৃপক্ষের উদ্যোগের ঘাটতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব, আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রতা, অবকাঠামোগত জটিলতা এবং পরিকল্পনা গ্রহণের আগে সম্ভাব্যতা যাচাই না করা, দ্বিতীয় ঢেউ নিয়ন্ত্রণে আসার পর প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রমে শৈথিল্য, বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের

মধ্যে সমন্বয়হীনতা, ঠিকাদারদের সক্ষমতার ঘাটতি ও গাফিলতি, তদারকির অভাব এবং আইসিইউ পরিচালনায় দক্ষ জনবলের অভাব।

কোভিড-১৯ চিকিৎসাসেবা ও নমুনা পরীক্ষায় অনিয়ম-দুর্নীতি

কোভিড-১৯ নমুনা পরীক্ষা করাতে গিয়ে ১৫ শতাংশ সেবাগ্রহীতা অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার হয়েছে (চিত্র ৩ দ্রষ্টব্য)। এসব অনিয়ম-দুর্নীতির মধ্যে প্রতিবেদন প্রদানে সময়ক্ষেপণ, নমুনা পরীক্ষার জন্য সুপারিশ জোগাড় করা, নির্ধারিত ফি'র অতিরিক্ত টাকা দেওয়া ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

চিত্র ৩ : নমুনা পরীক্ষায় অনিয়ম-দুর্নীতির ধরন (সেবাগ্রহীতার হার)

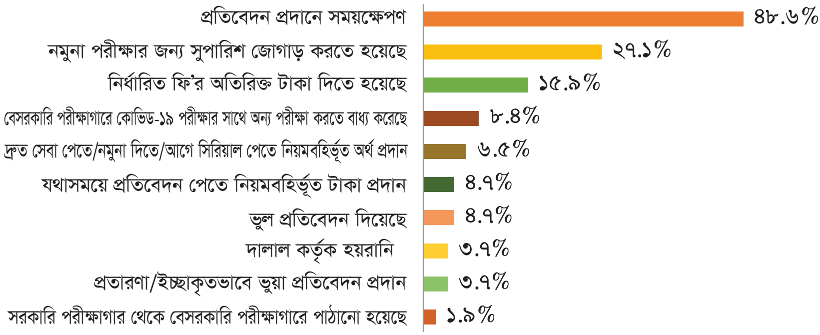

যারা সরকারি পরীক্ষাগারে নমুনা দিতে গেছে, তাদের ১৪ দশমিক ৯ শতাংশ সেবাগ্রহীতাকে নির্ধারিত ফি অপেক্ষা গড়ে ১১৬ টাকা অতিরিক্ত দিতে হয়েছে। যারা বাড়ি থেকে নমুনা দিয়েছে, তাদের গড়ে ৬৪২ টাকা অতিরিক্ত দিতে হয়েছে এবং বেসরকারি হাসপাতালে নমুনা পরীক্ষার ক্ষেত্রে গড়ে ৪ হাজার ৪২৫ টাকা অতিরিক্ত দিতে হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বেসরকারি পরীক্ষাগারে কোভিড-১৯ নমুনা পরীক্ষার সাথে সাথে অন্য পরীক্ষা করতে বাধ্য করা হয়েছে। যথাসময়ে বা দ্রুত প্রতিবেদন পেতে ৪ দশমিক ৪ শতাংশ সেবাগ্রহীতাকে গড়ে ১৩৩ টাকা নিয়মবহির্ভূতভাবে অর্থ প্রদান করতে হয়েছে এবং পরীক্ষাগারে ভিড় এড়াতে, দ্রুত নমুনা দিতে বা আগে সিরিয়াল পেতে ৬ দশমিক ১ শতাংশ সেবাগ্রহীতাকে গড়ে ৬৬ টাকা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে। এ ছাড়া কিছু ক্ষেত্রে প্রবাসীদের বিদেশে যাওয়ার সময় প্রয়োজনীয় নেগেটিভ সার্টিফিকেট পেতে ৫ হাজার থেকে ১০ হাজার টাকা দিতে হয়েছে এবং বিভিন্ন স্থলবন্দর দিয়ে বিদেশ থেকে প্রত্যাগতদের গড়ে ১০০ থেকে ১৫০ টাকায় করোনা নেগেটিভ সার্টিফিকেট নিতে হয়েছে।

হাসপাতাল থেকে সেবা গ্রহণকারীদের ২২ দশমিক ২ শতাংশ বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার হয়। এসব অনিয়ম-দুর্নীতির ধরনের মধ্যে সেবা দিতে সময়ক্ষেপণ, কোভিড ইউনিটে স্বাস্থ্যকর্মীদের অনুপস্থিতি বা দায়িত্ব পালনে অবহেলা, দুর্ব্যবহার বা অসহযোগিতা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য (চিত্র ৪ দ্রষ্টব্য)। বেসরকারি হাসপাতাল থেকে সেবা গ্রহণের সময়ে সেবাগ্রহীতাদের সেবা-সম্পর্কিত তথ্য না দেওয়া, হাসপাতালের কর্মীদের দুর্ব্যবহার, বেসরকারি হাসপাতাল থেকে সেবা গ্রহণে প্ররোচিত করা ইত্যাদি অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার হতে হয়েছে।

চিত্র ৪ : হাসপাতালে কোভিড-১৯ সেবাগ্রহণে অনিয়ম-দুর্নীতির ধরন (সেবাগ্রহীতার হার)

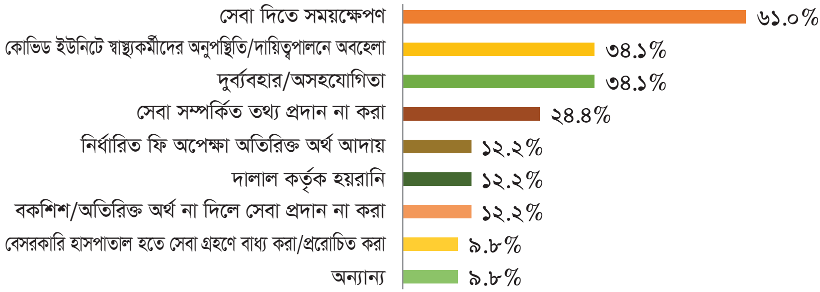

সরকারি হাসপাতাল থেকে কোভিড-১৯ সেবা গ্রহণের সময় ১২ দশমিক ২ শতাংশ সেবাগ্রহীতাকে ৪০০ থেকে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত নিয়মবহির্ভূতভাবে অতিরিক্ত অর্থ দিতে হয়েছে। নমুনা পরীক্ষা ও কোভিড-১৯ চিকিৎসাসেবায় সংঘটিত অনিয়ম-দুর্নীতি মানুষের চিকিৎসা খরচের সাথে অতিরিক্ত আর্থিক বোঝা তৈরি করেছে, যা দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের সেবাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে।

কোভিড-১৯ টিকা কার্যক্রমে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রণীত ‘অ্যাচিভিং ৭০% কোভিড-১৯ ইম্যুনাইজেশন কাভারেজ বাই মিড-২০২২’ কৌশলপত্রে করোনাভাইরাস রোগ ও মৃত্যুর সংখ্যা এবং রোগের সংক্রমণ বিস্তার ও নতুন ভ্যারিয়েন্ট উদ্ভবের ঝুঁকি হ্রাস করতে এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে আসতে ডিসেম্বর, ২০২১ সালের মধ্যে সারা বিশ্বের ৪০ শতাংশ জনসংখ্যাকে এবং জুন, ২০২২-এর মধ্যে ৭০ শতাংশ জনসংখ্যাকে পূর্ণ ডোজ টিকার আওতায় নিয়ে আসার কথা বলা হয়। এই কৌশলপত্রে উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে চারটি মূলনীতি– সমতা, একীভূত টিকা কার্যক্রম, টিকার গুণগত মান এবং সমন্বিত কার্যক্রমের কথা বলা হয়েছে, যেখানে আর্থিকভাবে ভারাক্রান্ত না করে টিকা গ্রহণের ক্ষেত্রে সব জনসংখ্যার সম প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করা, টিকার ক্ষেত্রে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অনুমোদিত ও বৈশ্বিক মানদণ্ড অনুসরণ করা এবং প্রান্তিক, ঝুঁকিপূর্ণ ও উদ্বাস্তু মানুষদের টিকার আওতায় নিয়ে আসা ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে। এ ছাড়া এই লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তিনটি ধাপের কথা বলা হয়েছে, যা প্রতিটি দেশে যথাযথ সমন্বয়ের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। প্রথম ধাপে রোগের তীব্রতা ও মৃত্যুহার হ্রাস করার জন্য সব বয়স্ক ব্যক্তি, স্বাস্থ্যকর্মী এবং অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে টিকার আওতায় আনা, দ্বিতীয় ধাপে দেশের আর্থসামাজিক কর্মকাণ্ডকে স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে আসতে প্রাপ্তবয়স্কদের এবং তৃতীয় ধাপে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ বিস্তার রোধ ও নতুন ভ্যারিয়েন্ট উদ্ভবের ঝুঁকি হ্রাস করতে কিশোর-কিশোরীদের টিকার আওতায় নিয়ে আসার কথা বলা হয়েছে।[১৫]

কোভিড-১৯ টিকা ব্যবস্থাপনায় সাড়া প্রদানে ঘাটতি

দেশের মানুষকে ন্যূনতম এক ডোজ টিকার আওতায় নিয়ে আসতে বাংলাদেশ সরকার যথেষ্ট অগ্রগতি অর্জন করেছে। ২৮ মার্চ, ২০২২ পর্যন্ত বাংলাদেশ প্রথম ডোজ টিকা প্রদানের ক্ষেত্রে

সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে তৃতীয় অবস্থানে থাকলেও পূর্ণ ডোজ টিকা প্রদানে সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থান পঞ্চম।[১৬]

ডিসেম্বর ২০২১-এর মধ্যে জনসংখ্যার ৪০ শতাংশকে পূর্ণ ডোজ টিকার আওতায় আনার যে লক্ষ্যমাত্রা তা অর্জনে ৯৮টি দেশ পিছিয়ে ছিল,[১৭] যার মধ্যে বাংলাদেশও ছিল। এই সময়ে বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় ৩০ শতাংশ মানুষ টিকার আওতায় আসে। প্রথম ডোজ পাওয়ার পর দ্বিতীয় ডোজের জন্য অপেক্ষায় থাকা জনসংখ্যা বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি। বিশেষজ্ঞদের মতে, লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দীর্ঘসূত্রতা কাঙ্ক্ষিত সুফল পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হতে পারে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং প্রস্তাবিত কৌশল বাস্তবায়নে ঘাটতি

বাংলাদেশে সরকারের জাতীয় টিকা পরিকল্পনায় গৃহীত অগ্রাধিকার তালিকার ধাপ অনুযায়ী অধিক ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে পরিপূর্ণভাবে টিকার আওতায় আনতে উদ্যোগের ঘাটতি রয়েছে। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মোট মৃত্যুর ৫৬ দশমিক ৬ শতাংশ হচ্ছেন ষাটোর্ধ্ব ব্যক্তিরা। পরিকল্পনা অনুযায়ী এই জনগোষ্ঠীকে প্রথম ধাপে টিকার আওতায় আনার কথা থাকলেও একটি প্রতিবেদনে দেখা যায়, জানুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত ষাট বা তদূর্ধ্ব বয়সের ব্যক্তিদের মধ্যে ৪০ লাখ মানুষ টিকার আওতার বাইরে রয়ে গেছেন (প্রায় ২৯ শতাংশ)।[১৮] অথচ শেষ ধাপে টিকা দেওয়ার কথা থাকলেও অধিকাংশ কিশোর-কিশোরী শিক্ষার্থীকে টিকার আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে, যাদের মৃত্যুহার ১ শতাংশের চেয়েও কম। এ ছাড়া জাতীয় টিকা পরিকল্পনায় দুর্গম এলাকা, ভাসমান মানুষ, বস্তিবাসী, বয়স্ক ব্যক্তি ইত্যাদি জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিতকরণ, বাড়ি বাড়ি গিয়ে রেজিস্ট্রেশন ও ভ্রাম্যমাণ টিকা দলের মাধ্যমে টিকা দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করার কথা বলা হলেও[১৯] দু-একটি এলাকা ছাড়া এসব কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি।

টিকাগ্রহীতাদের উদ্বুদ্ধকরণ ও প্রচার কার্যক্রমে ঘাটতি

জাতীয় পরিকল্পনায় স্থানীয় সরকার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যকর্মীদের মাধ্যমে জনগণকে টিকা নিতে উদ্বুদ্ধকরণ ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু জরিপে দেখা যায়, অধিকাংশ মানুষ টিকা নিতে আগ্রহী হয়েছে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের মাধ্যমে (৭০ দশমিক ১ শতাংশ)। পক্ষান্তরে স্থানীয় সরকার ও স্বাস্থ্য বিভাগের উদ্যোগে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার হার খুব কম (যথাক্রমে ১৩ দশমিক ২ এবং ১৭ দশমিক ৮ শতাংশ)।

একটি গবেষণায় দেখা যায়, ৪৬ শতাংশ মানুষ টিকা গ্রহণে দ্বিধান্বিত। মানুষের মধ্যে টিকা-সম্পর্কিত ভুল ধারণা ও ভীতি থাকলেও তা দূর করতে প্রচার-উদ্বুদ্ধকরণবিষয়ক সরকারি উদ্যোগের ঘাটতি লক্ষ করা গেছে। অধিকাংশ মানুষ পরিবার-আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে টিকার বিষয়ে জেনেছে (৭৪ দশমিক ৯ শতাংশ)। সরকারি উদ্যোগে সংগঠিত মাইকিং থেকে টিকা বিষয়ে জেনেছে ৩৩ দশমিক ৮ শতাংশ মানুষ এবং টেলিভিশন থেকে জেনেছে ৪৯ দশমিক ৯ শতাংশ মানুষ।

টিকা কার্যক্রমে অসমতা

বিভিন্ন এলাকার প্রান্তিক ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মানুষের টিকাপ্রাপ্তি জাতীয় পর্যায়ের অর্জনের চেয়ে নিচে অবস্থান করতে দেখা যায়। ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত জাতীয় পর্যায়ে ন্যূনতম এক ডোজ টিকার আওতায় আসা মানুষের হার ছিল ৪৪ শতাংশ। পক্ষান্তরে বেশ কিছু এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠী,

যেমন বেদে, হিজড়া, ডোম, হরিজন ইত্যাদি সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে টিকার আওতার বাইরে ছিল ৮০ শতাংশ বা তার বেশি (সারণি ৩)।

সারণি ৩ : প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর টিকাপ্রাপ্তির আনুমানিক চিত্র*

প্রান্তিক জনগোষ্ঠী	টিকার বাইরে থাকা জনসংখ্যা	এলাকার সংখ্যা	মোট পর্যবেক্ষিত এলাকা
বেদে	৮০%-এর ওপরে	৪টি	৮টি
	৬০%-এর ওপরে	২টি	
	৫০% বা এর নিচে	২টি	
হিজড়া	৮০%-এর ওপরে	৫টি	১৫টি
	৬০%-এর ওপরে	২টি	
	৫০% বা এর নিচে	৮টি	
হরিজন	৬০%-এর ওপরে	৩টি	১২টি
	৫০% বা এর নিচে	৯টি	
ডোম	৬০%-এর ওপরে	৩টি	১২টি
	৫০% বা এর নিচে	৯টি	
বাঁশফোর	৬০%-এর ওপরে	১টি	৪টি
	৫০% বা এর নিচে	৩টি	

** প্রতিটি এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মতামতের ভিত্তিতে প্রস্তুত (ডিসেম্বর ২০২১)*

এ ধরনের জনগোষ্ঠীকে কীভাবে টিকার আওতায় নিয়ে আসা হবে সেক্ষেত্রে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা এবং উদ্যোগে ঘাটতি লক্ষ করা গেছে। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৩৮টি জেলার মধ্যে চারটি জেলায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর টিকাপ্রাপ্তি-বিষয়ক তথ্য সংরক্ষণ করা হয় এবং ১৮টি জেলায় আংশিকভাবে তথ্য সংরক্ষণ করা হয়, বাকি ১৬টি জেলায় এবিষয়ক কোনো তথ্য সংরক্ষণ করা হয় না। এ ছাড়া টিকা গ্রহণের ক্ষেত্রেও প্রান্তিক মানুষ অসমতার শিকার হয়েছে, যেমন টিকাকেন্দ্রে অন্যের চেয়ে দেরিতে টিকা পাওয়া, অবহেলা, দুর্ব্যবহারের শিকার ইত্যাদি।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর এলাকায় উদ্বুদ্ধকরণ ও প্রচার কার্যক্রমে ঘাটতি

সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণকারী টিকার আওতায় না আসা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেক সংখ্যক মানুষ বলেছে, টিকা-বিষয়ক তথ্য না থাকার কারণে টিকা গ্রহণ করেনি। টিকাবিষয়ক তথ্য না থাকায় অনেকের টিকা বিষয়ে ভীতি রয়েছে, ফলে তারা টিকা নিতে আগ্রহী হচ্ছে না। প্রায় এক-চতুর্থাংশ মানুষ জানিয়েছে, এলাকায় রেজিস্ট্রেশনের সুবিধা না থাকায় তারা টিকা নিতে পারেনি। কাঠামোগত কারণ হিসেবে ইন্টারনেট-সুবিধা না থাকা, জাতীয় পরিচয়পত্র না থাকা, টিকাকেন্দ্র অনেক দূরে হওয়ার কথাও বলা হয়েছে। এ ছাড়া কিছু অতিরিক্ত অর্থ খরচ হওয়ার ভয়েও টিকা নেয়নি বলে জানায়।

টিকা-বিষয়ক তথ্যপ্রাপ্তিতে ঘাটতি

টিকা কার্ডে টিকাগ্রহীতার অবহিতকরণ সম্মতিপত্রে টিকা-সম্পর্কিত তথ্য জানানো, উপকারিতা ও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সামনাসামনি বা অনলাইনে অবগত করার বিষয়ে বলা হয়েছে। যারা

নিবন্ধন করে টিকা নিয়েছে, তাদের অধিকাংশেরই অনলাইন নিবন্ধন সম্পর্কে ধারণা নেই। ফলে টিকাগ্রহীতাদের বড় একটা অংশ টিকা গ্রহণের আগে টিকা-সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য পায়নি। টিকাগ্রহীতাদের ৮০ দশমিক ৯ শতাংশ টিকার উপকারিতা সম্পর্কে তথ্য পেলেও মাত্র ৪১ দশমিক ৬ শতাংশ টিকাগ্রহীতা টিকার সম্ভাব্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সম্পর্কে তথ্য পেয়েছে, ৪৪ দশমিক ১ শতাংশ কোন টিকা দেওয়া হচ্ছে, সে বিষয়ে তথ্য পেয়েছে, ৪২ দশমিক ৫ শতাংশকে দ্বিতীয় ডোজের তারিখ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ২৮ দশমিক ৬ শতাংশকে দ্বিতীয় ডোজের জন্য তাগাদা দেওয়া হয়েছে এবং ১৫ দশমিক ৬ শতাংশকে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হলে করণীয় কী, সে বিষয়ে তথ্য দেওয়া হয়েছে।

টিকাপ্রাপ্তির প্রক্রিয়া সহজ না করা

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কৌশলপত্রে আর্থিকভাবে ভারাক্রান্ত না করে দেশের সব মানুষের সম প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু টিকাকেন্দ্রের দূরত্ব, জটিল নিবন্ধন-প্রক্রিয়া ও খরচের কারণে প্রান্তিক ও দুর্গম এলাকার মানুষের টিকাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। জরিপে টিকাগ্রহীতাদের বাড়ি থেকে স্থায়ী টিকাকেন্দ্রগুলোর গড় দূরত্ব ৬ দশমিক ৫ কিলোমিটার (সর্বোচ্চ ৫০ কিমি) এবং অস্থায়ী বা গণটিকাকেন্দ্রের গড় দূরত্ব ২ দশমিক ২ কিমি (সর্বোচ্চ ৩০ কিমি)।

সারণি ৪ : টিকাগ্রহীতার বাড়ি থেকে টিকাকেন্দ্রের দূরত্ব, যাতায়াত সময় ও খরচ

	স্থায়ী কেন্দ্র	অস্থায়ী/গণটিকা কেন্দ্র
টিকাকেন্দ্রের দূরত্ব	গড়ে ৬.৫ কিমি (সর্বোচ্চ ৫০ কিমি)	গড়ে ২.২ কিমি (সর্বোচ্চ ৩০ কিমি)
কেন্দ্রে গড় যাতায়াত সময়	১.১৫ ঘণ্টা	১ ঘণ্টা বা তার কম
যাতায়াত খরচ	৭০ টাকা	৩৯ টাকা

স্থায়ী কেন্দ্রে যাতায়াত বাবদ টিকাগ্রহীতাদের গড়ে ৭০ টাকা এবং অস্থায়ী বা গণটিকাকেন্দ্রে যাতায়াত বাবদ গড়ে ৩৯ টাকা খরচ করতে হয়েছে। নিবন্ধন-প্রক্রিয়া জটিল হওয়ার কারণে ৮৬ দশমিক ৪ শতাংশ টিকাগ্রহীতাকে অন্যের সহায়তা নিয়ে নিবন্ধন করতে হয়েছে। এর মধ্যে ৭৬ দশমিক ৪ শতাংশ টিকাগ্রহীতা কীভাবে নিবন্ধন করতে হয় তা জানে না এবং ৬৬ দশমিক ৩ শতাংশ টিকাগ্রহীতাকে টাকার বিনিময়ে দোকান থেকে নিবন্ধন করতে হয়েছে। নিবন্ধন করতে দোকানে যাতায়াত ভাড়া, নিবন্ধন খরচ, নিবন্ধন কার্ড প্রিন্টসহ নিবন্ধন বাবদ একজন টিকাগ্রহীতার মোট গড় খরচ ৫০ টাকা। নিবন্ধন ও টিকা গ্রহণ প্রক্রিয়া জটিল হওয়ার করণে নিবন্ধন ও টিকা গ্রহণ করতে যাতায়াত বাবদ একজন টিকাগ্রহীতার মোট গড় খরচ ১০৬ টাকা, যা দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা মানুষের এক দিনের আয়ের চেয়ে বেশি।

টিকাকেন্দ্রে বিশেষ জনগোষ্ঠীর জন্য ব্যবস্থা না রাখা

দেখা যায় ৪৫টি টিকাকেন্দ্রের মধ্যে ১৩টিতে টিকা গ্রহণের সময় নারীদের গোপনীয়তা রক্ষার ব্যবস্থা ছিল না এবং ৩১টি কেন্দ্র প্রতিবন্ধীবান্ধব ছিল না (কেন্দ্রগুলোতে প্রতিবন্ধীদের জন্য র‍্যাম্প না থাকা, নিচতলায় টিকাকেন্দ্র না করা, বসার ব্যবস্থা না থাকা ইত্যাদি)। প্রবাসীদের টিকাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রেও

কিছু সমস্যা হয়েছে। প্রবাসীরা অনেক ক্ষেত্রে 'আমি প্রবাসী' অ্যাপে নিবন্ধন করতে এবং মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দিতে পারেননি। কিছু ক্ষেত্রে প্রবাসীদের জনশক্তি কর্মসংস্থান কার্যালয় থেকে বিএমইটি নম্বর পেতে অতিরিক্ত অর্থ দিতে হয়েছে। প্রবাসীদের জন্য স্বল্পসংখ্যক টিকাকেন্দ্র নির্ধারণ করে দেওয়ায় হয়রানি ও যাতায়াত বাবদ অতিরিক্ত অর্থ খরচ করতে হয়েছে। এ ছাড়া টিকা গ্রহণের জন্য বিএমইটি নম্বর পাওয়ার ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান ও জনশক্তি কার্যালয়ের অসহযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

টিকা কার্যক্রমে অব্যবস্থাপনা

টিকা গ্রহণের সময় ১৫ দশমিক ৬ শতাংশ টিকাগ্রহীতা টিকাকেন্দ্রে অব্যবস্থাপনার শিকার হয়েছে, যার মধ্যে ৮১ দশমিক ৩ শতাংশ জানিয়েছে, টিকাকেন্দ্রে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করা হয়নি। টিকাগ্রহীতারা টিকাকেন্দ্রে অন্যান্য যে অব্যবস্থাপনার মুখোমুখি হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে টিকাকেন্দ্রে দীর্ঘ সিরিয়াল (৫৮ দশমিক ২ শতাংশ), বসা বা অপেক্ষার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকা (৪৩ দশমিক ৩ শতাংশ), ভিড় বা সিরিয়াল নিয়ন্ত্রণের জন্য পর্যাপ্ত জনবল না থাকা (৩১ দশমিক ৬ শতাংশ), বয়স্ক বা প্রতিবন্ধীবান্ধব সেবার ব্যবস্থা না থাকা (২৯ দশমিক ৯ শতাংশ), টিকার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ কক্ষ না থাকা (২৪ দশমিক ১ শতাংশ), নোংরা পরিবেশ (১৫ দশমিক ১ শতাংশ), টিকার কর্মীদের দক্ষতায় ঘাটতি (১৪ দশমিক ২ শতাংশ), সবগুলো বুথ খোলা না থাকা (১০ দশমিক ৪ শতাংশ) ইত্যাদি।

চিত্র ৫ : টিকাকেন্দ্রে অব্যবস্থাপনার শিকার টিকাগ্রহীতা (এক্সিট পোল জরিপ)

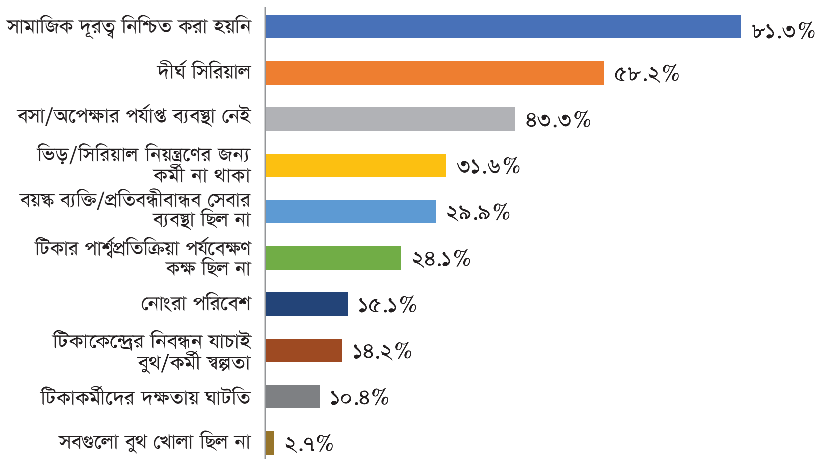

কোভিড-১৯ টিকা ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম-দুর্নীতি

টিকা গ্রহণের সময় ২ শতাংশ সেবাগ্রহীতা অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার হয়েছে, যার মধ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে সময়ক্ষেপণ, টিকাকেন্দ্রে রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী ব্যক্তি ও সরকারি কর্মকর্তাদের সুবিধা দেওয়া, দুর্ব্যবহার এবং কিছু কেন্দ্রে টিকা থাকা সত্ত্বেও টিকাকেন্দ্র থেকে টিকাগ্রহীতাদের ফিরিয়ে দেওয়া ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

চিত্র ৬ : টিকাকেন্দ্রে অনিয়ম-দুর্নীতি (এক্সিট পোল জরিপ)

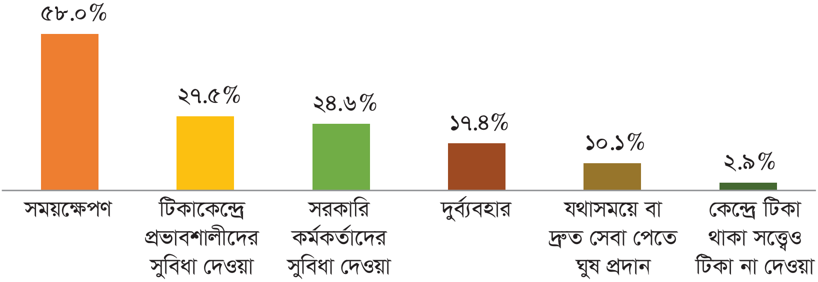

টিকাকেন্দ্রে অতিরিক্ত ভিড় এড়িয়ে যথাসময়ে বা দ্রুত টিকা পেতে ১০ দশমিক ১ শতাংশ সেবাগ্রহীতাকে গড়ে ৬৯ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে। এ ছাড়া প্রবাসীরা টিকার নিবন্ধনের জন্য বিএমইটি নম্বর পেতে ১৫০-২০০ টাকা ঘুষ দিতে বাধ্য হয়েছে। দু-একটি কেন্দ্রে নিয়মবহির্ভূতভাবে ১ হাজার ৫০০ টাকা থেকে ৩ হাজার টাকার বিনিময়ে পছন্দ অনুযায়ী টিকা দেওয়া হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে টিকা না নিয়েও টাকার বিনিময়ে প্রবাসীদের টিকার সনদ সংগ্রহ করতে হয়েছে। একটি গ্রুপকে ফেসবুক পেজে প্রবাসীদের চাহিদা অনুযায়ী টাকার বিনিময়ে টিকা বা সার্টিফিকেট প্রদানের বিষয়ে প্রচার করতে দেখা গেছে।

টিকা কার্যক্রমে জবাবদিহি-ব্যবস্থার ঘাটতি

গবেষণায় পর্যবেক্ষিত ৪৫টি স্থায়ী টিকাকেন্দ্রের মধ্যে ৩৫টি কেন্দ্রে অভিযোগ বাক্স ছিল না, ৪০টি কেন্দ্রে অভিযোগ কেন্দ্র ছিল না এবং ৩৯টি কেন্দ্রে অভিযোগ জানানোর কোনো নম্বর প্রদর্শন করা ছিল না। জরিপে দেখা যায়, অব্যবস্থাপনা ও অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার হওয়া টিকাগ্রহীতার ১ দশমিক ৫ শতাংশ অভিযোগ করেছে। যারা অভিযোগ করেনি, তাদের ৪৪ দশমিক ১ শতাংশ বলেছে, অভিযোগের ব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা নেই, ৩০ দশমিক ১ শতাংশ বলেছে, কেন্দ্রে অভিযোগ জানানোর ব্যবস্থা ছিল না, ১৪ দশমিক ১ শতাংশ মনে করে যে অভিযোগ করলে কোনো লাভ হয় না এবং ১৯ দশমিক ৯ শতাংশ হয়রানি বা ঝামেলার ভয়ে অভিযোগ করেনি।

টিকা কার্যক্রমে অর্থ ব্যয়ে স্বচ্ছতার ঘাটতি

টিকা ক্রয়সংক্রান্ত ব্যয়

গণমাধ্যমে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ তার বক্তব্যে কোভিড-১৯ টিকা ক্রয়ে ব্যয় ২০ হাজার কোটি টাকার বেশি বলে উল্লেখ করেন।[২০] পরবর্তী সময়ে গণমাধ্যম থেকে জানা যায়, ৩১ মার্চ, ২০২২ পর্যন্ত বিভিন্ন উৎস থেকে প্রায় ২৯ দশমিক ৬৪ কোটি ডোজ টিকা পাওয়া গেছে। বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, দ্বিপক্ষীয় চুক্তির মাধ্যমে সরকারিভাবে প্রায় ৯ দশমিক ২ কোটি ডোজ, কোভ্যাক্স কস্ট শেয়ারিংয়ের মাধ্যমে ৮ দশমিক ৭ কোটি ডোজ টিকা কেনা হয়েছে এবং বিভিন্ন দেশের সরকার ও কোভ্যাক্স থেকে অনুদানের মাধ্যমে প্রায় ১১ দশমিক ৭ কোটি ডোজ টিকা বিনা মূল্যে পাওয়া গেছে। এ ক্ষেত্রে কোভিশিল্ড প্রতি ডোজ ৫ ডলার[২১] (৪২৫ টাকা), সিনোফার্ম ১০ ডলার[২২] (৮৫০ টাকা) এবং কোভ্যাক্স কস্ট শেয়ারিং ৫ দশমিক ৫ ডলার[২৩] (৪৬৭ দশমিক ৫ টাকা) হিসাবে ধরে আনুমানিক টিকার খরচ দাঁড়ায় ১১ হাজার ২৫৪ দশমিক ৪ কোটি টাকা।

সারণি ৫ : টিকার প্রাক্কলিত ক্রয়মূল্য

টিকার উৎস	টিকার নাম	পরিমাণ (কোটি ডোজ)[২৪]	প্রাক্কলিত মূল্য (কোটি টাকা)
সরকারিভাবে ক্রয়/ দ্বিপক্ষীয় চুক্তি	কোভিশিল্ড	১.৫	৬৩৭.৫
	সিনোফার্ম	৭.৭	৬,৫৪৫
কোভ্যাক্স (কস্ট শেয়ারিং ক্রয়)	সিনোফার্ম সিনোভ্যাক	৮.৭	৪,০৭১.৯
কোভ্যাক্স/ বিভিন্ন দেশের উপহার/ অনুদান	-	১১.৭	-
মোট		**২৯.৬**	**১১,২৫৪.৪**

টিকা কার্যক্রমসংক্রান্ত ব্যয়

২০২১ সালের জুলাই মাসে গণমাধ্যমে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে টিকাপ্রতি ৩ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। পরে ১০ মার্চ ২০২২ গণমাধ্যমে টিকা কার্যক্রমে মোট ব্যয় ৪০ হাজার কোটি টাকা বলে স্বাস্থ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন।[২৫] সরকারি তথ্যমতে, ৩১ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত মোট ২৪ দশমিক ৩৬ কোটি ডোজ টিকা প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের টিকা পরিকল্পনায় টিকা কার্যক্রম-সম্পর্কিত ব্যয় টিকাপ্রতি দুই ডলার[২৬] (১৭০ টাকা) হিসাবে ধরা হয়। এ ছাড়া কোভ্যাক্স রেডিনেস অ্যান্ড ডেলিভারি ওয়ার্কিং গ্রুপের নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশের টিকা কার্যক্রম-সম্পর্কিত ব্যয়ের মডেল করা হয়, যেখানে একটি দেশের টিকা কার্যক্রমে বিদ্যমান অবকাঠামো ও জনবল ব্যবহার এবং আউটরিচ কেন্দ্রের অনুপাত বিবেচনায় টিকা ক্রয়ের পর থেকে মানুষকে টিকা দেওয়া পর্যন্ত সব ব্যয় হিসাব করে টিকাপ্রতি ব্যয় ধরা হয়েছে শূন্য দশমিক ৮৪ ডলার (৭১ দশমিক ৪ টাকা) থেকে ২ দশমিক ৬৪ ডলার (২২৪ দশমিক ৪ টাকা)।[২৭] সেই হিসাবে টিকা কার্যক্রম-সংক্রান্ত ব্যয়ের প্রাক্কলিত পরিমাণ দাঁড়ায় ১ হাজার ৭৩৯ দশমিক ৬ কোটি টাকা থেকে ৫ হাজার ৪৬৭ দশমিক ৩ কোটি টাকার মধ্যে।

সারণি ৬ : টিকা ক্রয় ও প্রাক্কলিত ব্যবস্থাপনা ব্যয়

কস্ট মডেল/পরিকল্পনা	টিকার ডোজপ্রতি প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা)	প্রাক্কলিত মোট ব্যয় (কোটি টাকা)
ক. কোভ্যাক্স রেডিনেস অ্যান্ড ডেলিভারি ওয়ার্কিং গ্রুপ মডেল	৭১.৪-২২৪.৪*	১,৭৩৯.৬-৫,৪৬৭.৩
খ. জাতীয় টিকা পরিকল্পনা	১৭০	৪,১৪২
গ. টিকার প্রাক্কলিত ক্রয়মূল্য		১১,২৫৪.৪
টিকা ক্রয় ও টিকা ব্যবস্থাপনার প্রাক্কলিত মোট ব্যয় (ক+গ)		**১২,৯৯৩-১৬,৭২১**

উল্লিখিত টিকার প্রাক্কলিত ক্রয়মূল্য ও টিকা ব্যবস্থাপনার প্রাক্কলিত মোট ব্যয় দাঁড়ায় **১২ হাজার ৯৯৩ কোটি টাকা থেকে ১৬ হাজার ৭২১** কোটি টাকা, যা স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রদত্ত হিসাবের অর্ধেকেরও

কম। শুধু একটি দেশের ক্ষেত্রে টিকার ক্রয়মূল্য প্রকাশ না করার শর্ত থাকলেও অন্যান্য উৎস থেকে কেনা টিকার ব্যয় এবং টিকা কার্যক্রমে কোন কোন খাতে কত টাকা ব্যয় হয়েছে, তা প্রকাশ করা হয়নি।

করোনাভাইরাসের অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবিলায় প্রণোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ

প্রণোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়নে সাড়া প্রদানে ঘাটতি

সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন প্রণোদনা কর্মসূচির মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের অধীনে ১০টি প্যাকেজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এই প্যাকেজগুলোর অধীনে প্রথম এবং দ্বিতীয় ধাপ মিলিয়ে মোট ১ লাখ ৬১ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এই প্যাকেজগুলোর আওতায় ফেব্রুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত ১ লাখ ২১৮ কোটি টাকার ঋণ বিতরণ করা হয়েছে এবং দুই ধাপে ৪ হাজার ২৭৮টি বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ১ লাখ ৩৩ হাজার ৫৭৪টি কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠান এই প্রণোদনার ঋণ পেয়েছে। দুই ধাপ মিলিয়ে বৃহৎ শিল্প ও সেবা খাত ঋণসুবিধা প্যাকেজে ৭৩ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয় এবং ফেব্রুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত এর ৫৭ দশমিক ৮ শতাংশ বিতরণ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ঋণসুবিধা প্যাকেজে ৪০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে এবং ৫২ শতাংশ বিতরণ করা হয়েছে।[২৮]

সারণি ৭ : বাংলাদেশ ব্যাংকের অধীনে বিভিন্ন প্রণোদনা প্যাকেজে বিতরণকৃত টাকা

বাংলাদেশ ব্যাংকের অধীনে উল্লেখযোগ্য প্রণোদনা প্যাকেজ	প্রথম ধাপের (২০২০-২১) প্রণোদনার পরিমাণ (কোটি টাকা)	প্রথম ধাপে বিতরণের হার	দ্বিতীয় ধাপের (২০২১-২২) প্রণোদনার পরিমাণ (কোটি টাকা)	দ্বিতীয় ধাপে বিতরণের হার	দুই ধাপ মিলিয়ে বিতরণের হার
বৃহৎ শিল্প ও সেবা খাত ঋণসুবিধা	৪০,০০০	৮১.৮%	৩৩,০০০	২৮.৭%	৫৭.৮%
কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ঋণসুবিধা	২০,০০০	৭৬.৯%	২০,০০০	২৭.০%	৫২.০%
প্রি-শিপমেন্ট পুনঃ অর্থায়ন	৫,০০০	৫.৮২%	-	-	-
নিম্ন আয়ের পেশাজীবী কৃষক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ঋণসুবিধা	৩,০০০	৬১.০%	-	-	-
রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল	১২,৭৫০	১০০%	-	-	-
এসএমই খাতের ঋণ নিশ্চয়তা	২,০০০	১.৪৫%	-	-	-
রপ্তানিমুখী শিল্প শ্রমিকদের বেতন-ভাতা পরিশোধে ঋণসুবিধা	৫,০০০	১০০%	-	-	-
কৃষি পুনঃঅর্থায়ন স্কিম	৫,০০০	৭৯.১%	-	-	-

কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতের প্রণোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ

খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মতে, করোনার প্রভাবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাত। করোনাভাইরাসের প্রভাবে ২৫-৩০ শতাংশ উদ্যোগ বন্ধ হয়ে গেছে। মোট শিল্প খাতের ৯০ শতাংশ ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা হলেও এ খাতের জন্য বরাদ্দ প্রণোদনা পর্যাপ্ত নয়।[২৯] ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রেও এই খাত নানাবিধ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। অপর্যাপ্ত পরিমাণ বরাদ্দকৃত অর্থও ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তাদের কাছে পৌঁছাচ্ছে না। গবেষণায় দেখা যায়, জরিপে অন্তর্ভুক্ত এই খাতের ৩৬ দশমিক ৪ শতাংশ উদ্যোক্তা প্রণোদনা ঋণের জন্য আবেদন করেছেন এবং ১১ শতাংশ এই প্রণোদনার ঋণ পেয়েছেন। যারা ঋণের জন্য আবেদন করেননি, তারা আবেদন না করার প্রধান কারণ হিসেবে বলেছেন যে তারা প্রণোদনা ঋণের নিয়মকানুন সম্পর্কে জানেন না (৪১ শতাংশ) এবং আবেদনের প্রক্রিয়া জটিল (২৯ দশমিক ৩ শতাংশ)।

কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতের প্রণোদনা ঋণ না পাওয়ার কারণ

প্রণোদনা ঋণের জন্য ৩৬ দশমিক ৪ শতাংশ উদ্যোক্তা আবেদন করেছেন এবং ১১ শতাংশ এই প্রণোদনার ঋণ পেয়েছেন। জরিপে ঋণ না পাওয়ার প্রধান কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে কারও তদবির বা সুপারিশ না থাকা (২৫ দশমিক ৪ শতাংশ), প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং ব্যাংক জামানত না থাকা (২০ দশমিক ৬ শতাংশ), ব্যাংক কর্মকর্তাদের কমিশন না দেওয়ায় অসহযোগিতা (৭ দশমিক ৯ শতাংশ), ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের গ্রাহক না হওয়া (৬ দশমিক ৪ শতাংশ) এবং রাজনৈতিক বিবেচনায় বাদ দেওয়া (১ দশমিক ৬ শতাংশ)।

চিত্র ৭ : প্রণোদনা ঋণ না পাওয়ার কারণ (উদ্যোক্তার হার)

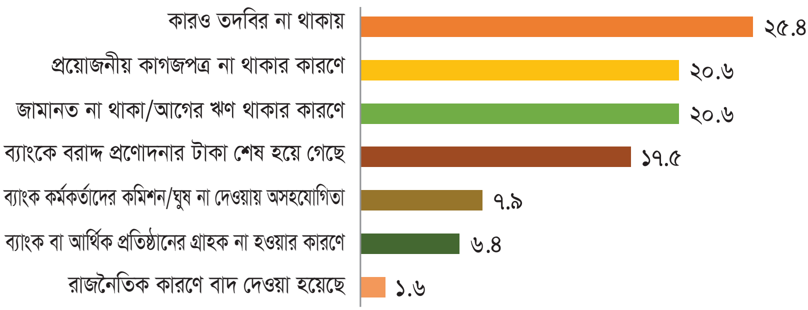

কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতের প্রণোদনা ঋণ আবেদনের প্রক্রিয়ায় চ্যালেঞ্জ

প্রণোদনা ঋণের আবেদন করতে গিয়ে ৬৭ দশমিক ৫ শতাংশ উদ্যোক্তা নানাবিধ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছেন। এর মধ্যে সঠিকভাবে ঋণপ্রাপ্তির যোগ্যতা মূল্যায়ন না করা (২৯ দশমিক ৮ শতাংশ), একই কাজে বারবার ব্যাংকে যেতে বাধ্য হওয়া (২৯ শতাংশ), অপ্রয়োজনীয় ও নিয়মের বাইরে অতিরিক্ত দলিল চাওয়া (২৬ দশমিক ৩ শতাংশ), ঋণের টাকা পেতে বিলম্ব (১৭ দশমিক ৫ শতাংশ), প্রয়োজনের তুলনায় কম টাকা পাওয়া (১৫ দশমিক ৮ শতাংশ), সময়মতো ঋণের টাকা না পাওয়া (১৪ শতাংশ) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। দু-একটি ক্ষেত্রে নারী উদ্যোক্তা প্রণোদনা

ঋণের আবেদন করতে গিয়ে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। এ ছাড়া গ্রামাঞ্চলে এবং আদিবাসী এলাকাগুলোয় ঋণ প্রদানে বৈষম্যের তথ্য গবেষণায় উঠে এসেছে।

কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতের প্রণোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়নে অনিয়ম-দুর্নীতি

প্রণোদনা ঋণপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে ২৩ শতাংশ উদ্যোক্তা অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার হয়েছেন। জরিপে অধিকাংশ উদ্যোক্তা ঋণপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে ঘুষ বা কমিশনের কথা এড়িয়ে গেছেন। তবে দু-একটি ক্ষেত্রে ব্যাংকার কর্তৃক ১০ শতাংশ কমিশন দাবির অভিযোগ উঠে এসেছে। প্রধান অনিয়ম-দুর্নীতির মধ্যে রয়েছে সময়ক্ষেপণ, তথ্য প্রদানে অসহযোগিতা, ব্যাংক কর্মকর্তাদের অসহযোগিতা, সুপারিশ জোগাড় করা, হয়রানির শিকার হওয়া ইত্যাদি (চিত্র ৮ দ্রষ্টব্য)।

চিত্র ৮ : প্রণোদনা ঋণপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে অনিয়ম-দুর্নীতির ধরন

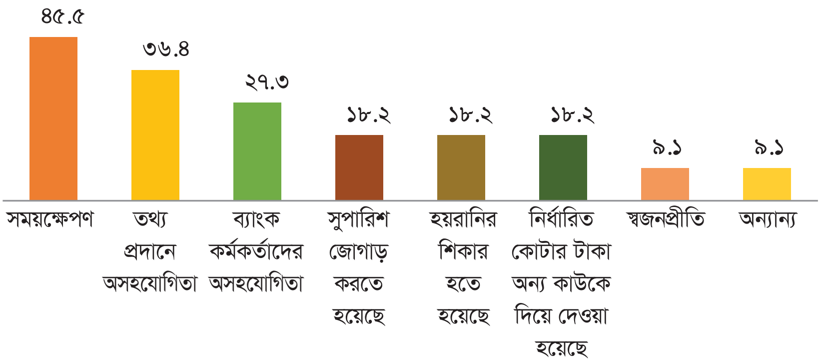

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ, আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসাব্যবস্থা ও টিকা কার্যক্রম এবং করোনার প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে গৃহীত প্রণোদনা কার্যক্রমে অনিয়ম-দুর্নীতিসহ সুশাসনের চ্যালেঞ্জ অব্যাহত রয়েছে। করোনাভাইরাস সংকট মোকাবিলায় সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার, পরিস্থিতি অনুযায়ী দ্রুত সাড়া প্রদান এবং সেবা সম্প্রসারণ করা হয়নি, যা বারবার সংক্রমণ বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের মৃত্যুসহ নানা ধরনের দুর্ভোগ বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ। কোভিড-১৯ টিকাসহ চিকিৎসাব্যবস্থা ও প্রণোদনা কার্যক্রমে সবার জন্য সমান প্রবেশগম্যতা ও সবার অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত না করায় সেবাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে এলাকা, শ্রেণি, লিঙ্গ ও জনগোষ্ঠীভেদে বৈষম্য বিরাজমান। এটি সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সেবা থেকে বঞ্চিত করছে এবং হয়রানি ও আর্থিক বোঝা তৈরি করছে। কোভিড-১৯ মোকাবিলা কার্যক্রমে স্বচ্ছতার ঘাটতি একদিকে অনিয়ম-দুর্নীতির ঝুঁকি তৈরি করছে এবং অন্যদিকে সংঘটিত দুর্নীতিকে আড়াল করার সুযোগ তৈরি করছে। প্রণোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান থাকায় করোনাভাইরাসের প্রভাবে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের কাছে প্রণোদনার সুফল প্রত্যাশিতভাবে পৌঁছায়নি। বিদ্যমান কোভিড-১৯ সেবা কার্যক্রমে অভিযোগ নিরসনের ব্যবস্থা না

থাকায় সমস্যা নিরসনে বা অনিয়ম-দুর্নীতির সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না, যা সুশাসনের সমস্যাগুলোকে টিকিয়ে থাকার অন্যতম একটি কারণ।

সুপারিশ

চিকিৎসাব্যবস্থা সম্পর্কিত

১. কোভিড-১৯ চিকিৎসাব্যবস্থা উন্নয়নে সরকারি ও প্রকল্পের বরাদ্দ যথাযথভাবে দ্রুততার সাথে কাজে লাগিয়ে প্রতিটি জেলায় আইসিইউ শয্যা, আরটি-পিসিআর পরীক্ষাগারসহ অন্যান্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন শেষ করতে হবে।

২. সরকারি পরীক্ষাগারে বিনা মূল্যে নমুনা পরীক্ষার ব্যবস্থা ও বেসরকারি পরীক্ষাগারে নমুনা পরীক্ষার ফি হ্রাস করতে হবে।

কোভিড-১৯ টিকা-সম্পর্কিত

৩. বেসরকারি পর্যায়ের অংশীজনদের সম্পৃক্ত করে টিকার আওতার বাইরে রয়ে যাওয়া ঝুঁকিপূর্ণ মানুষদের চিহ্নিত করতে হবে এবং টিকার আওতায় নিয়ে আসতে হবে।

৪. মাঠপর্যায়ের সরকারি প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার মাঠকর্মীদের ব্যবহার করে প্রত্যন্ত এলাকা ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিনা মূল্যে নিবন্ধন ও টিকা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. প্রথম ডোজ পাওয়া, বিশেষ করে নিবন্ধন ব্যতীত টিকাগ্রহীতার দ্বিতীয় ডোজ নিশ্চিত করতে প্রচারণা বৃদ্ধি করতে হবে; এ ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সংস্থার সহায়তা নিতে হবে।

প্রণোদনা বাস্তবায়ন-সম্পর্কিত

৬. মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তর, প্রতিষ্ঠান, গবেষক, উদ্যোক্তা সমিতির সহায়তায় প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের চিহ্নিত করতে হবে এবং তাদের মধ্যে প্রণোদনা ঋণ আবেদনের প্রক্রিয়া-সম্পর্কিত তথ্য প্রচার করতে হবে।

৭. মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প উদ্যোক্তাদের প্রণোদনা ঋণ-প্রক্রিয়া সহজ করতে হবে, বিভিন্ন শর্ত শিথিল করতে হবে এবং ঋণ পরিশোধের সময়সীমা বৃদ্ধি করতে হবে।

৮. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বাইরে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বেশি ঋণ বিতরণ করতে হবে।

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি-সম্পর্কিত

৯. টিকাপ্রাপ্তির উৎস, ক্রয়মূল্য, বিতরণ ব্যয়, মজুত ও বিতরণ-সম্পর্কিত তথ্য সবার জন্য উন্মুক্ত করতে হবে।

১০. কোভিড-১৯ চিকিৎসা ও টিকা-সম্পর্কিত সব প্রতিষ্ঠানে অভিযোগ নিরসনব্যবস্থা তৈরি করতে হবে এবং অনিয়ম-দুর্নীতির সাথে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

তথ্যসূত্র

১ ব্র্যাক, করোনার টিকা নিয়ে আপনার যত প্রশ্ন, বিস্তারিত দেখুন: https://www.brac.net/covid19/res/COVID-FAQ-bn.pdf

২ প্রথম আলো, 'হঠাৎ ১০ শতাংশ মানুষ টিকা থেকে বাদ,' ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২, বিস্তারিত দেখুন: https://tinyurl.com/3mxxummr

৩ প্রথম আলো, 'দেশজুড়ে টিকাদান শুরু আজ,' ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১, বিস্তারিত দেখুন: https://www.prothomalo.com/bangladesh/

৪ The Daily Star, First dose of Covid-19 vaccination to be suspended from tomorrow: DGHS, 25 April 2021, available on: https://www.thedailystar.net/coronavirus-deadly-new-threat/news/first-dose-covid-19-vaccination-be-suspended-tomorrow-dghs-2083521

৫ অর্থ মন্ত্রণালয়, বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০, করোনা-১৯ মোকাবিলা ও অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের জন্য প্রণোদনা প্যাকেজ, বিস্তারিত দেখুন: https://mof.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mof.portal.gov.bd/pagepdf

৬ টিআইবি, করোনাভাইরাস মোকাবিলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ : প্রথম পর্ব, ১৫ জুন ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://www.ti-bangladesh.org/beta3/index.php/en/research-policy/96-fact-finding-studies/5894-2020-06-15-05-06-11; করোনাভাইরাস মোকাবিলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ : দ্বিতীয় পর্ব, ১০ নভেম্বর ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://www.ti-bangladesh.org/beta3/index.php/en/research-policy/96-fact-finding-studies/6197-2020-11-10-04-21-36; করোনাভাইরাস মোকাবিলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ : তৃতীয় পর্ব, ৮ জুন ২০২১, বিস্তারিত দেখুন: https://www.ti-bangladesh.org/beta3/index.php/en/research-policy/92-diagnostic-study/6286-2021-06-08-04-00-01

৭ The Daily Star, First dose of Covid-19 vaccination to be suspended from tomorrow, প্রাগুক্ত

৮ বিবিসি বাংলা নিউজ, কোভিড : বাংলাদেশে আবারও শুরু হয়েছে গণটিকা কার্যক্রম, টিকা পাবেন তিন ক্যাটাগরির মানুষ, ১ জুলাই ২০২১, বিস্তারিত দেখুন: https://www.bbc.com/bengali/news-57682011

৯ বাংলা ট্রিবিউন, ভ্যাকসিন কার্যক্রমে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে অষ্টম স্থানে : স্বাস্থ্যমন্ত্রী, ২৯ মার্চ ২০২২ তারিখে সংগৃহীত, বিস্তারিত দেখুন: https://www.banglatribune.com/national/735855/

১০ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ড্যাশবোর্ড ফর বাংলাদেশ, ৩১ মার্চ ২০২২ তারিখে সংগৃহীত, বিস্তারিত দেখুন: http://103.247.238.92/webportal/pages/covid19-vaccination-update.php

১১ প্রথম আলো, 'বুস্টার' ডোজ দেওয়া শুরু, নতুন নিবন্ধনের দরকার নেই, ২৮ ডিসেম্বর ২০২১, বিস্তারিত দেখুন: https://tinyurl.com/3taap2h6 /

১২ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ড্যাশবোর্ড ফর বাংলাদেশ, প্রাগুক্ত

১৩ পরিকল্পনা বিভাগ, একনেক কর্তৃক COVID-19 Emergency Response and Pandemic Preparedness (WB-GOB) শীর্ষক প্রকল্প অনুমোদন, ১৬ জুন ২০২০, স্মারক নং: ২০.০০.০০০০.৪১২.০৬, ০৩৯.২০-১৫১

১৪ বিশ্বব্যাংক, বাংলাদেশ : কোভিড-১৯ ইমার্জেন্সি রেসপন্স অ্যান্ড প্যান্ডেমিক প্রিপেয়ার্ডনেস প্রজেক্টস, প্রজেক্ট পেপার, ২ ফেব্রুয়ারি ২০২২, বিস্তারিত দেখুন: https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099840002072227610/bangladesh000s000procurement0plan02

১৫ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, অ্যাচিভিং ৭০% কোভিড-১৯ ইম্যুনাইজেশন কাভারেজ বাই মিড-২০২২, ২৩ ডিসেম্বর ২০২১, বিস্তারিত দেখুন: https://www.who.int/news/item/23-12-2021-achieving-70-covid-19-immunization-coverage-by-mid-2022#_ftnref1

১৬ আওয়ার ওয়ার্ল্ড ইন ডেটা ওয়েবসাইট, ২৮ মার্চ ২০২২ পর্যন্ত প্রাপ্ত ডেটা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ, বিস্তারিত দেখুন: https://ourworldindata.org/covid-vaccinations

১৭ প্রাগুক্ত

১৮ প্রথম আলো, হঠাৎ ১০ শতাংশ মানুষ টিকা থেকে বাদ, ২৩ জানুয়ারি ২০২২, বিস্তারিত দেখুন: https://tinyurl.com/3mxxummr

[১৯] স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ন্যাশনাল ডেপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড ভ্যাকসিনেশন প্ল্যান ফর কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ইন বাংলাদেশ, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১, ঢাকা।

[২০] বাংলা ট্রিবিউন, করোনা টিকায় এখন পর্যন্ত ২০ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে : স্বাস্থ্যমন্ত্রী, ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২, বিস্তারিত দেখুন: https://www.banglatribune.com/others/727297/

[২১] প্রথম আলো, চুক্তিতেই আছে দায়মুক্তি, ৭ মে ২০২১, বিস্তারিত দেখুন: https://tinyurl.com/yc4fau67

[২২] ভয়েস অব আমেরিকা, দাম প্রকাশ করে দেওয়ায় সিনোফার্মের টিকা নিয়ে নতুন সংকট, ৩ জুন ২০২১, বিস্তারিত দেখুন: https://www.voabangla.com/a/bangladesh-faces-a-new-crisis-with-sinopharm-vaccine/5915009.html

[২৩] বণিক বার্তা, কোভ্যাক্স থেকে কেনা হচ্ছে সাড়ে ১০ কোটি ডোজ টিকা, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২১, বিস্তারিত দেখুন: https://bonikbarta.net/home/news_description/274867/

[২৪] গণমাধ্যমসহ বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক সংগৃহীত টিকার পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে।

[২৫] দ্য ডেইলি স্টার, ২২ কোটি ডোজ কেনা ও দেওয়ার খরচ ৪০ হাজার কোটি টাকা, ১০ মার্চ ২০২২, বিস্তারিত দেখুন: https://bangla.thedailystar.net/

[২৬] স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ন্যাশনাল ডেপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড ভ্যাকসিনেশন প্ল্যান ফর কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ইন বাংলাদেশ, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১, ঢাকা।

[২৭] ইউনিসেফ, কোভ্যাক্স রেডিনেস অ্যান্ড ডেলিভারি ওয়ার্কিং গ্রুপের, ১০ জানুয়ারি ২০২২, বিস্তারিত দেখুন: https://www.unicef.org/documents/costs-and-predicted-financing-gap-deliver-covid-19-vaccines-133-low-and-middle-income

[২৮] প্রথম আলো, দ্বিতীয় দফায় প্রণোদনা ঋণ পেয়েছেন ৬৭ হাজার গ্রাহক, ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২২, বিস্তারিত দেখুন: https://www.prothomalo.com/business/bank/

[২৯] কালের কণ্ঠ, করোনায় বিপর্যস্ত এসএমই খাত, ২০ আগস্ট ২০২১, বিস্তারিত দেখুন: https://www.kalerkantho.com/online/business/2021/08/20/1065252

টিসিবির ফ্যামিলি কার্ড কার্যক্রমে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ*

মুহা. নূরুজ্জামান ফরহাদ, কাওসার আহমেদ, মো. মোস্তফা কামাল

মোহাম্মদ নূরে আলম ও মো. জুলকারনাইন

প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশে ২০২০ সালের ৮ মার্চ প্রথম করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তি চিহ্নিত হওয়ার পর থেকে বিভিন্ন সময়ে এর সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে কয়েক দফায় মানুষের চলাচল ও বিভিন্ন কার্যক্রমের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। এই সময়ে আরোপিত 'লকডাউন' বা বিধিনিষেধ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কারণে দেশের অর্থনীতি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়; বিশেষ করে এই সময়ে স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। করোনাভাইরাস নিয়ন্ত্রণে দ্বিতীয় দফায় (এপ্রিল-আগস্ট ২০২১ পর্যন্ত) চলাচল ও বিভিন্ন কার্যক্রমে বিধিনিষেধ আরোপের ফলে বাংলাদেশে ৩ কোটির বেশি মানুষ নতুন করে দরিদ্র হয়েছে বলে একটি গবেষণায় জানা যায়।[১] করোনাভাইরাসের অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবিলায় এবং অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে বাংলাদেশ সরকার মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য বিভিন্ন সহায়তা কর্মসূচি গ্রহণ করে। সাম্প্রতিককালে আন্তর্জাতিক সংকটসহ বিভিন্ন কারণে অর্থনীতির ওপর বহুমুখী চাপ বেড়েছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য ব্যাপক হারে বেড়ে গেছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজারে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ সরকার রমজান মাস সামনে রেখে ২০২২ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) মাধ্যমে নিম্ন আয়ের এক কোটি পরিবারকে 'ফ্যামিলি কার্ড' দিয়ে ভর্তুকি মূল্যে পণ্য সরবরাহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর মধ্যে করোনাকালে '২৫০০ টাকা নগদ সহায়তা' কর্মসূচির আওতাভুক্ত ৩৮ লাখ ৫০ হাজার উপকারভোগীর সবাই এবং নতুন করে ৬১ লাখ ৫০ হাজার নতুন উপকারভোগীকে এই কর্মসূচির আওতায় আনা হবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।[২]

জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়, বিশেষ করে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য গৃহীত কার্যক্রমে অভিগম্যতা ও সুশাসনের চ্যালেঞ্জ নিয়ে গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করা টিআইবির অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত কার্যক্রমের অংশ। ইতিপূর্বে টিআইবির গবেষণাসহ[৩] গণমাধ্যমে করোনার অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবিলায় সরকার কর্তৃক গৃহীত '২৫০০ টাকা নগদ সহায়তা' এবং '১০ টাকা কেজি দরে চাল বিক্রয়' কর্মসূচিতে অনিয়ম-দুর্নীতিসহ বিভিন্ন সুশাসনের ঘাটতি চিহ্নিত করা হয়েছিল। টিসিবির এই ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচির কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর এই কর্মসূচিতেও তালিকাভুক্ত হওয়া থেকে শুরু করে সাশ্রয়ী মূল্যে পণ্য ক্রয় পর্যন্ত দরিদ্র জনগণের

---

* ২০২২ সালের ১১ আগস্ট ঢাকায় ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ।

নানা ধরনের হয়রানি, বিভিন্ন অনিয়ম, দুর্নীতির সংবাদ গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। টিআইবির ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে টিসিবির 'ফ্যামিলি কার্ড' কর্মসূচি বাস্তবায়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা ও গবেষণাভিত্তিক অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে এই গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য টিসিবির ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচির মাধ্যমে পণ্য বিক্রয় কার্যক্রম সুশাসনের দৃষ্টিভঙ্গিতে পর্যালোচনা করা। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে :

- উপকারভোগী হিসেবে তালিকাভুক্তি ও সাশ্রয়ী মূল্যে পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনিয়ম-দুর্নীতিসহ সুশাসনের ঘাটতি চিহ্নিত করা;
- লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠীর অভিগম্যতা ও অন্তর্ভুক্তির চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা এবং
- কার্যক্রমে উদ্ভূত সুশাসনের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সুপারিশ প্রদান করা।

গবেষণার পরিধি

ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচির উপকারভোগী হিসেবে প্রাথমিকভাবে বিবেচনায় থাকা অন্যান্য সামাজিক কর্মসূচির আওতার বাইরে থাকা অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠী বিবেচনায় ইতিপূর্বে '২৫০০ টাকা নগদ সহায়তাপ্রাপ্ত পরিবারগুলোকেই এই জরিপে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচির বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে উপকারভোগীর তালিকা প্রণয়ন, কার্ড বিতরণ এবং সরবরাহকৃত কার্ডের মাধ্যমে টিসিবির নির্ধারিত বিক্রয়কেন্দ্র থেকে পণ্য ক্রয় বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

গবেষণাপদ্ধতি

এ গবেষণাটি মূলত মিশ্র পদ্ধতিনির্ভর। গুণগত ও পরিমাণগত তথ্য এই গবেষণায় ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে এই গবেষণায় ব্যবহার করা হয়েছে। কর্মসূচির ধরন ও মেয়াদ বিবেচনায় এটি দ্রুত সম্পাদিত একটি গবেষণা। গবেষণায় সুশাসনের চারটি সূচকের (সাড়া প্রদান, স্বচ্ছতা, অনিয়ম-দুর্নীতি ও জবাবদিহি) ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহপদ্ধতি ও তথ্যের উৎস

প্রত্যক্ষ তথ্য হিসেবে ফ্যামিলি কার্ডের লক্ষিত উপকারভোগীদের কাছ থেকে কর্মসূচিতে তালিকাভুক্তি ও টিসিবির কেন্দ্র থেকে পণ্য ক্রয়ের অভিজ্ঞতা একটি কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপত্রের সাহায্যে টেলিফোন জরিপের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে এবং সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে উপকারভোগীদের কাছ থেকে গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এ ছাড়া সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তাদের কাছ থেকে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে কর্মসূচিবিষয়ক তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই গবেষণায় ব্যবহৃত জরিপ কার্যক্রমটি ১৮ থেকে ২৬ এপ্রিল ২০২২ সালের মধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে এবং অন্যান্য তথ্য এপ্রিল থেকে জুন ২০২২ সময়কালে সংগ্রহ করা হয়েছে।

ফ্যামিলি কার্ডের উপকারভোগীদের অভিজ্ঞতা জরিপ

ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে পণ্য ক্রয়ের অভিজ্ঞতাবিষয়ক জরিপের তথ্য সংগ্রহের জন্য নিচের সূত্র ব্যবহার করা হয়েছে :

$$n \quad \frac{z^2 \times p \quad (1-p)}{e^2}$$

$$n \quad \frac{1.96^2 \times 0.5 \times (1-0.5)}{0.03^2}$$

$$n = 1067$$

এখানে,

n = নমুনার আকার

Z = ১.৯৬ (৯৫% Confidence Interval-এর জন্য)

p = priory proportion = ৫০%

e = error of margin = ৩%

উল্লিখিত বিষয় বিবেচনায় নিয়ে মোট নমুনা আকার দাঁড়ায় ১ হাজার ৬৭ জন উপকারভোগী। টিআইবির আগের একটি গবেষণার জরিপকাজের জন্য জেলা পর্যায় থেকে সংগৃহীত[৪] '২৫০০ টাকা নগদ সহায়তা' কর্মসূচির উপকারভোগীদের তালিকা থেকে কাঙ্ক্ষিত সংখ্যক নমুনা পেতে 'নন-রেসপন্স' বিবেচনায় নিয়ে নিয়মতান্ত্রিক দৈবচয়নের মাধ্যমে ১ হাজার ৫০০ জন উপকারভোগীর তালিকা তৈরি করা হয় এবং সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য যোগাযোগ করা হয়। এর মধ্যে চূড়ান্তভাবে ৩৫টি জেলা থেকে ৩০ থেকে ৩৫ জন করে মোট ১ হাজার ৪৭ জন উপকারভোগী জরিপে অংশগ্রহণ করে।

গবেষণার ফলাফল

ফ্যামিলি কার্ড উপকারভোগীর তালিকাভুক্তি ও পণ্য বিক্রির প্রক্রিয়া

বাংলাদেশে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির ফলে চাহিদা অনুযায়ী নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা সীমিত হয়ে পড়ে। সাধারণত রমজান মাসের আগে কিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়। এর সাথে বাজার অব্যবস্থাপনা, দুর্বল মনিটরিং, ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেট, বাজারের ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণহীনতা ইত্যাদি কারণে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়।[৫] এমতাবস্থায় ২০২২ সালের রমজানের আগে এবং মাঝামাঝি সময়ে (মার্চ-এপ্রিল মাসে) দুই দফায় বাংলাদেশ সরকার টিসিবির মাধ্যমে নিম্ন আয়ের এক কোটি পরিবারের কাছে ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে ৫৫০ টাকা ভর্তুকি মূল্যে (দুই দফায় ১ হাজার ৫৭০ টাকার পণ্য ১ হাজার ২০ টাকায় বিক্রি) রমজানে চাহিদা বাড়ে এমন পণ্য (ভোজ্যতেল, চিনি, ছোলা, ডাল, পেঁয়াজ ইত্যাদি) বিক্রির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[৬] ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এক কোটি ফ্যামিলি কার্ড

উপকারভোগীর তালিকা তৈরির ক্ষেত্রে ২৫০০ টাকা নগদ সহায়তাপ্রাপ্ত পরিবারের ডেটাবেইস ব্যবহার করা হয়েছে। এর সাথে জনসংখ্যা ও দারিদ্র্যের সূচকের ভিত্তিতে জেলা ও উপজেলাগুলোর উপকারভোগীর সংখ্যা নির্ধারণ করে নতুন পরিবারের তালিকা তৈরি করা হয়েছে। তবে ঢাকা সিটি করপোরেশন এলাকার ১২ লাখ এবং বরিশাল সিটি করপোরেশনের ৯০ হাজার পরিবারকে কার্ড দেওয়া সম্ভব হয়নি। এ ক্ষেত্রে ভ্রাম্যমাণ ট্রাকের মাধ্যমে টিসিবির পণ্য বিক্রি করা হয়।[৭] তালিকা প্রণয়নের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক, ইউএনও, সিটি করপোরেশনের মেয়রসহ বিভিন্ন পর্যায়ের জনপ্রতিনিধিরা এই কার্যক্রমে সম্পৃক্ত ছিলেন। প্রথমে জনপ্রতিনিধিরা তালিকা তৈরি করেছেন এবং পরে ইউএনও বা জেলা প্রশাসক তা যাচাই ও অনুমোদন করেছেন। এই তালিকা যাচাই-বাছাই করে, দ্বৈততা পরিহার করে তালিকা চূড়ান্ত করা হয়। চূড়ান্তভাবে তালিকাভুক্ত ব্যক্তিদের কার্ড প্রস্তুত করে তাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। কার্ড বিতরণের পর কবে ও কোথায় পণ্য বিক্রি করা হবে তা তাদের জানিয়ে দেওয়া হয়। পরে দুই ধাপে ফ্যামিলি কার্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের কাছে টিসিবির পণ্য বিক্রি করা হয়। প্রথম ধাপে ২০২২-এর ২০ থেকে ৩০ মার্চ এবং দ্বিতীয় ধাপে ৩ থেকে ২০ এপ্রিল সময়ে এই পণ্য বিক্রি করা হয়।

চিত্র ১ : ফ্যামিলি কার্ডের উপকারভোগীর তালিকা প্রণয়ন, বিতরণ ও পণ্য বিক্রির ধাপ

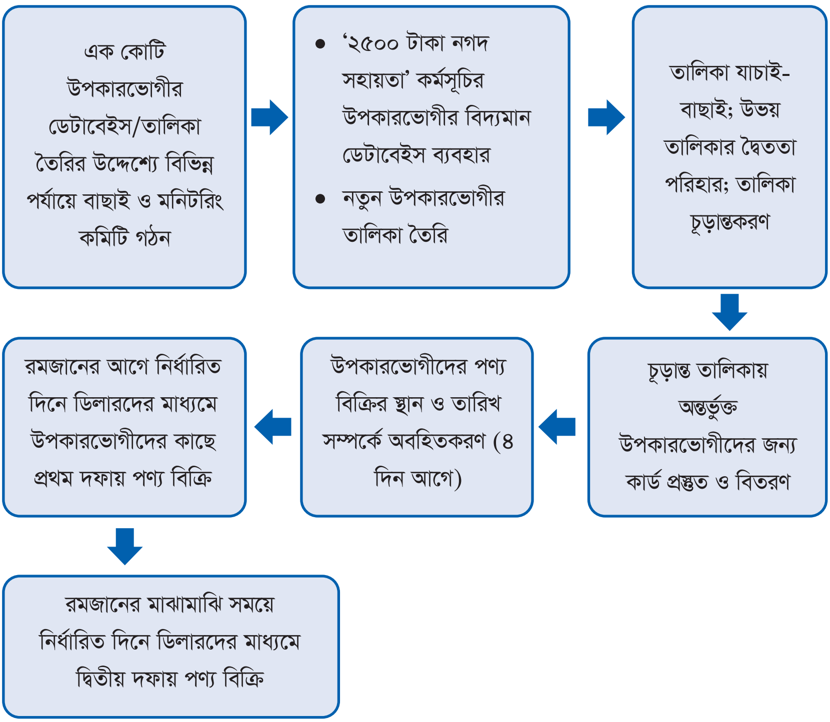

ফ্যামিলি কার্ড উপকারভোগীদের তালিকাভুক্তিতে চ্যালেঞ্জ

জরিপে '২৫০০ নগদ সহায়তা'প্রাপ্ত উপকারভোগী যাদের সবাই ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা, তাদের কাছ থেকে তালিকাভুক্তি, কার্ডপ্রাপ্তি ও পণ্য ক্রয়সংক্রান্ত সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করে এসব ক্ষেত্রে অনিয়ম-দুর্নীতিসহ সুশাসনের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, জরিপে অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতা যারা ইতিপূর্বে ২৫০০ টাকা নগদ সহায়তা পেয়েছিলেন, তাদের ৩৯ দশমিক ৫ শতাংশ ফ্যামিলি কার্ড পাননি। যারা কার্ড পাননি, তাদের ৮০ দশমিক ৪ শতাংশকে অনিয়ম-দুর্নীতির মাধ্যমে বাদ দেওয়া হয়েছে বলে জানান।

চিত্র ২ : ফ্যামিলি কার্ড থেকে বাদ পড়ার কারণ (সেবাগ্রহীতার হার)

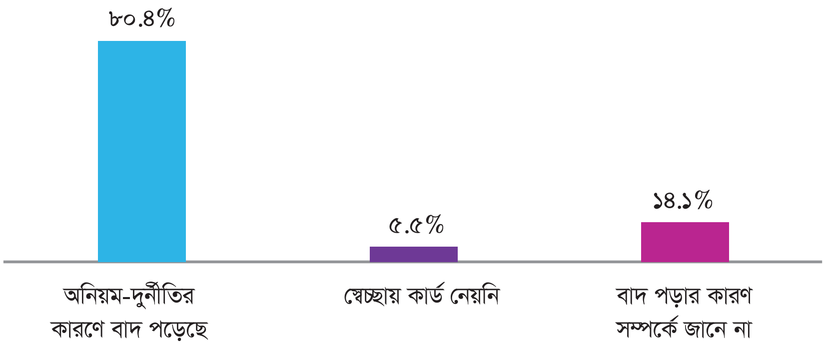

ফ্যামিলি কার্ডে তালিকাভুক্তিতে অনিয়ম-দুর্নীতি

জরিপে দেখা যায়, নারী উত্তরদাতাদের ৩৪ দশমিক ৪ শতাংশ এবং পুরুষ উত্তরদাতাদের ৩১ দশমিক ৪ শতাংশ অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে ফ্যামিলি কার্ডের তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন। ফ্যামিলি কার্ড না পাওয়া উত্তরদাতাদের মতে, কার্ড না পাওয়ার উল্লেখযোগ্য কারণ হচ্ছে তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার ঘাটতি বা তথ্য প্রচারে ঘাটতি। নগদ সহায়তাপ্রাপ্ত সব উপকারভোগী যাদের এই কার্ড পাওয়ার কথা, তাদের এ বিষয়ে কোনো ধারণা ছিল না, এমনকি ফ্যামিলি কার্ড কার্যক্রম সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা ছিল না। এ ছাড়া তালিকা থেকে বাদ পড়ার অন্যান্য কারণ হিসেবে কারও সুপারিশ বা তদবির জোগাড় করতে না পারা, রাজনৈতিক বিবেচনায় সচ্ছল ব্যক্তিদের তালিকাভুক্তকরণ, একই পরিবারে একাধিক কার্ড প্রদান, ছবি পরিবর্তন করে তালিকাভুক্ত ব্যক্তিদের কার্ড অন্যদের দিয়ে দেওয়া, ঘুষ না দেওয়ার কারণে তাদের বাদ দেওয়া হয়েছে বলে তারা উল্লেখ করেন (চিত্র ৩)।

চিত্র ৩ : তালিকাভুক্ত না হওয়া উত্তরদাতাদের মতে, তালিকাভুক্তিতে অনিয়ম-দুর্নীতির ধরন (সেবাগ্রহীতার হার)

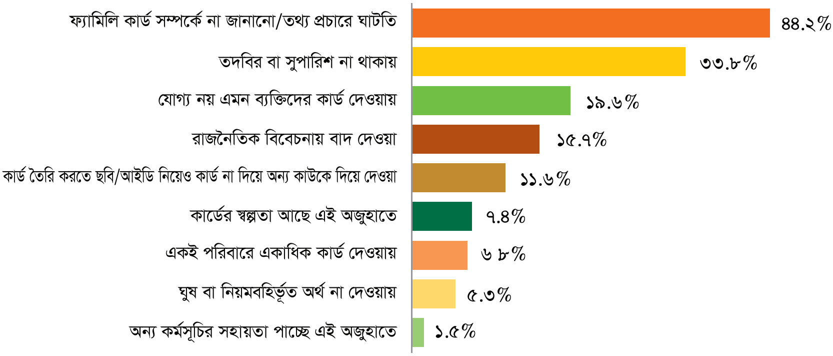

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে জারি করা একটি পরিপত্রে করোনাকালীন প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক নগদ সহায়তা প্রদানের জন্য প্রণীত ডেটাবেইস ব্যবহার করার কথা বলা হয় (যা বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সরবরাহ করে)। এর সাথে জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রেরিত উপজেলাভিত্তিক বিভাজন অনুযায়ী আগের মতো নতুন অতিরিক্ত ডেটাবেইস তৈরি করার কথা বলা হয়।[৮] এ ছাড়া প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২-এ অনুষ্ঠিত একটি সভায় কোভিড-১৯ মহামারির সময় নগদ প্রণোদনা পাওয়া সব দরিদ্র কর্মহীন পরিবারকে টিসিবির ভর্তুকি মূল্যের পণ্য পৌঁছে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়, করোনাকালে প্রধানমন্ত্রীর ঈদ উপহার হিসেবে নগদ অর্থসহায়তা দেওয়ার জন্য ৫০ লাখ পরিবারের একটি তালিকা করা হয়েছিল। তালিকায় পেনশনার, সরকারি চাকরিজীবী, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের নাম থাকায় তা নিয়ে বিতর্ক দেখা দিলে যাচাই-বাছাই শেষে ৩৫ লাখ পরিবারকে নগদ সহায়তা দেওয়া হয়। পরে সড়ক পরিবহন, নৌপরিবহন শ্রমিক, নন-এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কর্মরত আরও সাড়ে ৩ লাখ মানুষকে নগদ সহায়তা দেয় সরকার। রমজানে যে এক কোটি পরিবার ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে খাদ্যসহায়তা পাবে, তার মধ্যে এই সাড়ে ৩৮ লাখ পরিবার অন্তর্ভুক্ত থাকার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে আরও ৬১ দশমিক ৫ লাখ পরিবারকে অন্তর্ভুক্ত করে মোট এক কোটি পরিবারকে খাদ্যসহায়তা দেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়।[৯] তবে সংশ্লিষ্ট একটি দপ্তর থেকে জানানো হয় যে নগদ সহায়তা কর্মসূচির তালিকা থেকে বিভিন্ন পেশাজীবী ('লকডাউনে' কর্মহীন হয়ে পড়া পরিবহনশ্রমিক, পেশাজীবী ইত্যাদি) ৮ লাখ ৫০ হাজার পরিবারকে বাদ দিয়ে এই তালিকার ৩০ লাখ পরিবারকে ফ্যামিলি কার্ড প্রদান করা হয়েছে। কোন বিবেচনায় ও প্রক্রিয়ায় এই সাড়ে আট লাখ পরিবারকে বাদ দেওয়া হয়েছে তা জানা যায়নি। ফ্যামিলি কার্ড সংশ্লিষ্ট প্রজ্ঞাপন ও পরিপত্রেও এ ধরনের কোনো নির্দেশনা লক্ষ করা যায়নি।

দেখা যায়, একদিকে পুরোনো তালিকা থেকে সাময়িকভাবে কর্মহীন হয়ে পড়া বিভিন্ন পেশার দরিদ্র পরিবারকে বাদ দেওয়া হয়েছে, আবার অন্যদিকে নতুন তালিকা প্রণয়নে একই ধরনের পেশাজীবীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ ছাড়া নতুন করে প্রণীত তালিকায় গ্রাম পুলিশ, আনসার

সদস্য, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি চাকরিজীবী, শিক্ষক, ল্যাব টেকনিশিয়ান, চিকিৎসক, পল্লিচিকিৎসক, সাংবাদিক ইত্যাদি সচ্ছল ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সরকারি পরিপত্রে ফ্যামিলি কার্ডের উপকারভোগীর ডেটাবেইস প্রণয়নের সময় দরিদ্র, অসহায়, স্বল্প আয়ের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার দিতে হবে এমন নির্দেশনা দেওয়া সত্ত্বেও দুর্গম এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে নারী ও আদিবাসী যাদের সাথে জনপ্রতিনিধিদের যোগাযোগ কম এমন অনেকে বঞ্চিত হয়েছেন বলে উপকারভোগী জরিপ ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য পাওয়া যায়। এ বিষয়ে একজন আদিবাসী উত্তরদাতা বলেন, 'এই পার্বত্য এলাকায় অনেক বিধবা, অসহায় মহিলা রয়েছেন, যারা এ কার্ডটি পাননি। এমনকি তারা সরকারি কোনো ভাতা বা অনুদানই পান না।'

আর্থিকভাবে সচ্ছল ব্যক্তিদের তালিকাভুক্তি

উত্তরদাতাদের ৭৬ দশমিক ১ শতাংশের মতে, তালিকায় সচ্ছল ব্যক্তিদের এবং ৫১ দশমিক ৩ শতাংশ মনে করেন যোগ্য-হতদরিদ্র ব্যক্তিদের বাদ দিয়ে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক রাজনৈতিক প্রভাবশালী ব্যক্তি ও তাদের আত্মীয়স্বজনদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর বাইরে ৬৫ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি তাদের আত্মীয়স্বজনদের এবং ৪৪ দশমিক ৫ শতাংশ উত্তরদাতার মতে, তালিকায় স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি বা রাজনৈতিক ব্যক্তিরা এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

চিত্র ৪ : উত্তরদাতাদের মতে, তালিকায় অন্তর্ভুক্ত কার্ড পাওয়ার অনুপযুক্ত ব্যক্তিদের ধরন (%)

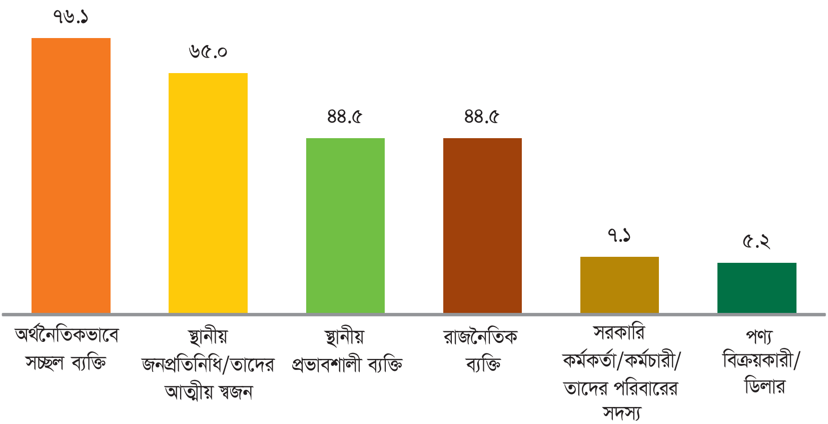

অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার হয়ে বাদ পড়ার পাশাপাশি কার্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাও অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার হয়েছেন। জরিপে অন্তর্ভুক্ত ফ্যামিলি কার্ডপ্রাপ্ত উপকারভোগীদের ৪ শতাংশ তালিকাভুক্তি ও কার্ড বিতরণের বিভিন্ন পর্যায়ে অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছেন। কার্ড প্রাপ্তিতে উপকারভোগীরা ৫০ থেকে ২০০ টাকা পর্যন্ত ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে বাধ্য হয়েছেন। হয়রানি ও পরবর্তী সময়ে সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়ার ভয়ে এসব উত্তরদাতার অধিকাংশ অনিয়ম ও দুর্নীতি বিষয়ে মন্তব্য করতে চাননি।

ফ্যামিলি কার্ডে পণ্য ক্রয়ে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশ ট্রেডিং করপোরেশন বা টিসিবি রাজধানীর বাজারের ৩২ ধরনের খাদ্যপণ্যের দামের ওঠা-নামার তথ্য সংরক্ষণ করে।[১০] নিত্যপ্রয়োজনীয় এসব পণ্যের তথ্য নাগরিকদের সরবরাহের পাশাপাশি টিসিবি মোট ১৭টি পণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণে হস্তক্ষেপ করতে পারে। প্রয়োজনীয় সময়ে এসব পণ্য খোলাবাজারে বিক্রি করে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজারমূল্য নিয়ন্ত্রণে কাজ করে টিসিবি। রমজানের সময় দাম বৃদ্ধি পায় এমন পণ্যগুলো নিয়ে একটি পরিবারের এক মাসের চাহিদা বিবেচনায় প্যাকেজের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। এপ্রিল ২০২২-এ রমজান উপলক্ষে সারা দেশে দরিদ্র পরিবারগুলোর কাছে ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে দুই কিস্তিতে তিনটি ও চারটি পণ্যের একটি করে প্যাকেজ বিক্রি করা হয়। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য হিসেবে চিনি, মসুর ডাল, ভোজ্যতেল এবং রমজানের পণ্য হিসেবে ছোলা ও খেজুরকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। প্রতিটি পণ্য সরকার উপকারভোগীদের কাছে সাশ্রয়ী মূল্যে (সয়াবিন তেল ১১০ টাকা লিটার; চিনি ৫৫ টাকা কেজি; মসুর ডাল ৬৫ টাকা কেজি; ছোলা ৫০ টাকা কেজি) বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেয়।[১১] তবে এসব পণ্য কিনতে কোনো কোনো উপকারভোগী ওজনে কম দেওয়া, ফ্যামিলি কার্ড থাকা সত্ত্বেও পণ্য ক্রয় করতে না পারা, দীর্ঘসময় লাইনে দাঁড়িয়েও পণ্য না পাওয়া, নির্ধারিত স্থানের পরিবর্তে অন্যত্র পণ্য বিক্রয়, অতিরিক্ত অর্থ আদায়, ইত্যাদি অনিয়ম ও দুর্নীতির সম্মুখীন হন।

প্যাকেজের পণ্যের পরিমাণ ও মূল্য নির্ধারণে অতিদরিদ্র ব্যক্তিদের সামর্থ্য বিবেচনা না করা

প্যাকেজের পণ্যের ধরন ও মূল্য নির্ধারণে সম্ভাব্য উপকারভোগীদের মতামত না নিয়ে টিসিবি পণ্যের একটি প্যাকেজের মূল্য ৪৬০ থেকে ৫৬০ টাকা নির্ধারণ করে এবং প্যাকেজের আওতায় থাকা সব পণ্য নেওয়া বাধ্যতামূলক করে। ফলে কোনো কোনো উপকারভোগীর কাছে প্যাকেজের কিছু পণ্য অপ্রয়োজনীয় এবং বাজারের তুলনায় সাশ্রয়ী নয় বলে মনে হয়েছে। অনুরূপভাবে নিম্ন আয়ের মানুষের কেউ কেউ ফ্যামিলি কার্ড পেলেও সময়মতো অর্থ জোগাড় করতে না পারায় পণ্য কিনতে পারেননি। জরিপে অংশগ্রহণকারী কার্ড পাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে ৭ দশমিক ৫ শতাংশ সামর্থ্য না থাকায় একবারও পণ্য ক্রয় করতে পারেননি এবং ৩ দশমিক ৭ শতাংশ একবার পণ্য ক্রয় করতে সক্ষম হলেও দ্বিতীয়বার ক্রয় করতে পারেননি। ফ্যামিলি কার্ডপ্রাপ্ত একজন পরিচ্ছন্নতাকর্মী বলেন, 'স্থানীয় প্রশাসনের কাছ থেকে কার্ড পেয়েছিলাম। কিন্তু টিসিবির পণ্য কিনতে পারিনি। পণ্য নিতে গেলে পর্যাপ্ত টাকা না থাকায় সেখান থেকে ফিরিয়ে দিয়েছে।' অপর একজন উত্তরদাতা জানান, 'যেসব যোগ্য পরিবার কার্ড পায়নি তাদের মধ্যে অনেকে ইচ্ছে করেই কার্ড নেননি। কারণ যাতায়াত ও অন্যান্য খরচ এবং তাদের দৈনন্দিন আয় বা মজুরি না পাওয়া ইত্যাদি হিসাব করে তাদের কাছে এই পণ্য নেওয়া লাভজনক মনে হয়নি।'

পণ্য ক্রয় করেছেন এমন উপকারভোগীদের ৯৪ শতাংশ পণ্যগুলো প্রয়োজনীয় বলে মতামত দিয়েছেন। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্যাকেজের সব পণ্য প্রয়োজনীয় মনে না হওয়ায় অনেকে কিনতে আগ্রহী ছিলেন না। প্যাকেজে চাল (৮৩ দশমিক ৩ শতাংশ), আটা (৩৭ দশমিক ৮

শতাংশ), চিড়া-মুড়ি (১৫ দশমিক ৯ শতাংশ) ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন ছিল বলে মনে করেন উপকারভোগীরা।

পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর চ্যালেঞ্জ ও টিসিবির সক্ষমতার ঘাটতি

নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণে ট্রাকে করে খোলাবাজারে পণ্য বিক্রি টিসিবির সবচেয়ে বৃহৎ কার্যক্রম হলেও তার সুফলভোগী ছিল শহরের জনগণ।[১২] ফলে গ্রমাঞ্চলের মানুষ সাশ্রয়ী মূল্যে পণ্য প্রাপ্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। টিসিবি এক কোটি পরিবারের কাছে ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে সাশ্রয়ী মূল্যে পণ্য বিক্রয়ের মাধ্যমে এর কার্যক্রমকে প্রত্যন্ত এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত করার উদ্যোগ নেয়– দেশব্যাপী ২ হাজার ৮৮১ জন ডিলার এবং ১৬টি মজুদাগারের মাধ্যমে এই পণ্য বিক্রির কার্যক্রম পরিচালনা করে। স্থানীয় পর্যায়ে ডিলাররা টিসিবির সংশ্লিষ্ট গোডাউন বা মজুদাগার বা জেলা প্রশাসক ও ইউএনওর কাছ থেকে প্যাকেজের পণ্য বুঝে নিয়ে নির্ধারিত স্থানে ফ্যামিলি কার্ডধারীদের কাছে বিক্রি করে। এই কার্যক্রমে টিসিবির কিছু প্রাতিষ্ঠানিক চ্যালেঞ্জের কারণে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হতে হয়।

জনবল ও অবকাঠামোগত চ্যালেঞ্জ : ডিলার (২৮৮১ জন) এবং মজুদাগারের (১৬টি) সংখ্যা বিবেচনায় ৪০ থেকে ৪৫ লাখ উপকারভোগীর কাছে পণ্য বিক্রির সক্ষমতা রয়েছে টিসিবির।[১৩] ফলে প্রায় দ্বিগুণের বেশি উপকারভোগীর কাছে সেবা পৌঁছানোর জন্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর বা বিভাগের সহযোগিতা নিতে হয়। ফ্যামিলি কার্ডপ্রাপ্তদের কাছে সাশ্রয়ী মূল্যে পণ্য বিক্রির এ কার্যক্রমে অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্থানীয় জেলা প্রশাসন ও খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ডিলারদের সহায়তা নিতে হয়েছে। এর ফলে পুরো প্রক্রিয়ায় টিসিবির তদারকির ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে একজন উত্তরদাতা বলেছেন, 'আমাদের এলাকায় কখনোই টিসিবির কোনো ট্রাক আসে না। আমাদের এলাকা থেকে যেখানে টিসিবির ট্রাক আসে তার দূরত্ব তিন কিলোমিটারের বেশি। এ জন্য এই এলাকার কেউই টিসিবি থেকে পণ্য কেনে না।' অপর একজন উত্তরদাতা বলেন, 'সকাল ১০টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থেকে অসুস্থ হয়ে যাওয়ায় পণ্য আনতে পারিনি।'

পণ্য 'লোড' বা পেতে কার্যক্রমে দীর্ঘসূত্রতা : নির্ধারিত মজুদাগার থেকে পণ্য ট্রাকে তোলার আগে ডিলারকে বরাদ্দপত্র নিয়ে টিসিবির আঞ্চলিক বা সংশ্লিষ্ট কার্যালয় হতে অনুমতি নিতে হয়। বরাদ্দপত্র প্রাপ্তিসাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট গোডাউন থেকে পণ্য বুঝে নেন ডিলার বা বিক্রয় প্রতিনিধি। এ সময় কোনো কোনো ক্ষেত্রে পণ্য পেতে ডিলারদের নির্ধারিত গুদামে ৬ থেকে ৮ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়। টিসিবির অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা, জনবল-সংকট ও পরিকল্পনায় ঘাটতি থাকায় নির্ধারিত গোডাউন থেকে পণ্য পেতে গ্রামাঞ্চলের তুলনায় শহরাঞ্চলের ডিলারদের অধিক সময় ব্যয় করতে হয়।[১৪] কখনো কখনো নির্ধারিত পয়েন্টে যেতে সন্ধ্যা পার হয়েছে এবং বিক্রয় কার্যক্রম মধ্যরাত অবধি চালু রাখতে হয়েছে।[১৫]

দুর্গম এলাকায় পণ্য সরবরাহে টিসিবির চ্যালেঞ্জ : দেশের বিভিন্ন দুর্গম অঞ্চলগুলোয়, বিশেষ করে পার্বত্য এলাকা, দ্বীপ, চরাঞ্চল এবং দুর্যোগপূর্ণ হাওর এলাকায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে টিসিবি পণ্য সরবরাহ করতে সক্ষম হয়নি।[১৬] বান্দরবান জেলার রুমা উপজেলার দুর্গম পাহাড়ি এলাকার প্রায়

৩ হাজার ৩০০টি পরিবারের কাছে টিসিবির সাশ্রয়ী মূল্যের এসব পণ্য পৌঁছাতে পারেনি উপজেলা প্রশাসন।[১৭] তা ছাড়া টিসিবির পণ্য পরিবহনের সময় কোথাও কোথাও ট্রাক কিংবা ট্রলার দুর্ঘটনায় ওই সব এলাকার ফ্যামিলি কার্ডধারীরা সাশ্রয়ী মূল্যে পণ্য ক্রয় থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। যোগাযোগব্যবস্থা খারাপ হওয়ায় পরিবহন বাবদ অতিরিক্ত ব্যয় পণ্য বিক্রির কমিশনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়ায় চর ও হাওরাঞ্চলের কিছু ডিলার ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে পণ্য বিক্রয় কার্যক্রমে বিরত থাকায় এসব অঞ্চলের দরিদ্র জনগণ বঞ্চিত হয়।[১৮]

প্রত্যন্ত এলাকার উপকারভোগীদের চ্যালেঞ্জ : ডিলারদের অবস্থান বা বিক্রির পয়েন্ট ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়সংলগ্ন হওয়ায় প্রত্যন্ত এলাকা (বিশেষ করে চরাঞ্চল, হাওর ও দুর্গম পাহাড়ি এলাকার জনগণ) থেকে এসে পণ্য ক্রয়ে আগ্রহী ছিলেন না অনেক কার্ডধারী। কার্ডপ্রাপ্ত ৬৭ দশমিক ৬ শতাংশ উপকারভোগী সাশ্রয়ী মূল্যে পণ্য ক্রয় করলেও যাতায়াত বাবদ তাদের গড়ে ৩৩ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৩০০ টাকা পর্যন্ত খরচ করতে হয়।

দৈনিক উপার্জন ব্যাহত : কোনো কোনো বিক্রয়কেন্দ্রে একজন মাত্র বিক্রয়কর্মী থাকায় জরিপে অংশগ্রহণকারী উপকারভোগীদের গড়ে ১ দশমিক ২ ঘণ্টা লাইনে অপেক্ষা করতে হয়েছে। কোনো কোনো উপকারভোগীকে সর্বোচ্চ ১০ ঘণ্টা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপকারভোগী দৈনিক আয় থেকে বঞ্চিত হন বা দৈনিক উপার্জন বাধাগ্রস্ত হয়। তা ছাড়া পণ্য কেনার লাইনে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ অপেক্ষার কারণে বয়স্ক উপকারভোগীদের কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়েন।

স্বাস্থ্যবিধি উপেক্ষা : সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন, ২০১৮ এবং সরকারি প্রজ্ঞাপনে সরকারি কার্যক্রমে যথাযথভাবে স্বাস্থ্যবিধি পরিপালনের নির্দেশনা থাকলেও পণ্য ক্রয় করেছেন এমন তথ্যদাতাদের ৩৯ দশমিক ৫ শতাংশ বলেছেন, বিক্রয় পয়েন্টে স্বাস্থ্যবিধি মানা হয়নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্রেতারাও নিরাপদ শারীরিক দূরত্ব বজায় না রেখে পণ্য কিনতে লাইনে দাঁড়িয়েছেন।

নারী ও প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের জন্য সহায়ক ব্যবস্থা না থাকা : জরিপে অংশগ্রহণকারী ৯ দশমিক ২৫ শতাংশ উপকারভোগী নারী, প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের জন্য পৃথক লাইনের ব্যবস্থা ছিল না বলে অভিযোগ করেছেন।

বিক্রয়কেন্দ্র বা পয়েন্ট থেকে পণ্য ক্রয়ে অনিয়ম-দুর্নীতি

ফ্যামিলি কার্ডপ্রাপ্ত পরিবারগুলো নির্ধারিত বিক্রয়কেন্দ্র বা পয়েন্ট থেকে পণ্য কিনতে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হয়। জরিপে ১৩ দশমিক ৭ শতাংশ উপকারভোগী টিসিবির ট্রাক বা ডিলারের কাছ থেকে পণ্য কেনার সময় অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার হয়েছেন (নারী উপকারভোগীদের ১৩ দশমিক ৮ শতাংশ এবং পুরুষ উপকারভোগীদের ১৩ দশমমিক ৭ শতাংশ)। অপরদিকে গ্রামাঞ্চলের উপকারভোগীদের ক্ষেত্রে ১৪ দশমিক ৩ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলের উপকারভোগীদের ক্ষেত্রে ১১ দশমিক ৫ শতাংশ টিসিবির পণ্য ক্রয়ে অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার হন। উল্লেখ্য, কিছু ক্ষেত্রে পণ্য ক্রয়ের সময় ডিলার বা বিক্রয়কর্মী নিয়মবহির্ভূতভাবে প্যাকেজ মূল্যের অতিরিক্ত ৪০ থেকে ৫০ টাকা বেশি আদায় করেছেন।

সারণি ১ : পণ্য ক্রয়ে অনিয়ম-দুর্নীতির ধরন

অনিয়ম-দুর্নীতির ধরন	শতকরা হার (%)
নিম্নমানের পণ্য বিক্রি	৩৩.৩
পণ্য বিক্রির সময় সিরিয়াল না মানা	১৫.৫
বিক্রয় পয়েন্টে সময়মতো সরবরাহকারী বা ট্রাক না পৌঁছানো	১৩.১
পণ্য সরবরাহসংক্রান্ত তথ্য প্রচার না করা বা প্রচারে ঘাটতি	১৪.৩
স্বজনপ্রীতি বা প্রভাবশালী বা রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে অতিরিক্ত পণ্য বিক্রি	১০.৭
পণ্য সরবরাহকারী বা ট্রাক না আসায় অপেক্ষা করে ফেরত যাওয়া	৯.৫
সিরিয়াল আসার আগেই সরবরাহকারীর মজুদ শেষ হয়ে যাওয়া	৭.১
প্যাকেজে উল্লিখিত পরিমাণের চেয়ে কম পণ্য বিক্রি	৭.১
তালিকায় নির্ধারিত মূল্যের অতিরিক্ত দামে পণ্য ক্রয় করতে বাধ্য করা	৭.১

বিক্রয়কেন্দ্র বা পয়েন্ট থেকে নিম্নমানের পণ্য বিক্রি

টিসিবি আমদানিকারক ও অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে চাহিদা অনুযায়ী নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য কিনে মজুদ করে রাখে। ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচির জন্য দরপত্রের মাধ্যমে কেনা এসব পণ্য স্থানীয় প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে প্রতিটি জেলায় খাদ্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন (বিএডিসি) ও অন্যান্য কিছু নির্ধারিত গুদামে মজুদ করে রাখা হয়।[১৯] তবে সংরক্ষণের পদ্ধতিগত সমস্যা এবং সরবরাহ ব্যবস্থার ধীরগতি ও প্রান্তিক পর্যায়ে সংরক্ষণ জ্ঞানের অভাবে কিছু পণ্য নষ্ট হয়ে যায়। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরবরাহকারী নিম্নমানের পণ্য সরবরাহ করায় উপকারভোগীরা নিম্নমানের পণ্য ক্রয়ে বাধ্য হন।[২০] জরিপে অংশগ্রহণকারী ৩৮ দশমিক ৮ শতাংশ উপকারভোগী প্যাকেটে নিম্নমানের পণ্য পেয়েছেন। এ ক্ষেত্রে তারা দলাপাকানো ডাল, শক্ত হয়ে যাওয়া চিনি, নিম্নমানের ভোজ্যতেল পাওয়ার অভিযোগ করেন।

যেসব উপকারভোগী নিম্নমানের পণ্য পেয়েছেন, তাদের মধ্যে ৫৭ দশমিক ৭ শতাংশ উপকারভোগী ছোলা, ২৬ দশমিক ৯ শতাংশ ডাল এবং ১৫ দশমিক ৪ শতাংশ নিম্নমানের পেঁয়াজ পেয়েছেন। টিসিবির মতে, এসব পচনশীল পণ্য মজুদের জন্য ব্যবহৃত জেলা পর্যায়ের কিছু খাদ্যগুদামে বা ডিলারদের দোকানে যথাযথ আদর্শমান অনুসরণ না করায় পণ্য নষ্ট হয়েছে। এ ক্ষেত্রে কয়েকটি জেলায় পণ্য বদল করে দেওয়া হয়েছে।

চিত্র ৫ : প্যাকেজের আওতায় প্রাপ্ত নিম্নমানের পণ্য (উপকারভোগীর হার)

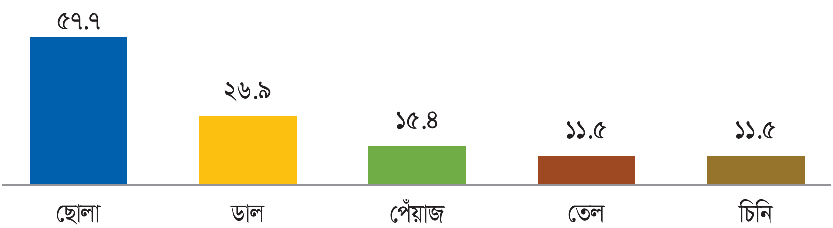

বিক্রয়কেন্দ্র বা পয়েন্ট থেকে পণ্য বিক্রয়ে পরিমাণে বা ওজনে কম দেওয়া

ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে পণ্য বিক্রির আগে একজন ক্রেতা ট্রাকে থাকা যেকোনো এক বা একাধিক পণ্য নির্দিষ্ট পরিমাণে কিনতে পারতেন। তবে এ ক্ষেত্রে ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী পণ্য মেপে দেওয়া কিছুটা সময়সাপেক্ষ বিষয় ছিল। ফলে সময় সাশ্রয় ও অপচয় রোধে এই কর্মসূচির প্যাকেজের সব পণ্য নির্ধারিত পরিমাণ অনুযায়ী প্যাকেটজাত করে ফ্যামিলি কার্ডধারী ব্যক্তিদের কাছে বিক্রি করা হয়। তবে জরিপে অংশগ্রহণকারী কোনো কোনো উপকারভোগী প্যাকেটজাত পণ্য বিক্রির কিছু ক্ষেত্রে প্যাকেট ছেঁড়া এবং পরিমাণে (১০০-২০০ গ্রাম) কম দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন। একজন উপকারভোগী মন্তব্য করেছেন, 'তেল ছাড়া সবগুলো প্যাকেট ফাটা ছিল। প্রতিটি প্যাকেটে আধপোয়া (১০০-১৫০ গ্রাম) কম ছিল।' ওজনে বা পরিমাণে কম দেওয়ার কারণে দেশের বিভিন্ন জায়গায় উপকারভোগীদের বিক্ষোভ প্রদর্শনের তথ্য পাওয়া গেছে।[২১]

তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ

তথ্য প্রকাশ ও প্রচারে ঘাটতি : স্থানীয় পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা প্রতিটি কার্ড ইস্যু করার দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেও উপকারভোগীদের অবহিতকরণ ও প্রচারণায় স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন, যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘাটতি লক্ষ করা গেছে।[২২] জরিপে কার্ড না পাওয়া উত্তরদাতাদের মধ্যে ৪৪ দশমিক ২ শতাংশ ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচি সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। তা ছাড়া স্থানীয় পর্যায়ে কর্মসূচির উপকারভোগীদের তালিকা প্রকাশ করা হয়নি।

মূল্যসহ পণ্যতালিকা প্রদর্শন : টিসিবির ওয়েবসাইটে ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে প্রাপ্ত চারটি পণ্যের মূল্যতালিকা প্রদর্শিত রয়েছে। তবে অনেক ক্ষেত্রে পণ্য বিক্রয়কেন্দ্রে বা পয়েন্টে মূল্যসহ পণ্যতালিকা প্রদর্শন করা হয়নি। জরিপে ৪৬ দশমিক ৬ শতাংশ উপকারভোগী বলেছেন, বিক্রয়কেন্দ্রে বা পয়েন্টে মূল্যতালিকা ছিল না।

পণ্য বিক্রয় তারিখ বা কেন্দ্রের অবস্থান সম্পর্কে অবহিতকরণ : সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক পণ্য বিক্রির চার দিন আগে মাইকিং করে স্থান ও সময় জনসাধারণকে জানিয়ে দেওয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। তবে জরিপে ১৪ দশমিক ৯ শতাংশ উত্তরদাতা পণ্য বিক্রির তারিখ বা কেন্দ্রের অবস্থান-সংক্রান্ত কোনো তথ্য পাননি বা কোনো প্রচারণা ছিল না বলে জানান।

জবাবদিহি ব্যবস্থায় ঘাটতি

টিসিবির ফ্যামিলি কার্ড পেতে রাজনৈতিক প্রভাব, স্বজনপ্রীতি এবং ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়ের অভিযোগ থাকলেও ব্যবস্থাপনার ঘাটতির কারণে বেশির ভাগ ব্যক্তি অভিযোগ করতে পারেননি। তা ছাড়া বিভিন্ন সময়ে টিসিবি ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ ও পণ্য বিক্রিতে অনিয়মের তথ্য পেলেও কার্যকর 'অভিযোগ নিরসনব্যবস্থা' না থাকায় কোনো কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেনি। জেলা পর্যায়ে ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ ও পণ্য বিক্রয় কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব জেলা প্রশাসকদের হওয়ায় টিসিবি সংশ্লিষ্টদের জবাবদিহি নিশ্চিতে ব্যর্থ হয়েছে।

জরিপে তালিকাভুক্তি, কার্ড বিতরণ ও পণ্য ক্রয়ে অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার হওয়া উপকারভোগীদের ৮৯ দশমিক ৯ শতাংশ অভিযোগ করেননি বা করতে পারেননি। তাদের মধ্যে ৩৪ দশমিক ৩ শতাংশ ঝামেলা বা হয়রানি বা নেতিবাচক পরিস্থিতির ভয়ে, ৩১ দশমিক ৫ শতাংশ কীভাবে অভিযোগ করতে হয় জানা না থাকায় এবং ২৭ দশমিক ৪ শতাংশ প্রয়োজন মনে না করায় অভিযোগ করেননি।

চিত্র ৬ : অভিযোগ না করার কারণ (%)

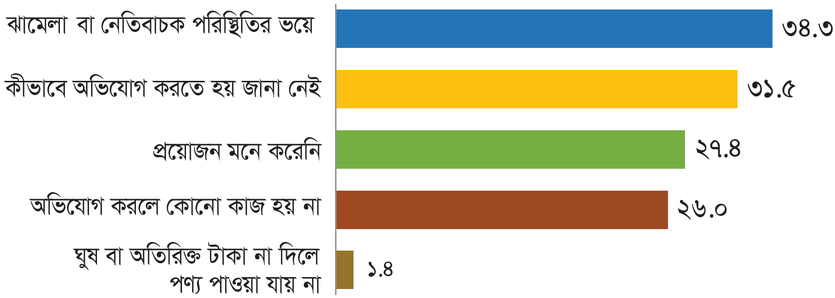

অপরদিকে টিসিবির পক্ষ থেকেও ডিলারদের বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ জানানোর কোনো ব্যবস্থা (ব্যক্তি কিংবা হটলাইন নম্বর) বিক্রয়কেন্দ্রে বা পয়েন্টে রাখা হয়নি। তবে কেউ অভিযোগ করতে চাইলে স্থানীয় প্রশাসন/জনপ্রতিনিধির কাছে করার সুযোগ থাকলেও এ বিষয়ে উপকারভোগীদের অবহিত করা হয়নি।

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে নিম্ন আয়ের পরিবারগুলোর ফ্যামিলি কার্ড প্রাপ্তি এবং সাশ্রয়ী মূল্যে পণ্য ক্রয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুশাসনের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচি জনস্বার্থে গৃহীত সরকারের একটি কর্মসূচি। কিন্তু সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সক্ষমতা যাচাইপূর্বক যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তুতি না নিয়েই দ্রুত এ ধরনের কর্মসূচি গ্রহণের ফলে বিভিন্ন পর্যায়ে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ পরিলক্ষিত হয়েছে। উপকারভোগীর তালিকাভুক্তি ও পণ্য ক্রয়ে স্বচ্ছতার ঘাটতি ও অনিয়ম-দুর্নীতির ফলে একদিকে প্রকৃত উপকারভোগীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচির তালিকা থেকে বাদ পড়েছে, অন্যদিকে উপকারভোগীদের চাহিদা, পণ্য ক্রয়ের সামর্থ্য এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রবেশগম্যতা ও অন্তর্ভুক্তির বিষয়গুলো যথাযথভাবে বিবেচনা না করায় দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে এই ইতিবাচক উদ্যোগের সুফল যথাযথভাবে পৌঁছাচ্ছে না, যা এই কর্মসূচির উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করেছে। তথ্য প্রকাশ ও প্রচারে ঘাটতি থাকার কারণে লক্ষিত উপকারভোগীদের উল্লেখযোগ্য অংশ এই কার্যক্রমের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং একই সাথে দুর্নীতির শিকার হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি করেছে। তা ছাড়া ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচিতে কার্যকর অভিযোগ নিরসনব্যবস্থা না থাকায় দুর্নীতির সাথে জড়িত ব্যক্তিদের জবাবদিহির আওতায় আনা সম্ভব হয়নি।

সুপারিশ

উপকারভোগী তালিকাভুক্তকরণ ও কার্ড বিতরণ

১. জনপ্রতিনিধি কর্তৃক উপকারভোগীদের প্রাথমিক তালিকা তৈরির পর ওয়ার্ড সভার মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের মতামতের ভিত্তিতে তালিকা চূড়ান্ত করতে হবে; এ ক্ষেত্রে নারী, প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি, দলিত, আদিবাসী, প্রভৃতি প্রান্তিক ও দুর্গম এলাকার জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

২. উপকারভোগীর চূড়ান্ত তালিকা স্থানীয় পর্যায়ে (ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা সিটি করপোরেশন) প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। সারা দেশ থেকে সংগৃহীত মোট উপকারভোগীর তালিকা মন্ত্রণালয় বা টিসিবির ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

৩. শুধু দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মাধ্যমে ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ করতে হবে এবং বিতরণের সময়, তারিখ ও স্থান ইত্যাদি তথ্য সব পর্যায়ে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. বিনা মূল্যে তালিকাভুক্তি ও কার্ড বিতরণে অর্থ লেনদেন না করার বিষয়ে উপকারভোগীদের সচেতন করতে মাঠপর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের সচেতনতামূলক কার্যক্রম (যেমন এসএমএস প্রদান, ফ্যামিলি কার্ডে এ ধরনের তথ্য মুদ্রণ করে দেওয়া ইত্যাদি) পরিচালনা করতে হবে। এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত হলে কোথায় অভিযোগ জানাতে হবে তা প্রচার করতে হবে।

সাশ্রয়ী মূল্যে পণ্য বিক্রি ও তদারকি

৫. উপকারভোগীদের চাহিদা ও সামর্থ্য যাচাইয়ের মাধ্যমে প্যাকেজে পণ্যের ধরন, পরিমাণ ও মূল্য নির্ধারণ করতে হবে; প্যাকেজভিত্তিক পণ্য বিক্রির পাশাপাশি অতিদরিদ্র ব্যক্তি যাদের প্যাকেজের সব পণ্য একসাথে ক্রয়ের সক্ষমতা নেই, তাদের চাহিদা ও সামর্থ্য অনুযায়ী স্বল্প পরিমাণে পণ্য বিক্রির ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৬. পণ্যের গুণগত মান, পরিমাণ, কেন্দ্র বা পয়েন্ট খোলা থাকার সময় এবং অবস্থান পরিবীক্ষণে 'ট্যাগ টিম'-এর কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।

৭. বিক্রয়কেন্দ্রের বা পয়েন্টের সংখ্যা বাড়াতে হবে এবং এসব কেন্দ্র লক্ষিত জনগোষ্ঠীর কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি

৮. প্যাকেজে পণ্যের ধরন, পরিমাণ, নির্ধারিত মূল্য, ইত্যাদি তথ্য বিক্রয়কেন্দ্রে প্রদর্শন করতে হবে; অভিযোগ দায়ের করার সুবিধার্থে টিসিবি বা সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির হটলাইন নম্বর বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর, ইত্যাদি প্রদর্শন করতে হবে।

৯. তালিকাভুক্তি ও সাশ্রয়ী মূল্যে পণ্য বিক্রি করার ক্ষেত্রে অনিয়ম-দুর্নীতির সাথে জড়িত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

১০. উপকারভোগীর প্রণীত তালিকা এবং তালিকা প্রস্তুত প্রক্রিয়া নিয়ে একটি স্বাধীন নিরীক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং ইতিমধ্যে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত সচ্ছল পরিবারগুলোকে বাদ দিতে হবে।

তথ্যসূত্র

[১] ডয়চে ভেলে, ‘কোভিড ইন বাংলাদেশ : হাই হ্যাভ লকডাউনস প্লাঙ্কজড মিলিয়ন ইনটু পোভার্টি’, ১৬ নভেম্বর ২০২১, বিস্তারিত দেখুন: https://www.dw.com/en/covid-in-bangladesh-how-have-lockdowns-plunged-millions-into-poverty/a-59835993

[২] দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, ‘রমজানে এক কোটি পরিবারকে ভর্তুকি মূল্যে খাদ্য সরবরাহ করবে সরকার’, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২, বিস্তারিত দেখুন: https://www.tbsnews.net/bangla/83335

[৩] টিআইবি, করোনাভাইরাস সংকট মোকাবিলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ : দ্বিতীয় পর্ব, ১০ নভেম্বর ২০২০, ঢাকা, বিস্তারিত দেখুন: https://www.ti-bangladesh.org/beta3/index.php/en/research-policy/96-fact-finding-studies/6197-2020-11-10-04-21-36

[৪] টিআইবির ‘করোনাভাইরাস সংকট মোকাবিলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ : দ্বিতীয় পর্ব’-এর গবেষণার জরিপ কার্যক্রমের জন্য ২০২০ সালের আগস্ট মাসে জেলা পর্যায় থেকে ‘২৫০০ টাকা নগদ সহায়তা’ কর্মসূচির উপকারভোগীর তালিকা সংগ্রহ করা হয় এবং নির্বাচিত নমুনা থেকে জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

[৫] ডয়চে ভেলে, ‘ইউক্রেনের অজুহাতে দ্রব্যমূল্যে আরও আগুন’, ৪ মার্চ ২০২২, বিস্তারিত দেখুন: https://p.dw.com/p/4827j

[৬] সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য।

[৭] প্রথম আলো, ‘এক কোটি পরিবার টিসিবির পণ্য পাবে দুই ধাপে, রোববার শুরু’, ১৯ মার্চ ২০২২, বিস্তারিত দেখুন: https://tinyurl.com/2wkddyu2

[৮] বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পরিপত্র-১, নং-২৬.০০.০০০০.১১৩.০৬.০৩৯.২০.৮৪, ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২২

[৯] দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, ‘রমজানে এক কোটি পরিবারকে ভর্তুকি মূল্যে খাদ্য সরবরাহ করবে সরকার’, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২, বিস্তারিত দেখুন: https://www.tbsnews.net/bangla/83335

[১০] জাগো নিউজ টোয়েন্টিফোর ডট কম, ‘৩২টি নিত্যপণ্যের ১৯টির দাম বেড়েছে’, ১৯ মে ২০২২ বিস্তারিত দেখুন: https://www.jagonews24.com/economy/news/762779|

[১১] দৈনিক ইনকিলাব, ‘২৮% ভর্তুকিতে টিসিবির “প্যাকেজ পণ্য” বিক্রি করবে সরকার’, ১৯ মার্চ ২০২২ বিস্তারিত দেখুন : https://m.dailyinqilab.com/article/471372/|

[১২] বিডি নিউজ টোয়েন্টিফোর ডট কম, ‘টিসিবির ট্রাকে পণ্য বিক্রি বন্ধ কেন, ব্যাখ্যা দিলেন বাণিজ্যমন্ত্রী’, ১৬ মে ২০২২ বিস্তারিত দেখুন: https://bangla.bdnews24.com/business/article2061521.bdnews||

[১৩] টিসিবির কর্মকর্তাদের সাথে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার; ঢাকা; সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ২২ জুন ২০২২।

[১৪] দৈনিক খোলা কাগজ, ‘টিসিবির পণ্যের জন্য কাড়াকাড়ি-হাহাকার,’ ১০ মার্চ ২০২২ বিস্তারিত দেখুন: http://www.kholakagojbd.com/national/97040।

[১৫] *প্রাগুক্ত*।

[১৬] দৈনিক আজকের পত্রিকা, ‘টিসিবির পণ্য পৌঁছায়নি দুর্গম পাহাড়ি এলাকায়’, ২৮ মার্চ ২০২২ বিস্তারিত দেখুন: https://www.ajkerpatrika.com/163688/।

[১৭] জাগো নিউজ টোয়েন্টিফোর ডট কম, ‘হাওরে ডুবে গেল টিসিবির পণ্যবাহী নৌকা,’ ২১ এপ্রিল ২০২২, বিস্তারিত দেখুন: https://www.jagonews24.com/country/news/756121।

[১৮] দৈনিক প্রথম আলো, ‘সুনামগঞ্জে টিসিবির পণ্য পাচ্ছে না মানুষ,’ ১১ মে ২০২২, বিস্তারিত দেখুন: https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/।

[১৯] দৈনিক সমকাল, ‘কোটি পরিবারের জন্য সরকারের উদ্যোগ : ফ্যামিলি কার্ডে দরিদ্রের হাতে টিসিবির পণ্য’, ২১ মার্চ ২০২২, বিস্তারিত দেখুন: https://samakal.com/bangladesh/article/2203102435/।

[২০] জাগো নিউজ টোয়েন্টিফোর ডট কম, ‘টিসিবির পেঁয়াজ নিয়ে বিপাকে সবাই’, ৯ এপ্রিল ২০২২, বিস্তারিত দেখুন: https://www.jagonews24.com/economy/news/753032।

[২১] এনটিভি অনলাইন, 'নবীগঞ্জে টিসিবির পণ্য ওজনে কম দেওয়ায় বিক্ষোভ', ২২ মার্চ ২০২২, বিস্তারিত দেখুন: https://www.ntvbd.com/bangladesh/ -1042025।

[২২] The Daily Star, `Family Cards confuse many: Some don't know where to get them, return home from TCB outlets empty-handed'; The Daily Star; 21 March 2022, available at: https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/family-cards-confuse-many-2986851।

করোনা-সংকট মোকাবিলায় সাড়াদানকারী বেসরকারি সংস্থাগুলোর ভূমিকা : চ্যালেঞ্জ ও করণীয়*

মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান সাখিদার, মো. শাহ্নূর রহমান ও মো. শহিদুল ইসলাম

প্রেক্ষাপট

২০১৯ সালের শেষের দিকে চীনে করোনাভাইরাসের (কোভিড-১৯) প্রাদুর্ভাব ঘটার পর দ্রুততার সাথে বিশ্বব্যাপী এর বিস্তার ঘটতে থাকে[১] এবং বৈশ্বিকভাবে একটি মহামারির রূপ ধারণ করে।[২] কোভিড-১৯ অতিমারি বিশ্বের অধিকাংশ দেশের মতো বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবা-ব্যবস্থা এবং সার্বিক আর্থসামাজিক অবস্থাকে এক অভূতপূর্ব সংকটে ফেলে। ২০২০ সালের ৮ মার্চ বাংলাদেশে প্রথম কোভিড আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হওয়ার পর থেকে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দ্রুত বাড়তে শুরু করে। উপরন্তু করোনার বিস্তার মোকাবিলার জন্য গৃহীত নন-থেরাপিউটিক কৌশল হিসেবে আরোপিত সাধারণ ছুটি ও লকডাউন ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসা, ক্ষুদ্রঋণ কর্মকাণ্ড, সাধারণ কর্মজীবী ও খেটে খাওয়া মানুষের কর্মসংস্থানসহ সার্বিকভাবে দেশের আর্থসামাজিক অবস্থা স্থবির ও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করে।[৩]

দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নশীল জনবহুল একটি দেশ হিসেবে বাংলাদেশে এই মহামারির কারণে সৃষ্ট ক্ষতির অনুপাত তুলনামূলকভাবে বেশি। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) প্রকাশিত এক গবেষণাপত্র অনুসারে, কোভিড-১৯ মহামারির ফলে অর্থনৈতিক ক্ষতির আশঙ্কা ৭৭ বিলিয়ন ডলার থেকে ৩৪৭ বিলিয়ন ডলার, যেখানে এই মহামারি চলাকালে এশিয়ার দেশগুলো প্রায় ২২ বিলিয়ন ডলার লোকসানের সম্মুখীন হতে পারে।[৪] করোনাকালীন প্রথম বছরে দেশের প্রায় ১৫ শতাংশ মানুষ নতুন করে দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমেছে। ঝুঁকিগ্রস্ত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যেমন অতিদরিদ্র, প্রতিবন্ধী, নারী, উদ্বাস্তু, বস্তি ও দুর্গম এলাকায় বসবাসকারী মানুষদের ক্ষেত্রে করোনার নেতিবাচক প্রভাব ছিল বেশি।[৫] করোনাকালে ১৩ শতাংশ বাল্যবিবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা ২৫ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি।[৬]

বাংলাদেশের সূচনালগ্ন থেকেই বিভিন্ন সংকটময় পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকারের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা এগিয়ে এসেছে। মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে ত্রাণ ও পুনর্বাসনে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান এবং পরবর্তী সময়ে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্যদানের কর্মসূচির মাধ্যমে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোর দেশে উন্নয়নে অংশীদারত্বের একটি নতুন ধারা সৃষ্টি করে।[৭] বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় ও মানবিক সহায়তায় সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাগুলো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২ অনুসারে বেসরকারি সংস্থাগুলোকে দুর্যোগ মোকাবিলা ও প্রস্তুতিতে সরকারের সহায়ক শক্তি বা অংশীজন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং সরকারি ও বেসরকারি

---

* ২০২২ সালের ১৩ জানুয়ারি ঢাকায় ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ।

সমন্বিত কার্যক্রমের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও করোনা-সংকটের প্রাথমিক পর্যায়ে বেসরকারি সংস্থাগুলোকে সরকারি নীতিকৌশল ও কর্মপন্থার সাথে কার্যকরভাবে যুক্ত না করার অভিযোগ ওঠে।

তবে উদ্ভূত এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের পাশাপাশি একদিকে যেমন বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা নিজ নিজ অবস্থান হতে বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নেয়, অন্যদিকে করোনা-সংকটের শুরুর দিকে বেসরকারি সংস্থাগুলোর (এনজিও) যথাযথ ভূমিকা নিয়ে বিভিন্ন মহল হতে প্রশ্ন ওঠে। এ বিষয়ে বিভিন্ন সমালোচনামূলক মন্তব্য ও অভিযোগও গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। করোনা-সংকট মোকাবিলায় বিভিন্ন খাত ও বিষয়ভিত্তিক গবেষণা পরিচালিত হলেও সুনির্দিষ্টভাবে বেসরকারি সংস্থাগুলোর ভূমিকা ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে গবেষণার অপ্রতুলতা রয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে করোনা-সংকট মোকাবিলায় বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগ ও অবদানের ব্যাপ্তি এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ ও শুদ্ধাচার চর্চা পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে টিআইবি এই গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য করোনা-সংকট মোকাবিলায় সাড়াদানকারী বেসরকারি সংস্থাগুলোর ভূমিকা ও চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনা করা। এ ছাড়া সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো হলো :

- করোনা-সংকট মোকাবিলায় সাড়াদানকারী বেসরকারি সংস্থাগুলোর উদ্যোগ ও অবদান পর্যালোচনা করা;
- করোনা-সংকট মোকাবিলায় সাড়াদানকারী বেসরকারি সংস্থাগুলোর কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনা করা;
- করোনা-সংকট মোকাবিলায় সাড়াদানকারী বেসরকারি সংস্থাগুলোর কার্যক্রমে শুদ্ধাচার পর্যালোচনা করা এবং
- গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে করণীয় নির্ধারণে সুপারিশ প্রদান করা।

গবেষণার পরিধি

এনজিওবিষয়ক ব্যুরো, সমাজসেবা অধিদপ্তর, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ) ও সরকারের অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক নিবন্ধিত কেবলমাত্র করোনা-সংকট মোকাবিলায় সাড়াদানকারী বেসরকারি সংস্থাগুলোই এ গবেষণার আওতাভুক্ত। ব্যক্তিমালিকানাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান করোনা-সংকটকালে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখলেও ওই গবেষণার আওতায় তাদের রাখা হয়নি। গবেষণায় সংস্থাগুলোর সাড়া প্রদানের ধরন ও কাজের ব্যাপ্তি, সহযোগী অংশীজন হিসেবে সরকারের করোনাকালীন বিভিন্ন কর্মসূচিতে অবদান ও ভূমিকা পালন, বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার উপকারভোগীদের অভিজ্ঞতা, কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয়, করোনা-সংকট মোকাবিলায় বেসরকারি সংস্থাগুলোর কার্যক্রমে শুদ্ধাচার চর্চা এবং বিভিন্ন তদারকি প্রতিষ্ঠানের ভূমিকার মতো বিষয়গুলো পর্যালোচনা করা হয়েছে। শুদ্ধাচারের চারটি নির্দেশকের (স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, অংশগ্রহণ ও সমন্বয় এবং দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ) ওপর ভিত্তি করে তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

গবেষণাপদ্ধতি ও সময়কাল

এটি একটি মিশ্র পদ্ধতির গবেষণা। গুণবাচক ও পরিমাণবাচক উভয় পদ্ধতিই এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে নির্বাচিত বেসরকারি সংস্থাগুলোর প্রধান নির্বাহী বা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তা এবং উপকারভোগীদের ওপর দুটি পৃথক জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে।

সারণি ১ : তথ্যের ধরন, তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি, টুলস ও তথ্যদাতার ধরন

তথ্যের ধরন	তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি	টুলস	তথ্যদাতার ধরন
প্রত্যক্ষ তথ্য	জরিপ (অনলাইন ও টেলিফোন)	প্রশ্নপত্র	• নির্বাচিত বেসরকারি সংস্থার প্রধান নির্বাহী বা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তা • উপকারভোগী
	মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার	চেকলিস্ট	• এনজিওবিষয়ক ব্যুরো, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি এবং সমাজসেবা অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, এনজিওকর্মী, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা
পরোক্ষ তথ্য	প্রাসঙ্গিক প্রতিবেদন ও গবেষণা নিবন্ধ, গবেষণাভুক্ত সংস্থার ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য এবং গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ পর্যালোচনা		

নমুনায়ন পদ্ধতি

বেসরকারি সংস্থা নির্বাচন

বেসরকারি সংস্থা নির্বাচনের ক্ষেত্রে দুই পর্যায়বিশিষ্ট স্তরায়িত গুচ্ছ নমুনায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। প্রথম ধাপে সারা দেশ থেকে ৪৪টি জেলা নির্বাচন করা হয়। দ্বিতীয় ধাপে নির্বাচিত জেলাগুলোতে কার্যক্রম পরিচালনাকারী আন্তর্জাতিক, জাতীয় এবং স্থানীয় সংস্থাগুলোকে দৈবচয়নের মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়। নির্বাচিত মোট ১১৭টি প্রতিষ্ঠানকে প্রশ্নপত্র প্রেরণ করা হয়। তার মধ্যে ৭৪টি প্রতিষ্ঠান তা পূরণ করে ফেরত পাঠায়, যার মধ্যে ৯টি আন্তর্জাতিক, ২৩টি জাতীয় এবং ৪২টি স্থানীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান ছিল।

উপকারভোগী নির্বাচন

উপকারভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে টিআইবি পরিচালিত জাতীয় খানা জরিপ ২০১৭ অনুযায়ী বেসরকারি সংস্থা থেকে সেবাগ্রহণকারী ৬ হাজার ২৮১ খানাকে এই গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বাছাই করা মোট ৭৫০ জন উপকারভোগীর মধ্যে চূড়ান্তভাবে ৫৮৯ জন উপকারভোগী জরিপে অংশগ্রহণ করেছে। উল্লেখ্য, টেলিফোনের মাধ্যমে উপকারভোগীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।

২০২০ সালের জুলাই থেকে ২০২১ সালের ডিসেম্বর সময়ে গবেষণার কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। গবেষণার অংশ হিসেবে উপকারভোগীর জরিপের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে ১-১০ ডিসেম্বর ২০২০ এবং বেসরকারি সংস্থার জরিপের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে ২৫ নভেম্বর থেকে ২০ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখের মধ্যে।

গবেষণার ফলাফল

করোনা-সংকট মোকাবিলায় বেসরকারি সংস্থাগুলোর উদ্যোগ ও অবদান

বেসরকারি সংস্থাগুলোর উদ্যোগ গ্রহণের সময়

গবেষণায় অংশগ্রহণকারী সংস্থাগুলোর তিন-চতুর্থাংশের বেশি (৭৭ দশমিক ৫ শতাংশ) প্রতিষ্ঠান প্রথম তিন মাসের মধ্যে (মার্চ ২০২০-মে ২০২০) কোভিড-১৯-সংক্রান্ত কার্যক্রম শুরু করে (চিত্র ১)। উল্লেখ্য, করোনা-সংকট মোকাবিলার প্রস্তুতির অংশ হিসেবে ২০২০ সালের জানুয়ারিতেই জাতীয় পর্যায়ের কয়েকটি বেসরকারি সংস্থা নিজ উদ্যোগে প্রস্তুতি ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে।*

চিত্র ১ : বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগ গ্রহণের সময়ের বিন্যাস

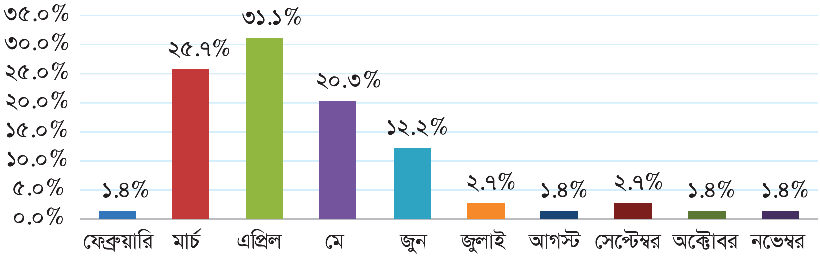

বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

করোনা-সংকট মোকাবিলায় বেসরকারি সংস্থাগুলো যে ধরনের উদ্যোগ ও কার্যক্রম গ্রহণ করে তার মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরামর্শ, স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, খাদ্যসহায়তা, সুরক্ষাসামগ্রী বিতরণ, ত্রাণসহায়তা, করোনা আক্রান্ত মৃত ব্যক্তির লাশ দাফন/ সৎকার, নগদ অর্থসহায়তা, পরিবর্তিত আর্থসামাজিক পরিস্থিতিবিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রায় সবগুলো প্রতিষ্ঠানই করোনা-সংকট মোকাবিলায় উল্লিখিত কোনো না কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করে।

চিত্র ২ : করোনা মোকাবিলায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের গৃহীত কার্যক্রম

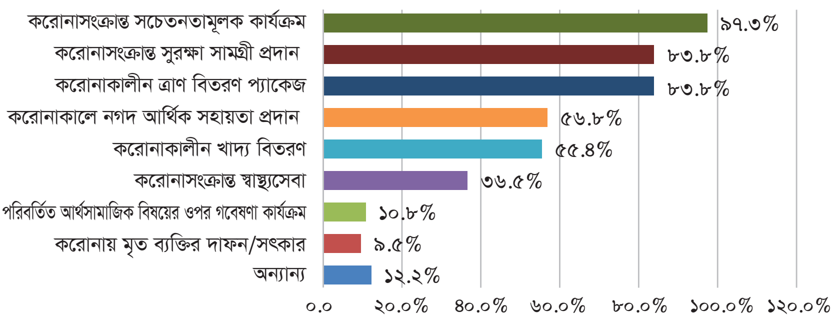

* ২০২০ সালের জানুয়ারিতে প্রাথমিক প্রস্তুতির অংশ হিসেবে ব্র্যাক ও সাজেদা ফাউন্ডেশন কাজ করে।

করোনা-সংক্রান্ত সচেতনতামূলক কার্যক্রম

জরিপে অংশগ্রহণকারী ৯৭ দশমিক ৩ শতাংশ সংস্থা সরকারি নির্দেশনা অনুসরণ করে সামাজিক দূরত্ব মেনে চলা, মাস্ক পরিধান করা, নিয়মিত ও সঠিক পদ্ধতিতে হাত ধোয়া, 'লকডাউন' ও হোম কোয়ারেন্টাইন মেনে চলা ইত্যাদি সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে (চিত্র ২)। সামাজিক সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে এসব সংস্থা সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ, মাইকিং, পোস্টার ও ব্যানার টানানো ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি সঠিক নিয়মে হাত ধোয়াবিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং নিরাপদ দূরত্ব মেনে চলাবিষয়ক ক্যাম্পেইনের মতো কার্যক্রমেও সম্পৃক্ত হয়েছে। উল্লেখ্য, গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত উপকারভোগীদের ৪৬ শতাংশ বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক গৃহীত সচেতনতা কার্যক্রমের আওতায় এসেছে, যাদের মধ্যে ৭২ দশমিক ৫ শতাংশ উপকারভোগী এলাকায় মাইকিংয়ের মাধ্যমে এবং ৪৯ দশমিক ১ শতাংশ উপকারভোগী প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে সচেতনতামূলক বার্তা পেয়েছে।

সারণি ২ : বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য সচেতনতামূলক কর্মসূচির বিবরণ

প্রতিষ্ঠান	সচেতনতামূলক কর্মসূচি
ব্র্যাক	৭.৮ কোটি মানুষকে ইন-হাউস প্রশিক্ষণের মাধ্যমে করোনা প্রতিরোধ ও প্রতিকার বিষয়ে সচেতনতামূলক সেবা বা ওরিয়েন্টেশন প্রদান[৮]
	৮৫টি উপজেলায় ফার্মাসিস্টদের মাঝে ৩২০০০ কপি করোনাসংক্রান্ত বিশেষ গাইডলাইন বিতরণ[৯]
	ঈদুল আজহায় স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক মাইকিং ও বিভিন্ন গার্মেন্টসে ব্যানার টাঙানো[১০]
	টিকা বিষয়ে সঠিক তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে ৫০টি জাতীয় পত্রিকায় তিনটি থিমেটিক প্রতিবেদন, বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে ১০টি টক শো ও ২৫৯টি পোস্ট সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করা[১১]
আরডিআরএস বাংলাদেশ	প্রায় ৩৮,৩৩,০৯১ টাকা ব্যয়ে স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ এবং স্থানীয় কমিউনিটি রেডিওতে স্বাস্থ্য ও সরকারি বিভিন্ন নির্দেশনাবিষয়ক অনুষ্ঠান প্রচার[১২]
কারিতাস বাংলাদেশ	৪৩টি জেলার ২২৬,৪০৩ বাড়ির প্রায় ১১,৩১,৭৬৫ মানুষের কাছে সচেতনতামূলক বার্তা পৌঁছানো[১৩]
এস কে এস ফাউন্ডেশন	৫২০০০ লিফলেট বিতরণ, ৫৫০টি ফেস্টুন, ২০টি রোমান ব্যানার ও দুটি বিলবোর্ড প্রদর্শন[১৪]
	স্থানীয় কমিউনিটি রেডিও ও দৈনিক পত্রিকার মাধ্যমে সচেতনতামূলক বার্তা পৌঁছানো[১৫]
এ ছাড়া করোনা-সংকটের শুরুতেই ব্যুরো বাংলাদেশ ২২ লাখ, আশা ২০ লাখ, টিএমএসএস ৮ লাখ, গণউন্নয়ন কেন্দ্র ১.৫ লাখ ও আইসিসিও করপোরেশন ৫০ হাজার সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করে[১৬]	

চিত্র ৩ : উপকারভোগীদের মতে, বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক গৃহীত সচেতনতামূলক কার্যক্রমের বিন্যাস

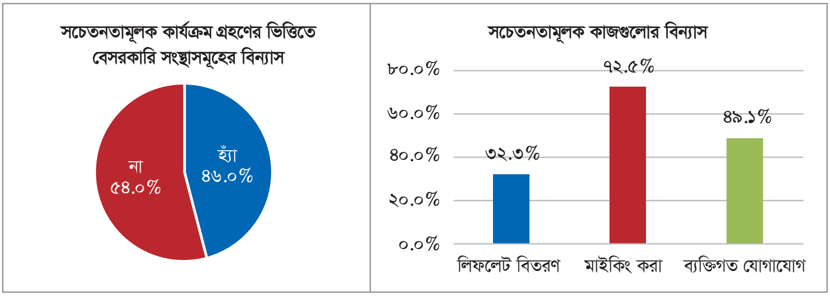

চিত্র ৩ থেকে দেখা যাচ্ছে, গবেষণার অন্তর্ভুক্ত উপকারভোগীদের ৪৬ শতাংশের বসবাসরত এলাকায় কোনো না কোনো এনজিও বা বেসরকারি সংস্থা কমিউনিটি পর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য কাজ করেছিল। যাদের এলাকায় বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছিল, তাদের ৭২ দশমিক ৫ শতাংশ বলেছেন যে তাদের এলাকায় সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মাইকিং করা হয়েছে এবং ৪৯ দশমিক ১ শতাংশ বলেছেন যে বেসরকারি সংস্থাগুলো তাদের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে সচেতনতা চেষ্টা করেছে। এ ছাড়া ৩২ দশমিক ৩ শতাংশ বলেছেন যে তাদের এলাকায় সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে।

খাদ্য ও ত্রাণসামগ্রী বিতরণ কার্যক্রম

জরিপে অংশগ্রহণকারী সংস্থাগুলোর ৫৫ দশমিক ৪ শতাংশ খাদ্য ও খাদ্যসামগ্রী বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করে। সংকট মোকাবিলায় কিছু কিছু বেসরকারি সংস্থা থেকে খাদ্যসামগ্রী প্রদানের পাশাপাশি ত্রাণ প্যাকেজও বিতরণ করা হয়েছে। সংস্থাগুলোর ৮৩ দশমিক ৮ শতাংশ ত্রাণসামগ্রী (প্যাকেজ) বিতরণ করে; ত্রাণ প্যাকেজের মধ্যে খাদ্যসামগ্রী, সুরক্ষাসামগ্রীসহ ক্ষেত্রবিশেষে নগদ অর্থও অন্তর্ভুক্ত ছিল। উদাহরণস্বরূপ, একটি জাতীয় এনজিও ১,৫৪,৬৭০টি পরিবারের মধ্যে ১১ দশমিক ৫২ কোটি টাকা মূল্যমানের ২,৪৭৫ মেট্রিক টন খাদ্য এবং আরেকটি প্রতিষ্ঠান দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রতিদিন ১০,০০০-১,৫০,০০০ বাক্স করে মোট প্রায় ১ কোটি বাক্স খাদ্য বিতরণ করে।

সারণি ৩ : বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য খাদ্য ও ত্রাণ বিতরণ কর্মসূচির বিবরণ

প্রতিষ্ঠান	খাদ্য ও ত্রাণ বিতরণ কর্মসূচি
ব্র্যাক	২৫,৩৪০টি পরিবারের মধ্যে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করে, যার মধ্যে ছিল অতিদরিদ্র পরিবার, পক্ষাঘাতগ্রস্ত ব্যক্তি, যৌনকর্মী, আদিবাসী, বয়স্ক নাগরিক ইত্যাদি[১৭]
ব্যুরো বাংলাদেশ	৫১,৬১৭টি পরিবারের মধ্যে প্রায় ৫.১০ কোটি টাকার খাদ্যসামগ্রী বিতরণ[১৮]
আশা	১,৫৪,৬৭০টি পরিবারের মধ্যে ১১.৫২ কোটি টাকা মূল্যমানের ২,৪৭৫ মেট্রিক টন খাদ্য বিতরণ[১৯]
গণ উন্নয়ন কেন্দ্র	ক্ষতিগ্রস্ত ও কর্মহীন ৮,৫৪১ পরিবারকে ত্রাণসহায়তা[২০]

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন...

...পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পরের অংশ

প্রতিষ্ঠান	খাদ্য ও ত্রাণ বিতরণ কর্মসূচি
সাজেদা ফাউন্ডেশন	ঢাকা শহরের ভাসমান জনগোষ্ঠীর মধ্যে ২,৭৯৮ জনকে ৩,৩৫,৭৬০ টাকা ব্যয়ে তৈরি খাবারসহ[২১] ৩,১৬,২৩২ জনকে খাদ্যসহায়তা প্রদান[২২]
আরডিআরএস বাংলাদেশ	২১,৩৩,৮৯৭ টাকা ব্যয়ে ৬,২৩,৫৪৬ পরিবারের মধ্যে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ[২৩]
বিদ্যানন্দ ফাউন্ডেশন	‘এক টাকার আহার’ কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রতিদিন ১০০০০-১৫০০০০ বাক্স এবং মোট প্রায় ১ কোটি বাক্স খাদ্য বিতরণ[২৪]
আইসিসিও করপোরেশন	২৮০ জন তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তিসহ ৩,৪৫০ বাড়িতে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ[২৫]
এএলআরডি	ভূমিহীন, দলিত ও আদিবাসী প্রায় ৩,০০০ পরিবারের মধ্যে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ[২৬]

কোভিড-১৯-সংক্রান্ত স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম

জরিপে অংশগ্রহণকারী বেসরকারি সংস্থাগুলোর প্রায় ৩৬ দশমিক ৫ শতাংশ (২৭টি) করোনা-সংক্রান্ত স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে। স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের মধ্যে সন্দেহভাজন আক্রান্ত ব্যক্তির নমুনা সংগ্রহের বুথ স্থাপন, টেলিকাউন্সেলিং, হাসপাতালে অক্সিজেন সিলিন্ডার সরবরাহ, অ্যাম্বুলেন্স সেবা প্রদান, আইসোলেশন ইউনিট স্থাপন, কোভিড ডেডিকেটেড ফিল্ড হাসপাতাল স্থাপন, আইসিইউ সেবা চালু ও কোভিড রোগীর চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

সারণি ৪ : বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচির বিবরণ

প্রতিষ্ঠান	স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি
ব্র্যাক[২৭]	৬টি জেলায় ১১৬টি নমুনা সংগ্রহের বুথ স্থাপন, ৯টি টিকাদান কেন্দ্র পরিচালনা এবং গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত ৩,০০০ টিকাদান কেন্দ্রকে সহায়তা প্রদান
	মানসিক স্বাস্থ্যসেবায় ‘মনের যত্ন মোবাইলে’ নামক মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন এবং ‘মনের কথা’ নামক অনলাইন ফোরাম চালু
	আইইডিসিআরের হটলাইনে ২০ জন ডাক্তার নিয়ুক্তকরণ
সাজেদা ফাউন্ডেশন	৫৭০৫ জন আইসিইউ রোগীকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান[২৮]
এসকেএস ফাউন্ডেশন	গাইবান্ধায় ১০০ শয্যাবিশিষ্ট আইসোলেশন কেন্দ্র স্থাপনে সহায়তা[২৯]
গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র[৩০]	বিভিন্ন সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে টেকনিক্যাল সহায়তার পাশাপাশি গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালে করোনা আক্রান্তদের জন্য নিবেদিত ১৫ শয্যাবিশিষ্ট আইসিইউ সেবা চালু
	করোনা শনাক্তে র‍্যাপিড টেস্ট কিট উদ্ভাবন, যা এখনো সরকারের অনুমোদনের অপেক্ষায়
ঢাকা আহছানিয়া মিশন	৪০টি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে জরুরি ওষুধ ও অ্যাম্বুলেন্স সহায়তা প্রদান[৩১]

করোনাসংক্রান্ত সুরক্ষাসামগ্রী বিতরণ

৮৩ দশমিক ৮ শতাংশ সংস্থা সুরক্ষাসামগ্রী বিতরণ করে। সুরক্ষাসামগ্রীর মধ্যে পিপিই, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, জীবাণুমুক্তকরণ কক্ষ ও হাত ধোয়ার পয়েন্ট স্থাপন উল্লেখযোগ্য। উদাহরণস্বরূপ, একটি আন্তর্জাতিক এনজিও ১ কোটি ৩০ লাখ মাস্ক এবং ৩০ লাখ সুরক্ষাসামগ্রী বিতরণ করে, অন্যদিকে একটি জাতীয় এনজিও চিকিৎসকদের জন্য ২ কোটি ৮৭ লাখ ৬০ হাজার ২০০ টাকা ব্যয়ে ২০ হাজার ৫৪৩ সেট ব্যক্তিগত সুরক্ষাসামগ্রী (পিপিই) প্রদান করে।

নগদ অর্থসহায়তা প্রদান

জরিপে অংশগ্রহণকারী ৫৬ দশমিক ৮ শতাংশ প্রতিষ্ঠান করোনাকালে দুস্থ ও অসহায় মানুষকে নগদ অর্থসহায়তা প্রদান করে। ত্রাণ প্যাকেজের সাথে একত্রে এবং পৃথকভাবে এই নগদ অর্থ প্রদান করে। কিছু প্রতিষ্ঠান কর্মীদের এক দিনের বেতন প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান করে। করোনা-সংকটের শুরুর দিকে একটি এনজিও প্রায় ৬০ কোটি টাকা নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদান করে।

সারণি ৫ : বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য নগদ অর্থ বিতরণ কর্মসূচির বিবরণ

প্রতিষ্ঠান	নগদ অর্থ বিতরণ কর্মসূচি
সাজেদা ফাউন্ডেশন	১৬,২৩,৮৩৫ টাকা নগদ অর্থসহায়তা প্রদান ও কর্মীদের এক দিনের বেতন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান[৩২]
ব্র্যাক	মোট ৩,৯৪,৪৭১ পরিবারের মধ্যে প্রায় ৬০ কোটি টাকা বিতরণ[৩৩]
	‘ডাকছে আবার দেশ’ ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ ও বিতরণ অব্যাহত[৩৪]
টিএমএসএস	প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মীদের এক দিনের বেতন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান
আরডিআরএস বাংলাদেশ	২৪,৮৬২ পরিবারের মধ্যে ৩,৮৬,৪৩,০০০ টাকার অনুদান প্রদান[৩৫]
রাজবাড়ী উন্নয়ন সংস্থা (রাস)	৩০০ যৌনকর্মীকে ৭০০ টাকা করে নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদান[৩৬]
আশ্রয়	৪০০ কর্মহীন ও দরিদ্র অসহায় আদিবাসীকে ৭৫০ টাকা করে মোট ৩ লাখ টাকা নগদ অর্থ বিতরণ[৩৭]
সেভ দ্য চিলড্রেন	১৩৫,৯৬৫ পরিবারকে নগদ অর্থ প্রদান[৩৮]
এসকেএস ফাউন্ডেশন	৪,৮০৩ পরিবারের মধ্যে নগদ অর্থ প্রদান[৩৯]
সোসাইটি ফর সোশ্যাল সার্ভিস	টাঙ্গাইলে যৌনকর্মীদের জনপ্রতি ৩০০ টাকা হিসেবে ৫১০ জনকে আর্থিক সহায়তা প্রদান[৪০]

করোনাবিষয়ক গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম

করোনাকালীন স্বাস্থ্যবিষয়ক গবেষণার পাশাপাশি পরিবর্তিত আর্থসামাজিক বিভিন্ন বিষয়ের ওপর গবেষণা ও দ্রুততার সাথে সেগুলোর ফলাফল প্রকাশের ক্ষেত্রে বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানগুলো

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উদাহরণস্বরূপ নাগরিক সংগঠন বাংলাদেশ হেলথ ওয়াচ এবং ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের জেমস পি গ্রান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথ ব্যক্তিগত সুরক্ষাসামগ্রীর (পিপিই) বিষয়ে সম্মুখসারীর স্বাস্থ্যকর্মীদের মতামত নিয়ে জরিপের ফলাফল প্রকাশ করে ২০২০ সালের এপ্রিল মাসে। জেমস পি গ্রান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথের ২২০ জন কর্মকর্তা তাদের বর্ধিত বেতন আর বোনাসের টাকা গ্রহণ না করে গবেষণার কাজে লাগিয়েছেন। ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের তথ্য অনুযায়ী তারা ইতিমধ্যে ১৬টি গবেষণার কাজ সম্পন্ন করেছিল এবং বর্তমানে আরও ৩২টি গবেষণার কাজ চলমান। ব্যক্তিগত সুরক্ষাসামগ্রীর মান নিয়ে করোনা-সংকটের শুরুর দিকে বেশ আলোচনার জন্ম হয়। সে সময় বাংলাদেশ হেলথ ওয়াচ ব্যক্তিগত সুরক্ষাসামগ্রীর (পিপিই) বিষয়ে সম্মুখসারীর স্বাস্থ্যকর্মীদের ওপর জরিপ পরিচালনা ও ফলাফল প্রকাশসহ জুলাই ২০২০ পর্যন্ত আটটি জরিপ সম্পন্ন করে।

লাশ দাফন বা সৎকার

করোনার সময়ে করোনায় আক্রান্ত হয়ে এবং করোনার লক্ষণ নিয়ে মৃতদের দাফন ও সৎকার অন্যতম চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেয়। জরিপে অংশগ্রহণকারী ৯ দশমিক ৫ শতাংশ প্রতিষ্ঠান করোনায় মৃত ব্যক্তির লাশ দাফন ও সৎকারে ভূমিকা পালন করেছে। এসব সংস্থার মধ্যে আল মানহিল, আল মারকাজুল ইসলাম, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন, রহমতে আলম সমাজসেবা সংস্থা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। আল মারকাজুল ২৮ মার্চ, ২০২০ হতে করোনায় মৃত ব্যক্তির লাশ দাফন বা সৎকার শুরু করে। ৮ জুলাই, ২০২১ পর্যন্ত তারা ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে মোট ৪ হাজার ৯৯৫ জন করোনায় মৃত ব্যক্তির লাশ দাফন বা সৎকার করেছে।

> ‘লাশের গোসল থেকে শুরু করে দাফনসহ বিভিন্ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে আমরা যখন ঘরে ফিরি, তখন নিজেরাই বুঝতে পারি না জীবিত আছি কি না। সুরক্ষা পোশাক- পিপিই, হাতে গ্লাভস, চোখে চশমাসহ পুরো পোশাক পরে গরমের মধ্যে কাজ করা যে কতটা কষ্টসাধ্য, তা বলে বোঝানো যাবে না। দমবন্ধ হয়ে আসে একেক সময়। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে লাশ নিয়ে রাজধানীর তালতলা কবরস্থানে কবর দেওয়া পর্যন্ত বেশির ভাগ সময় মৃত ব্যক্তিদের স্বজনেরাও কাছে আসেন না ভয়ে। তবে আমরা ভয় পাই না। এই মৃত ব্যক্তিরা তো আমাদেরই কারও না কারও স্বজন।’
>
> *- লাশ দাফন ও সৎকারের কাজে নিয়োজিত একজন স্বেচ্ছাসেবী*

অভিবাসীদের জন্য গৃহীত কার্যক্রম

করোনা অতিমারির ফলে কর্মহীন প্রবাসী শ্রমিকদের রেমিট্যান্স সংকট, অভিবাসন-প্রত্যাশী বা ছুটিতে থাকা প্রবাসীদের কর্মস্থলে যোগ দিতে না পারা, বিভিন্ন রাষ্ট্র হতে প্রবাসীদের ফেরত পাঠানোসহ বিভিন্ন সংকটে কিছু সংস্থা সহযোগিতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে। গৃহীত কার্যক্রমগুলোর মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত অভিবাসী ও তাদের পরিবারকে অর্থসহায়তা, পুনর্বাসন করা, আইনি সহায়তা ও কাউন্সেলিং সেবা প্রদান উল্লেখযোগ্য। উদাহরণস্বরূপ ঢাকার দক্ষিণখানে অবস্থিত রামরুর মাইগ্র্যান্ট সাপোর্ট সেন্টারের মাধ্যমে অসংখ্য অভিবাসী যারা জরুরি ভিত্তিতে দেশে ফিরেছিল তাদের থাকা এবং খাদ্যের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এ ছাড়া কিছু দুস্থ আদিবাসী নারীর চিকিৎসাসেবা দেওয়ার

পাশাপাশি দুস্থ অভিবাসী, বিশেষ করে যাদের করোনার সময় দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে সেই সব পরিবারকে অর্থ ও খাদ্যসহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

এ ছাড়া অভিবাসীদের জন্য ব্র্যাকের গৃহীত কার্যক্রমগুলোর মধ্যে ফেরত আসা ১ হাজার ২৩৩ জন প্রবাসী এবং ৬৮টি প্রবাসী পরিবারকে কাউন্সেলিং সেবা প্রদান, ৭ হাজার ক্ষতিগ্রস্ত প্রবাসীর পরিবারকে নগদ অর্থসহায়তা, ৫ হাজার অভিবাসীকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহযোগিতা প্রদান ও বিদেশ থেকে প্রত্যাগতদের কোয়ারেন্টাইনের জন্য সরকারকে ৪৩০টি আবাসন কক্ষ প্রদান উল্লেখযোগ্য।

প্রণোদনা প্যাকেজের ঋণ বিতরণ

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী প্রণোদনা প্যাকেজের ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে অন্যান্য খাত বা প্রতিষ্ঠানের চেয়ে ক্ষুদ্রঋণ সংস্থা তুলনামূলকভাবে অধিক কার্যকরভাবে প্রান্তিক ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঋণ বিতরণ করে। প্রান্তিক ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য নির্ধারিত ৩ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে বিতরণের জন্য প্রায় ২,৭৭৩.৮৪ কোটি টাকার বরাদ্দ অনুমোদন করা হয় এবং ১৮৪টি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ২,১৩৭.৮১ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়। এসব সংস্থার মাধ্যমে প্রান্তিক ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর ৩ লাখ ৬০ হাজার ৬৩৬ জন গড়ে ৪২ হাজার ৯২৫ টাকা প্রণোদনা ঋণ পায় যার মধ্যে নারীর সংখ্যা ৩ লাখ ২৪ হাজার ৫৬০ জন।[৪১]

সরকারের অংশীজন হিসেবে ভূমিকা পালন

গবেষণায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর ৬৮ শতাংশ সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমে সহায়ক অংশীজন হিসেবে কাজ করে, যাদের মধ্যে ৯২ শতাংশ প্রতিষ্ঠানই সরকারের করোনাবিষয়ক সচেতনতামূলক কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছিল। এ ছাড়া ৬৪ শতাংশ প্রতিষ্ঠান ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমে এবং ৪৪ শতাংশ প্রতিষ্ঠান আর্থিক সহায়তামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, প্রায় ৩০ শতাংশ করোনাসংক্রান্ত স্বাস্থ্যসেবা এবং ৪ শতাংশ প্রতিষ্ঠান করোনায় মৃত ব্যক্তিদের লাশ দাফন বা সৎকারসংক্রান্ত কার্যক্রমে সরকারের সাথে সম্মিলিতভাবে কাজ করেছে।

চিত্র ৪ : সরকারের অংশীজন হিসেবে ভূমিকা পালনের হার

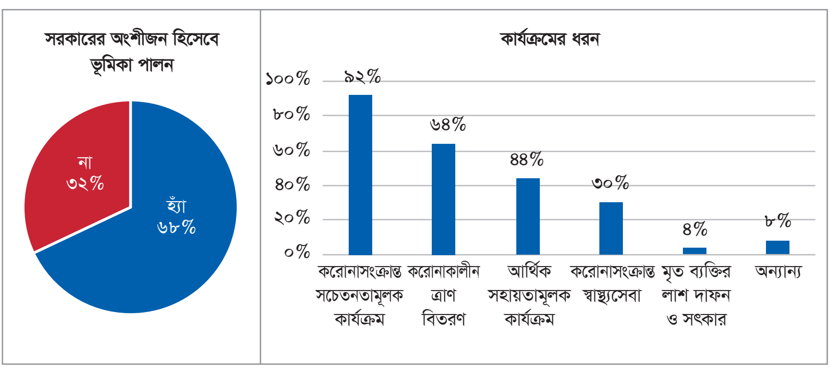

কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে বেসরকারি সংস্থাগুলোর সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো করোনাকালীন তাদের গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে তার মধ্যে তহবিল-সংকট, উপকারভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে জটিলতা, রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা, স্থানীয় ক্ষমতাশালীদের প্রভাব, প্রশাসন থেকে বিভিন্ন বিষয়ে অনুমোদন গ্রহণের ক্ষেত্রে জটিলতা, দুর্গম এলাকায় ত্রাণ পৌঁছানো, জনপ্রতিনিধিদের অসহযোগিতামূলক আচরণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া পর্যাপ্ত সুরক্ষাসামগ্রীর অভাবে প্রাথমিক পর্যায়ে অনেক বেসরকারি সংস্থা মাঠপর্যায়ে তাদের কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে পারেনি। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৬৬ দশমিক ২ শতাংশ প্রতিষ্ঠান করোনা পরিস্থিতিতে কোনো না কোনো ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে।

চিত্র ৫ : মাঠপর্যায়ে কর্মসূচি বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জের ক্ষেত্র

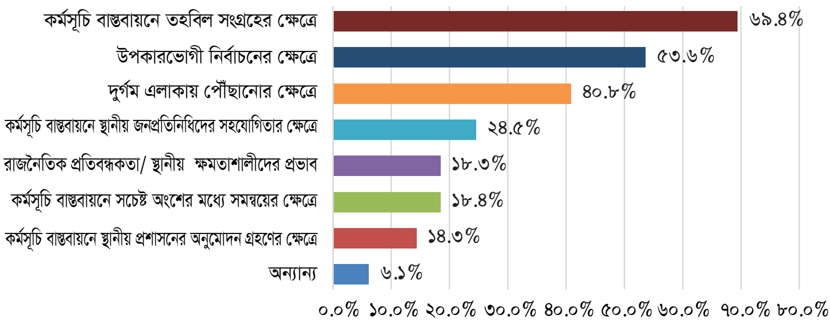

তহবিল-সংকট

করোনা-সংকট মোকাবিলায় বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে এই গবেষণা জরিপের অন্তর্ভুক্ত দুই-তৃতীয়াংশের বেশি সংস্থার তহবিলের মূল উৎস ছিল সাধারণ তহবিল (জেনারেল ফান্ড) ও তাদের চলমান প্রকল্প বা প্রকল্পগুলোর তহবিল। এ ছাড়া ৩৬ দশমিক ৫ শতাংশ প্রতিষ্ঠান কোভিডসংক্রান্ত নতুন তহবিল গঠন করেছে কিংবা সংগ্রহ করেছে। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৮৩ দশমিক ৭ শতাংশ প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন দাতা সংস্থার অর্থায়নে তাদের নিয়মিত কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করে থাকে। এর মধ্যে ৩৫ শতাংশ প্রতিষ্ঠানের চলমান প্রকল্পগুলো থেকে করোনার সময়ে দাতা সংস্থাগুলো গড়ে প্রায় ২৫ শতাংশ তহবিল হ্রাস করে। এর ফলে এসব প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশেরই (৮৬ দশমিক ৪ শতাংশ) প্রকল্পের ব্যয় সংকোচন করতে হয়। তখন চলমান প্রকল্প স্থগিত করে, কর্মীদের বেতন-ভাতা কমিয়ে অথবা কর্মী ছাঁটাই করে তাদের সংকুচিত তহবিলের সাথে সমন্বয় সাধন করতে হয়েছে। ক্ষুদ্রঋণকেন্দ্রিক

> ‘প্রতিষ্ঠানগুলো তেমন সমস্যা ফেস করেছে কি না, সেটা জানি না। তবে তাদের আর্থিক সংকট ছিল। কোনো প্রতিষ্ঠানই সরকারি অনুদান পায়নি। সে ক্ষেত্রে আমি ব্যক্তিগত তহবিল থেকে সাবান দিয়েছি প্রতিবন্ধীদের। চ্যালেঞ্জ মূলত অর্থের সমস্যা।’ - *একজন সমাজসেবা কর্মকর্তা*

প্রতিষ্ঠানগুলোকেও এই সময়ে আর্থিক সংকটের মধ্যে পড়তে হয়েছে। স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে করোনার সময়ে (মার্চ ২০২০-জুন ২০২১) প্রায় ৪৫ হাজার কোটি টাকা কম ঋণ বিতরণ হয় এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর ৩০ শতাংশ আয় হ্রাস পেয়েছে। এমআরএর তথ্য অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রায় ৫০০ কোটি টাকার সামাজিক কার্যক্রম বন্ধ ছিল। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৫৪ শতাংশ প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত এবং করোনাকালে সব প্রতিষ্ঠানই কার্যক্রম বন্ধ হওয়ার ঝুঁকির সম্মুখীন হয়েছে।

চিত্র ৬ : তহবিল কর্তনের প্রভাব

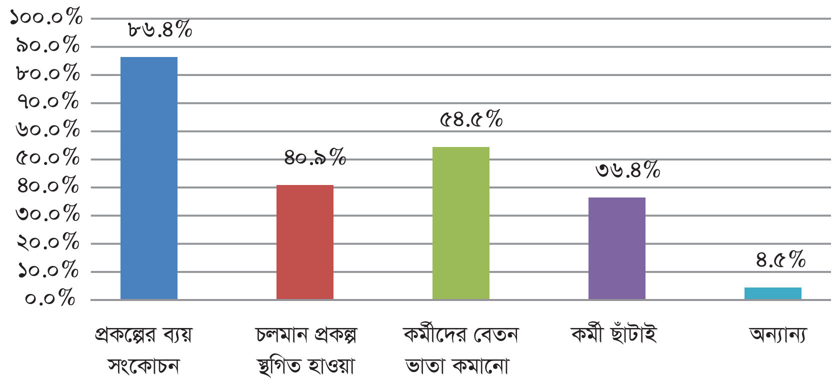

উপকারভোগীদের তালিকা প্রণয়নে জটিলতা ও ক্ষমতাশীলদের প্রভাব

গবেষণায় অংশগ্রহণকারী অর্ধেকেরও বেশি (৫৩ দশমিক ৬ শতাংশ) সংস্থা উপকারভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে বেসরকারি সংস্থাগুলো স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও রাজনৈতিক প্রভাবশালীদের প্রভাবের কারণে উপযুক্ত না হওয়া সত্ত্বেও উপকারভোগী তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে বাধ্য হওয়ার অভিযোগ করেছে। এ ছাড়া ১৮ দশমিক ৩ শতাংশ সংস্থা তাদের কার্যক্রম বাস্তবায়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা এবং স্থানীয় ক্ষমতাশালীদের প্রভাবের শিকার হয়েছে। আবার ক্ষেত্রবিশেষে দলিত জনগোষ্ঠীর তালিকা প্রণয়নে দলিত কমিউনিটির নেতা কর্তৃক পরিচিতজনদের তালিকাভুক্ত করতে প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ পাওয়া গেছে। সহায়তাপ্রার্থীদের

> 'সীমিত অর্থ দিয়ে অনেক মানুষকে সহায়তা করার সুযোগ ছিল না। অনেকে বঞ্চিত ছিল, কিন্তু অগ্রাধিকারভিত্তিতে প্রদানের পরও সুবিধাভোগীদের অনেকে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। তা ছাড়া স্থানীয় প্রশাসনকে অবহিত করে ত্রাণ ও খাদ্যসামগ্রী প্রদান করতে হয়। এ ক্ষেত্রে কর্মসূচি পরিকল্পনায় পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠী তথা দলিত, হরিজন, তৃতীয় লিঙ্গ– এদের বাদ দিয়ে প্রশাসন হতে প্রদত্ত তালিকা অনুসরণ করতে বলা হয়। এটিও একটি বড় ধরনের সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ।'
> - *এনজিও প্রতিনিধি*

হার বেশি থাকার কারণে তালিকা প্রণয়নের ক্ষেত্রেও সংস্থাগুলোকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। এ ছাড়া গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত দুটি প্রতিষ্ঠান জেলা প্রশাসন কর্তৃক উপকারভোগীর তালিকা প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ করে।

অন্যান্য চ্যালেঞ্জ

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৪১ শতাংশ প্রতিষ্ঠান দুর্গম এলাকায় ত্রাণ পৌঁছানোর ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। এ ছাড়া প্রায় ২৫ শতাংশ প্রতিষ্ঠান কর্মসূচি বাস্তবায়নে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের অসহযোগিতার কথা উল্লেখ করেছে।

তহবিল সংগ্রহ, ব্যয় ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে শুদ্ধাচার চর্চা

তদারকি প্রতিষ্ঠানের মুখ্য তথ্যদাতাদের মতে, বেসরকারি সংস্থাগুলোর তহবিল সংগ্রহ ও ব্যয়ে তেমন কোনো অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া না গেলেও গবেষণার অন্যান্য সূত্রানুসারে একটি এনজিওর ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে। এনজিওটির বিপক্ষে প্রকল্পবিষয়ক বিভিন্ন সভা, সেমিনার ও প্রশিক্ষণে অনুপস্থিত স্থানীয় পর্যায়ের জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা, স্বাস্থ্যকর্মীদের স্বাক্ষর জালিয়াতির মাধ্যমে সম্মানী ও প্রশিক্ষণভাতা আত্মসাৎ, বরাদ্দকৃত আপ্যায়ন খরচের এক-তৃতীয়াংশ খরচ করে বাকি অংশ ভুয়া বিল-ভাউচারের মাধ্যমে আত্মসাতের মতো গুরুতর অভিযোগ পাওয়া যায়।

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত বেসরকারি সংস্থাগুলোর উপকারভোগী যাদের করোনা-সংকটকালে সাহায্যের প্রয়োজন ছিল, তাদের ১৪ শতাংশ সাহায্য পাওয়ার জন্য কোনো না কোনো বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার তালিকাভুক্ত হয়েছিল। তাদের মধ্যে ৩২ দশমিক ২ শতাংশ তালিকা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সমস্যা বা অনিয়মের অভিযোগ করেছে। তালিকাভুক্তদের ২০ শতাংশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে তদবির করতে হয়েছে বলে জানিয়েছে। এ ছাড়া কেউ কেউ স্বজনপ্রীতি এবং তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পরও ত্রাণ না পাওয়ার অভিযোগ করেছে। উল্লিখিত সমস্যা ও অনিয়মের পরিপ্রেক্ষিতে নয়জন উপকারভোগী সংশ্লিষ্ট সংস্থায় অভিযোগ দায়ের করেছিল এবং সবার ক্ষেত্রেই অভিযোগ গ্রহণ করা হলেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। অন্যদিকে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে চারটি (৫ দশমিক ৪ শতাংশ) প্রতিষ্ঠানে উপকারভোগীরা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম বা কর্মসূচি নিয়ে অভিযোগ দায়ের করে। এ ক্ষেত্রে প্রায় সবাই উপকারভোগী নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগ করে।

সাহায্যপ্রার্থীদের একটি সাধারণ অভিযোগ ছিল উপযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও কোনো সাহায্য না পাওয়া। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিরা চাহিদার তুলনায় তহবিলের অপ্রতুলতা প্রধান কারণ হতে পারে বলে মনে করেন। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত অন্য একজন সমাজসেবা কর্মকর্তা এ-সম্পর্কে বলেন, 'অনেকেই অভিযোগ দিয়েছে যে তারা পাওয়ার যোগ্য ছিল, কিন্তু অপ্রতুলতার জন্য পায়নি।'

স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশে ঘাটতি

কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ সংস্থারই করোনাকালীন গৃহীত কর্মসূচির ধরন, আওতা, ব্যয়, উপকারভোগীর তথ্য সংস্থার ওয়েবসাইটে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করা হয়নি। কিছু প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচির ধরন দেওয়া থাকলেও তার আওতা ও ব্যয় উল্লেখ করা হয়নি।

ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে অনিয়ম

করোনাকালীন বিভিন্ন মেয়াদে ক্ষুদ্রঋণের কিস্তি আদায় বন্ধ রাখা ও সুবিধাজনক সময়ে ঋণ বা কিস্তি পরিশোধের নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও ক্ষুদ্রঋণ সংস্থাগুলোর একাংশ কর্তৃক ঋণের কিস্তি আদায়ের অভিযোগ পাওয়া গেছে। জরিপে অংশগ্রহণকারী উপকারভোগীর ৭১ শতাংশ কোনো না কোনো এনজিওর ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের নিয়মিত উপকারভোগী। এদের প্রায় ২৬ শতাংশ করোনাকালীন ঋণের কিস্তি পরিশোধে সমস্যার সম্মুখীন হন। প্রায় ২৩ শতাংশ ঋণগ্রহীতার অভিযোগ ছিল করোনাকালীন সময়ে তাদের ঋণের কিস্তি পরিশোধের জন্য চাপ প্রয়োগ করা হয়েছিল, প্রায় ৬ দশমিক ২ শতাংশ কিস্তি আদায়ের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মীর দ্বারা অশোভন আচরণের শিকার হয়েছিলেন এবং ২ দশমিক ১ শতাংশ এ ব্যাপারে হুমকিও পেয়েছিলেন। আবার কেউ কেউ সুদের হার বৃদ্ধি করে দেওয়া, কিস্তি পরিশোধ করতে না পারায় জরিমানার শিকার হওয়ার মতো গুরুতর অভিযোগও করেছেন।

চিত্র ৭ : কিস্তি পরিশোধের ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হওয়া সেবাগ্রহীতাদের বিন্যাস ও সমস্যার ধরন

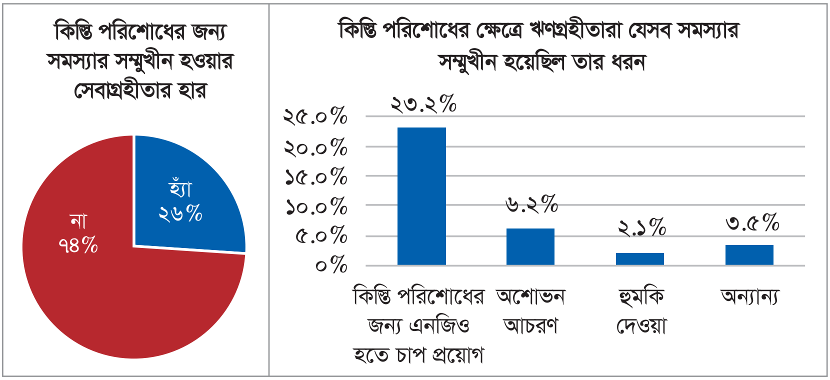

করোনা-সংকট মোকাবিলায় সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সমন্বয়

> "স্থানীয় পর্যায়ে সমন্বয়হীনতা ছিল। দেখা গেছে যেখানে আমরা আজকে ত্রাণ দিয়েছি, পরবর্তীতে ঐখানে আরেকটি প্রতিষ্ঠান ত্রাণ দিয়েছে। আবার দূরবর্তী দুর্গম এলাকায় আমরাও যেতে পারিনি। অন্য প্রতিষ্ঠানও ঐখানে যায়নি।"
> *- এনজিও প্রতিনিধি*

করোনাকালীন সংকট মোকাবিলার প্রাথমিক পর্যায়ে কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে, বিশেষ করে স্থানীয় পর্যায়ে সমন্বয়হীনতা ছিল লক্ষণীয়। সমন্বয়হীনতার কারণের মধ্যে বেসরকারি সংস্থাগুলো তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে অবহিত না করা, ক্ষেত্রবিশেষে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ব্যস্ততা বা সময় না দেওয়া, উপজেলা পর্যায়ে এনজিও সমন্বয় সভা নিয়মিত না হওয়া, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রমের সমন্বিত ডেটাবেইস বা ম্যাপ না থাকা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তবে পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি পেয়েছে। সচেতনতা

বৃদ্ধি, ত্রাণের তালিকা প্রণয়ন, ত্রাণ বিতরণ, স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, করোনায় মৃত ব্যক্তির লাশ দাফন, সৎকারসহ বিভিন্ন কার্যক্রমে সরকারের অংশীজন হিসেবে বেসরকারি সংস্থাগুলো সম্পৃক্ত হয়। শহরের বস্তিগুলোতে ত্রাণ সরবরাহে সমন্বয়হীনতা এড়ানোর জন্য একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা (ব্র্যাক) আরবান স্লাম ম্যাপ প্রণয়ন করে। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৬৮ শতাংশ সংস্থা বলেছে, তারা সরকারের অংশীজন হিসেবে বিভিন্ন ধরনের কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

তদারকি প্রতিষ্ঠান ও উন্নয়ন সহযোগীদের ভূমিকা

এনজিওবিষয়ক ব্যুরোর ভূমিকা

অতিমারির সময়ে প্রকল্প অনুমোদন ও বাজেট অনুমোদনের ক্ষেত্রে এনজিওবিষয়ক ব্যুরো অনলাইন কার্যক্রম চালু করে। ফলে প্রথম দিকে সাময়িকভাবে বাধাগ্রস্ত হলেও অনলাইন কার্যক্রমের কারণে প্রকল্প ও বাজেট অনুমোদন কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালিত হয়েছে। এনজিওবিষয়ক ব্যুরো মার্চ ২০২০ থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত মোট ১৭৮টি এনজিওর ২২৮টি প্রকল্পের (এফডি-৭) বিপরীতে দাতা সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত মোট ৪২৬ কোটি টাকা অনুমোদন ও অর্থ ছাড় করে। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ২৭টি প্রতিষ্ঠান কোভিড-১৯-সংক্রান্ত নতুন তহবিলে কাজ করেছে; এর মধ্যে ২৩টি প্রতিষ্ঠানই এনজিওবিষয়ক ব্যুরো থেকে প্রকল্পের অনুমোদনের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হয়নি।

অন্যান্য তদারকি প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা

এমআরএ ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য বিভিন্ন নির্দেশনা, যেমন অফিস জীবাণুমুক্ত রাখা, অফিসে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রাখা, করোনার সময়ে ঋণের কিস্তি আদায়ে চাপ না দেওয়া বা কিস্তি আদায় বন্ধ রাখা, ক্ষুদ্রঋণ ছাড়া অন্যান্য সাক্ষাৎপ্রার্থীর অফিসে আসা নিরুৎসাহিত করা, করোনাকালীন ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সাথে জড়িত কর্মীদের চাকরিচ্যুত না করা, সমিতির সভা বা উঠান বৈঠক বন্ধ রাখা, ডিজিটাল পদ্ধতিতে লেনদেন বাড়ানো ইত্যাদি নির্দেশনা প্রদান করে। ক্ষুদ্রঋণ সেবাগ্রহীতাদের অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির লক্ষ্যে এমআরএ একজন পরিচালক ও আটজন উপপরিচালকের সমন্বয়ে একটি মনিটরিং সেল গঠন হলেও অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির কোনো নথি সংরক্ষণ করা হয়নি। অন্যদিকে করোনা উদ্ভূত সংকট মোকাবিলায় সমাজসেবা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের পক্ষ থেকে অধিদপ্তরের আওতায় নিবন্ধিত ৫৬ হাজার বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাকে প্রতিদিন অন্তত দুটি পরিবারের কাছে প্রয়োজনীয় সামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে চিঠি দেওয়া হয়।

দাতা সংস্থার ভূমিকা

করোনাকালীন উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় দাতা সংস্থা যে অর্থ প্রদান করেছে, তার মধ্যে এনজিওবিষয়ক ব্যুরো জুন ২০২১ পর্যন্ত ২২৮টি প্রকল্পের (এফডি-৭) বিপরীতে মোট ৪২৬ কোটি টাকার অনুমোদন ও অর্থছাড় দেয়। জাতিসংঘের সেন্ট্রাল ইমার্জেন্সি রেসপন্স তহবিল (সিইআরএফ) বাংলাদেশে করোনা-সংকট মোকাবিলায় সাড়াদানকারী তিনটি জাতীয় (ব্র্যাক, ফ্রেন্ডশিপ ও রিচিং পিপলস ইন নিড) এবং দুটি আন্তর্জাতিক সংস্থাকে (সেভ দ্য চিলড্রেন, ওয়ার্ল্ড ভিশন) প্রায় ২৬ কোটি টাকা অনুদান দেয়, যা মূলত বাংলাদেশে আশ্রয়প্রাপ্ত রোহিঙ্গাদের স্বাস্থ্যসেবা, পানি, পয়ঃসেবা ও পরিচ্ছন্নতাসংক্রান্ত কর্মসূচির জন্য বরাদ্দ ছিল।[৪২] কোভিড-১৯ অতিমারিতে সাড়া দিতে এবং

ভবিষ্যতের সংকট মোকাবিলায় দৃঢ়ভাবে প্রস্তুত হতে বাংলাদেশ সরকার বিশ্বব্যাংকের সাথে মোট ১ দশমিক শূন্য ৪ বিলিয়ন ডলারের তিনটি অর্থায়ন চুক্তি স্বাক্ষর করে, যা বংলাদেশকে করোনার বিরুদ্ধে টিকাদান কর্মসূচি ব্যাপক সম্প্রসারণসহ অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারকে ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করার কথা। এ ছাড়া করোনা শনাক্ত, প্রতিরোধ ও এর চিকিৎসার ক্ষেত্রে দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে এই অর্থ ব্যবহার করার কথা।[৪৩]

উপসংহার

কোভিড-১৯ সংকট মোকাবিলায় সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে অংশীজন হিসেবে বেসরকারি সংস্থাগুলোর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের কোভিড-১৯-সংক্রান্ত তহবিল ও চলমান প্রকল্পের তহবিল ছাড়াও সাধারণ তহবিল থেকে ত্রাণ ও খাদ্যসহায়তা, নগদ অর্থ বিতরণ, সচেতনতামূলক কার্যক্রম, স্বাস্থ্যসেবা ও সুরক্ষাসামগ্রী প্রদান, লাশ দাফন, সৎকারসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্রুততার সাথে সাড়া প্রদান করে। সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ থেকে প্রান্তিক ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রঋণ সংস্থাগুলো তুলনামূলক বেশি কার্যকর ছিল। নিয়মিত আয়ের উৎস না থাকা, দাতা সংস্থা কর্তৃক তহবিল হ্রাস এবং ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হওয়ায় করোনা-সংকট মোকাবিলায় কর্মসূচি বাস্তবায়নে সংস্থাগুলোর তহবিল সংকট ছিল মূল চ্যালেঞ্জ। অন্যদিকে করোনা অতিমারির সময়েও ত্রাণ বিতরণের ক্ষেত্রে উপকারভোগীর তালিকা প্রণয়নে স্থানীয় ক্ষমতাশীলদের নেতিবাচক প্রভাব ছিল। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ বেসরকারি সংস্থার করোনা কর্মসূচি সংক্রান্ত তহবিল সংগ্রহ ও ব্যয়ে তেমন কোনো অনিয়ম চিহ্নিত না হলেও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের ঘাটতি ছিল। করোনাকালীন বিভিন্ন মেয়াদে ক্ষুদ্রঋণের কিস্তি আদায় বন্ধ রাখার নির্দেশনা থাকলেও বেশ কিছু সংস্থার বিরুদ্ধে কিস্তি আদায়ে চাপ প্রয়োগের অভিযোগ পাওয়া যায়। করোনাকালীন প্রাথমিক পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সমন্বয়হীনতা দেখা যায়। পরবর্তী সময়ে স্বাস্থ্যসেবা, ত্রাণ বিতরণসহ বিভিন্ন কার্যক্রমে সমন্বয়ের উন্নয়ন ঘটলেও বেসরকারি সংস্থা ও তদারকি সংস্থার অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থায় ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়।

সুপারিশ

করোনাভাইরাসের কারণে সৃষ্ট সংকট মোকাবিলায় সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাগুলোর কার্যকর অংশগ্রহণ এবং বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণের জন্য এই গবেষণার ফলাফলের আলোকে নিচের সুপারিশসমূহ প্রস্তাব করা হলো–

১. করোনাকালে তৃণমূল পর্যায়ে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোর বিভিন্ন কার্যক্রমের (সচেতনতা বৃদ্ধি, খাদ্যসহায়তা, স্বাস্থ্যসেবা, নগদ অর্থসহায়তা এবং ত্রাণ তৎপরতা) ধারাবাহিকতা রক্ষা এবং সমন্বয় সাধন করতে হবে।

২. বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক করোনাকালীন গৃহীত কর্মসূচির ধরন, আওতা, ব্যয়, উপকারভোগীর তথ্য ইত্যাদি নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ ও নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করতে হবে।

৩. করোনাকালীন মাঠপর্যায়ে বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রম, বিশেষ করে উপকারভোগীদের ত্রাণসংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তিতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে তদারকি সংস্থা কর্তৃক মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।

৪. কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমন্বয়হীনতা নিরসনে তদারকি সংস্থা কর্তৃক উপকারভোগীদের তথ্যসংবলিত একটি সমন্বিত ডেটাবেইস ও ডিজিটাল ম্যাপ তৈরি করতে হবে।

৫. যেকোনো দুর্যোগ পরিস্থিতি সফলভাবে মোকাবিলায় সরকারকে শুরু থেকেই কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের সব এনজিও নেটওয়ার্ক/প্ল্যাটফর্মকে সাথে নিয়ে একটি যৌথ সমন্বিত কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

৬. করোনা-সংকট মোকাবিলায় দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে সরকার ও দাতা সংস্থাগুলোর কর্মপরিকল্পনায় স্থানীয় পর্যায়ের বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোর সম্পৃক্ততা বাড়াতে হবে এবং কর্মসূচিতে অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জীবিকায়ন ও সামাজিক সুরক্ষা খাতের আওতা বৃদ্ধি করতে হবে।

৭. বিভিন্ন দুর্যোগে বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক সাড়াপ্রদান কার্যক্রম পরিচালনের জন্য সরকার কর্তৃক এবং দাতা সংস্থা কর্তৃক দুটি ভিন্ন তহবিল গঠন করতে হবে।

৮. বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোর সক্ষমতা বিবেচনায় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, বিশেষ করে টিকা নিবন্ধন কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।

৯. আর্থিক ঝুঁকিতে পড়া স্থানীয় পর্যায়ের সংস্থাগুলোকে টিকে থাকার জন্য সরকার ও দাতা সংস্থা কর্তৃক নীতিসহায়তা ও আর্থিক প্রণোদনা দিতে হবে।

১০. ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে করোনাকালীন সংকট মোকাবিলায় সহজ শর্তে, স্বল্প সময়ে, কম সুদে ঋণপ্রাপ্তির ধারাবাহিকতার পাশাপাশি ঋণগ্রহীতা সদস্যদের উৎপাদিত পণ্য ন্যায্যমূল্যে বাজারজাতকরণের সুবিধা প্রদান করতে হবে।

তথ্যসূত্র

১ Dong E, Du H, Gardner L. An interactive web-based dashboard to track COVID-19 in real time. *Lancet Infect Dis.* (2020). doi: 10.1016/S1473-3099(20)30120-1)

২ Liu YC, Kuo RL, Shih SR. COVID-19: The first documented coronavirus pandemic in history. Biomedical journal. 2020 Aug 1;43(4):328-33.

৩ Islam K, Ali S, Akanda SZ, Rahman S, Kamruzzaman AH, Pavel SA, Baki J. COVID-19 Pandemic and Level of Responses in Bangladesh. Int J Rare Dis Disord. 2020;3:019.

৪ https://bids.org.bd/uploads/publication/BUS/BUS38/06_Jahan_%20Economy%20&%20COVID%2019.pdf

৫ BRAC COVID-19 Yearbook 2020

৬ *যুগান্তর*, ডা. মো. হাবিবে মিল্লাত, 'করোনাকালের নয়া মহামারি "বাল্যবিবাহ"', ৩১ জুলাই ২০২১, বিস্তারিত দেখুন : করোনাকালের নয়া মহামারি 'বাল্যবিবাহ' (jugantor.com)

৭ বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, সালেহউদ্দিন আহমেদ, বাংলাপিডিয়া [accessed on: 2 November,2021]

৮ BRAC COVID-19 Yearbook 2020

৯ প্রাগুক্ত

১০ প্রাগুক্ত

[১১] COVID-19 Situation Update (Sep 2), available at: https://www.brac.net/covid19/res/sitrep/BRAC-COVID-19-Situation-Update_Bangladesh_Sept-6.pdf [accessed on 05 November,2021]

[১২] আরডিআরএস হতে প্রাপ্ত তথ্যমতে

[১৩] Caritas Bangladesh Response to COVID-19 Pandemic, Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh, available at: https://bdplatform4sdgs.net/caritas-bangladesh-response-to-covid-19-pandemic/ [accessed on 05 November,2021]

[১৪] এসকেএসের ওয়েবসাইট থেকে প্রাপ্ত তথ্যমতে, বিস্তারিত দেখুন https://www.sks-bd.org/index.php/covid-19-update [পরিদর্শনের সময়: ১ নভেম্বর ২০২১]

[১৫] প্রাগুক্ত

[১৬] করোনা যুদ্ধে এনজিও ফেডারেশন (এফএনবি), ১১ আগস্ট ২০২০, বিস্তারিত দেখুন : https://bdplatform4sdgs.net/%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%AF%E0%A7%B0/ [পরিদর্শনের সময় : ১৫ জুলাই ২০২১]

[১৭] BRAC COVID-19 Yearbook 2020, প্রাগুক্ত

[১৮] করোনা যুদ্ধে এনজিও ফেডারেশন (এফএনবি), *প্রাগুক্ত।*

[১৯] প্রাগুক্ত

[২০] গণউন্নয়ন কেন্দ্রের (জিইউকে) ত্রাণ তৎপরতা ও সচেতনতামূলক প্রচারণা, এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ, ১১ আগস্ট ২০২০, বিস্তারিত দেখুন : https://bdplatform4sdgs.net/%e0%a6%97%e0%a6%a3-%e0%a6%89%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a8%e0%a7%9f%e0%a6%a8-%e0%a6 [পরিদর্শনের সময় : ২ নভেম্বর ২০২১]

[২১] করোনা যুদ্ধে এনজিও ফেডারেশন (এফএনবি), *প্রাগুক্ত।*

[২২] COVID-19 Response Activities of SAJIDA Foundation – As of December 15th, 2021, available at: https://sajidafoundation.org/covid-portal/coronavirus-covid-19/

[২৩] আরডিআরএস হতে প্রাপ্ত তথ্যমতে।

[২৪] এক টাকায় আহার, বিস্তারিত দেখুন : https://onetakameal.org/ [পরিদর্শনের সময়: ৩ নভেম্বর ২০২১]

[২৫] ICCO's role during COVID-19, Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh, available at: https://bdplatform4sdgs.net/iccos-role-during-covid-19/ [accessed on 1 November 2021]

[২৬] ALRD Response to COVID-19, Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh, available at: https://bdplatform4sdgs.net/alrd-response-to-covid-19/ [accessed on 20 October 2021]

[২৭] BRAC COVID-19 Yearbook 2020, প্রাগুক্ত

[২৮] COVID-19 Response Activities of SAJIDA Foundation – As of December 15th, 2021, available at: https://sajidafoundation.org/covid-portal/coronavirus-covid-19/

[২৯] প্রাগুক্ত

[৩০] Gonoshasthaya Kendra in Response to COVID-19, Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh, available at: https://bdplatform4sdgs.net/gonoshasthaya-kendra-in-rsponse-to-covid-19/[accessed on 20 October 2021]

[৩১] DAM Response to COVID-19, Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh, available at: https://bdplatform4sdgs.net/dam-response-to-covid-19/ [accessed on 20 October 2021]

[৩২] করোনা যুদ্ধে এনজিও ফেডারেশন (এফএনবি), *প্রাগুক্ত।*

[৩৩] প্রাগুক্ত

[৩৪] COVID-19 Situation Update (Sep 2), প্রাগুক্ত

[৩৫] আরডিআরএস হতে প্রাপ্ত তথ্যমতে।

[৩৬] প্রাগুক্ত

[৩৭] প্রাগুক্ত

[৩৮] Annual Report, 2020

[৩৯] প্রাগুক্ত

[৪০] প্রাগুক্ত

[৪১] প্রাগুক্ত

[৪২] প্রাগুক্ত

[৪৩] প্রাগুক্ত

বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও অধিকার : সুশাসনের চ্যালেঞ্জ এবং উত্তরণের উপায়*

রাবেয়া আক্তার কনিকা

ভূমিকা

মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের ইতিহাসের একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। স্বাধীনতার সূচনালগ্ন থেকেই মূলত তাঁরাই মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে জনগণের কাছে সম্মানিত এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত হয়েছেন যাঁরা অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছেন, মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনে ভূমিকা রেখেছেন এবং প্রশাসনিক ও কূটনৈতিক ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন।[১] মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের নারীদের একটা বড় অংশ কোনো না কোনোভাবে যুদ্ধের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে নারীর অংশগ্রহণ ও ভূমিকা সেভাবে কখনোই দৃশ্যমান হয়ে ওঠেনি বা মূল্যায়িত হয়নি।[২] ১৯৭১ সালে পাকবাহিনী তাদের দোসর রাজাকার ও দালালদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় বাংলাদেশের নারীদের ধর্ষণ ও নির্যাতন করেছিল।[৩] সরকারি হিসাব মতে, ২ লক্ষ নারী যুদ্ধকালীন সময়ে নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন।[৪] তবে বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন অনুযায়ী এ সংখ্যা ছিল ৬ লক্ষ হতে ১০ লক্ষ।[৫] স্বাধীনতার পরপরই ১৯৭১ সালের ২২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকার মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতনের শিকার হওয়া নারীদের তাদের আত্মত্যাগের সম্মানার্থে 'বীরাঙ্গনা' উপাধি দেয়।[৬] পরবর্তী সময়ে ১৯৭২ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর দ্বারা নির্যাতিত নারীদের 'বীরাঙ্গনা' হিসেবে সম্মানিত করার ঘোষণা দেন। প্রথম পঞ্চবার্ষিক (১৯৭৩-১৯৭৮) পরিকল্পনায় স্বাধীনতাযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গৃহীত হয়,[৭] এর সাথে সাথে বেসরকারি ও নাগরিক উদ্যোগও যোগ হয়।[৮] ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর নির্যাতিত নারীদের পুনর্বাসনবিষয়ক সব কর্মসূচি বন্ধ হয়ে যায়।[৯]

এর প্রায় ৩৯ বছর পর ২০১৪ সালের ২৭ জানুয়ারি বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে বীরাঙ্গনাদের মুক্তিযোদ্ধার সম্মান প্রদান করার জন্য উচ্চ আদালতে একটি পিটিশন করা হয়। ২০১৫ সালের জানুয়ারি মাসে জাতীয় সংসদ বীরাঙ্গনাদের মুক্তিযোদ্ধার মর্যাদা দেওয়ার প্রস্তাব পাস করে, যেখানে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের সহযোগী কর্তৃক নির্যাতিতা নারীদের 'নারী মুক্তিযোদ্ধা (বীরাঙ্গনা)'[১০] হিসেবে গেজেটভুক্ত করা এবং মাসিক ভাতাসহ মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য প্রযোজ্য সব সরকারি সুবিধা প্রদান ও আর্কাইভ তৈরি করার বিষয়ে বলা হয়।[১১] ২০১৫ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর প্রথম জারিকৃত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় ৪১ জন বীরাঙ্গনাকে মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি দিয়ে গেজেট প্রকাশ করে।[১২] ২০২২ সালের ২৪ মে পর্যন্ত গেজেটভুক্ত বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা মোট ৪৪৮ জনে উপনীত হয়েছে এবং প্রক্রিয়াটি চলমান।[১৩]

---

* ২০২২ সালের ১৬ জুন ঢাকায় ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ।

মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে গেজেটভুক্তির প্রজ্ঞাপন জারির ছয় বছরের বেশি সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও গেজেটভুক্ত বীরাঙ্গনার সংখ্যা লক্ষণীয়ভাবে কম। এ ছাড়া বীরাঙ্গনাদের স্বীকৃতি ও সুবিধাপ্রাপ্তির প্রক্রিয়া নিয়েও রয়েছে নানা প্রশ্ন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বীরাঙ্গনাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি এবং অধিকার নিশ্চিতকরণের প্রক্রিয়া সুশাসনের নির্দেশকগুলোর আলোকে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করার উদ্দেশ্যে এ গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বীরাঙ্গনাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি এবং অধিকারপ্রাপ্তির প্রক্রিয়া সুশাসনের দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করা। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে :

- বীরাঙ্গনাদের গেজেটভুক্তি ও সুবিধা প্রদান করার জন্য গৃহীত পরিকল্পনা ও কর্মসূচি পর্যালোচনা করা;
- এই কার্যক্রমে বিদ্যমান সুশাসনের ঘাটতি, ঘাটতির কারণ ও ফলাফল বিশ্লেষণ করা;
- গবেষণার ফলাফলের আলোকে সুপারিশ প্রণয়ন করা।

গবেষণার পরিধি

বীরাঙ্গনাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি এবং অধিকারপ্রাপ্তির সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে নিচের ক্ষেত্রগুলো এই গবেষণার আওতাভুক্ত :

চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়া : বীরাঙ্গনাদের খুঁজে বের করার প্রক্রিয়া; বীরাঙ্গনাদের খুঁজে বের করা ও চিহ্নিত করার প্রক্রিয়ায় সরকারের ও বিভিন্ন অংশীজনের ভূমিকা;

প্রত্যয়নের প্রক্রিয়া : প্রত্যয়নের ধাপগুলো; প্রত্যয়নের প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান জটিলতা বা অনিয়ম-দুর্নীতি;

আবেদনের প্রক্রিয়া : আবেদনের ধাপগুলো; আবেদনের প্রক্রিয়ায় সহযোগী বিভিন্ন অংশীজন; আবেদনের প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান জটিলতা বা অনিয়ম-দুর্নীতি;

যাচাই-বাছাই ও গেজেট ঘোষণা : আবেদনকারী বীরাঙ্গনাদের সত্যতা যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়া; যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়ার সংবেদনশীলতা; যাচাই-বাছাই ও গেজেটভুক্তির প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান জটিলতা বা অনিয়ম-দুর্নীতি;

ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাপ্রাপ্তি : ভাতা ও অন্যান্য নির্ধারিত সুবিধা; ভাতা ও সুবিধাপ্রাপ্তিতে বিদ্যমান জটিলতা বা অনিয়ম-দুর্নীতি।

গবেষণাপদ্ধতি ও বিশ্লেষণকাঠামো

এ গবেষণাটি মূলত গুণগত গবেষণা পদ্ধতিনির্ভর। গুণগত তথ্য এই গবেষণায় ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে এই গবেষণায় ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি হিসেবে সাক্ষাৎকার ও দলীয় আলোচনা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধা, বীরাঙ্গনাদের নিয়ে কাজ করছে এমন ব্যক্তিবর্গ, সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। বীরাঙ্গনাদের নিয়ে কাজ করছে এমন প্রতিষ্ঠানের সদস্যবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের

নিয়ে দলীয় আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়া সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সরকারি কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য, প্রকাশিত গেজেট এবং গণমাধ্যমে (প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক) প্রকাশিত প্রতিবেদন, প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন বই ও প্রকাশিত প্রতিবেদন সংগ্রহ, যাচাই-বাছাই ও পর্যালোচনা করে এই গবেষণায় ব্যবহার করা হয়েছে।

সুশাসনের ছয়টি নির্দেশকের আলোকে গবেষণায় আওতাভুক্ত বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এসব নির্দেশক হচ্ছে আইনের শাসন, সক্ষমতা ও কার্যকারিতা, অংশগ্রহণ, অনিয়ম ও দুর্নীতি, জবাবদিহি এবং সংবেদনশীলতা।

তথ্য সংগ্রহের সময়কাল

এই গবেষণায় ব্যবহৃত সব তথ্য জানুয়ারি থেকে মার্চ ২০২২ পর্যন্ত সময়ে সংগ্রহ করা হয়েছে।

গবেষণার উল্লেখযোগ্য ফলাফল

বীরাঙ্গনাদের নিয়ে বিভিন্ন সরকারি কার্যক্রম

২০১৫ সালের জানুয়ারি মাসে জাতীয় সংসদ বীরাঙ্গনাদের মুক্তিযোদ্ধার মর্যাদা দেওয়ার প্রস্তাব পাস করে প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে তাদের জন্য কিছু অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে :

গেজেটভুক্তকরণ : ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের সহযোগী কর্তৃক নির্যাতিত কোনো নারী (বীরাঙ্গনা) বা তার অবর্তমানে তার পরিবারের কোনো সদস্য যদি স্বেচ্ছায় গেজেটভুক্তির জন্য আবেদন করেন, তাহলে যথাযথ যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে তাকে মুক্তিযোদ্ধা (বীরাঙ্গনা) তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় (চিত্র ১ দ্রষ্টব্য)।[১৪]

মাসিক ভাতা প্রদান : বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সাধারণ মুক্তিযোদ্ধা শ্রেণিতে (ক্যাটাগরিতে) মাসিক ভাতা প্রদান (বর্তমানে মাসিক ২০,০০০ টাকা ভাতা বরাদ্দ;[১৫] গভর্নমেন্ট টু পারসন (জি টু পি) পদ্ধতিতে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে মোবাইল মেসেজের মাধ্যমে সরাসরি বীর মুক্তিযোদ্ধার অ্যাকাউন্টে ভাতার টাকা প্রদান করা হয়।[১৬])

অন্যান্য ভাতা : মাসিক সম্মানী ভাতার পাশাপাশি ১০ হাজার টাকা হারে দুটি উৎসব ভাতা, বাংলা নববর্ষ ভাতা হিসেবে দুই হাজার টাকা এবং জীবিত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মহান বিজয় দিবস ভাতা হিসেবে পাঁচ হাজার টাকা প্রদান করা হয়।[১৭]

আবাসন-সুবিধা : 'অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আবাসন নির্মাণ' প্রকল্পের অধীনে অসহায় এবং আর্থিকভাবে অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের আবাসন-সুবিধা প্রদান। বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সরাসরি আবাসন বরাদ্দ দেওয়া হয়ে থাকে। চার ডেসিমাল জমিতে ৯০০ বর্গফুট আয়তনের 'বীর নিবাস' নামক একতলা একটি বাড়ি তৈরি করে দেওয়া হয়ে থাকে।[১৮]

বীর মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যুতে রাষ্ট্রীয়ভাবে সম্মান প্রদর্শন : বীর মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যুতে রাষ্ট্রীয়ভাবে সম্মান প্রদর্শন আদেশ, ২০২০ অনুযায়ী মৃত্যুর পর গেজেটভুক্ত একজন নারী মুক্তিযোদ্ধা (বীরাঙ্গনা) রাষ্ট্রীয় সম্মাননা পেয়ে থাকেন। রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁর লাশ দাফন, সৎকার বা সমাধিস্থ করা হয়ে থাকে।[১৯]

অন্যান্য সম্মাননা : এ ছাড়া বিভিন্ন সময় মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন সম্মাননা প্রদান এবং জেলা পর্যায় হতে বিভিন্ন ধরনের উপহার বা সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে (তবে সেগুলো নিয়মিত সরকারি কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত নয়)।

চিত্র-১: গেজেটভুক্তি ও অন্যান্য সুবিধাপ্রাপ্তির প্রক্রিয়া

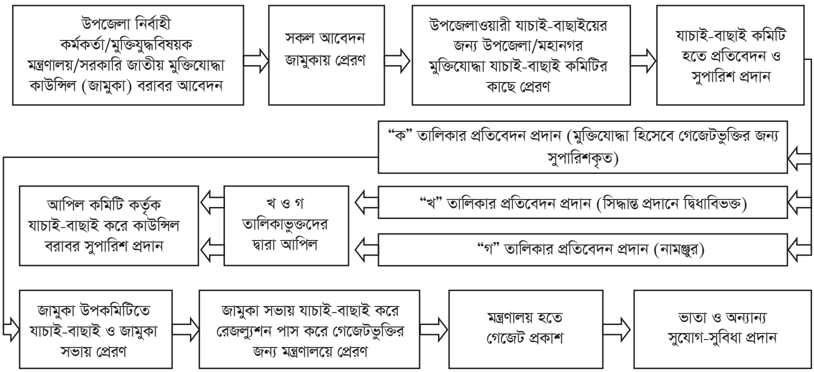

গেজেটভুক্ত বীরাঙ্গনার সংখ্যা

২৪ মে ২০২২ পর্যন্ত গেজেটভুক্ত মোট বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ৪৪৮ জন (মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট অনুযায়ী)[২০] হলেও মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এমআইএসে এন্ট্রি রয়েছে ৪০৩ জনের তালিকা।[২১] আটটি বিভাগের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গেজেটভুক্ত হয়েছেন রাজশাহী বিভাগে (১০৭ জন)। এরপর রয়েছে রংপুর বিভাগ। এই বিভাগে গেজেটভুক্ত হয়েছেন ৬১ জন। সিলেট, ময়মনসিংহ ও ঢাকা বিভাগে গেজেটভুক্ত বীরাঙ্গনার সংখ্যা প্রায় কাছাকাছি, ৫২, ৫১ ও ৫০ জন। খুলনা ও বরিশাল বিভাগের যথাক্রমে গেজেটভুক্ত হয়েছেন ৪৫ ও ৪০ জন। এখন পর্যন্ত সবচেয়ে কম গেজেটভুক্ত হয়েছেন চট্টগ্রাম বিভাগে, ২৮ জন। একজন করে গেজেটভুক্ত হয়েছেন এমন জেলার সংখ্যা মোট ৯টি। একজন বীরাঙ্গনাও গেজেটভুক্ত হননি এমন জেলা ৮টি। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী হতে গেজেটভুক্ত হয়েছেন তিনজন।[২২]

সারণি ১ : বীরাঙ্গনাদের গেজেটভুক্তির সার্বিক চিত্র

ক্রম	বিভাগ	গেজেটভুক্ত বীরাঙ্গনার সংখ্যা	একজন করে গেজেটভুক্ত হয়েছেন এমন জেলা	কোনো বীরাঙ্গনা গেজেটভুক্ত হননি এমন জেলা
১	চট্টগ্রাম	৩০	ফেনী, খাগড়াছড়ি, নোয়াখালী	চাঁদপুর, কক্সবাজার, বান্দরবান
২	রাজশাহী	১০৭	-	-
৩	খুলনা	৫০	-	মেহেরপুর ও মাগুরা
৪	বরিশাল	৪৩	ভোলা	-

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন...

ক্রম	বিভাগ	গেজেটভুক্ত বীরাঙ্গনার সংখ্যা	একজন করে গেজেটভুক্ত হয়েছেন এমন জেলা	কোনো বীরাঙ্গনা গেজেটভুক্ত হননি এমন জেলা
৫	সিলেট	৫৩	-	-
৬	ঢাকা	৫৩	মুন্সিগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জ	মানিকগঞ্জ ও রাজবাড়ী
৭	রংপুর	৬১	নীলফামারী	পঞ্চগড়
৮	ময়মনসিংহ	৫১	নেত্রকোনা	-
	মোট	**৪৪৮**	-	-

বেসরকারি কার্যক্রম

বীরাঙ্গনাদের নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে কিছু কিছু পক্ষ কাজ করে থাকে। প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে বীরাঙ্গনাদের নিয়ে যেসব কার্যক্রম রয়েছে তার মধ্যে বীরঙ্গনাদের খুঁজে বের করা, বীরাঙ্গনা এবং তাদের পরিবার-পরিজনদের কাউন্সেলিং করা, সচেতনতা তৈরির জন্য কাজ করা, স্বল্প পরিসরে ভাতার ব্যবস্থা করা, বীরাঙ্গনাদের জন্য চিকিৎসাসেবার ব্যবস্থা করা, গেজেটভুক্তির প্রক্রিয়ায় সহায়তা করা এবং আবাসন কার্যক্রম উল্লেখযোগ্য।

বীরাঙ্গনাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও অধিকারপ্রাপ্তির প্রক্রিয়ায় চ্যালেঞ্জ

২০১৫ সালে প্রজ্ঞাপন জারির মধ্য দিয়ে বীরাঙ্গনাদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও অধিকার প্রদানের সরকারি কার্যক্রম শুরু হয়। কিন্তু শুরু থেকে এখন পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও অধিকারপ্রাপ্তির এই প্রক্রিয়ায় বীরাঙ্গনাদের নানা ধরনের চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে।

আইনের শাসনসংক্রান্ত

দীর্ঘসূত্রতার চ্যালেঞ্জ

আবেদন হতে শুরু করে গেজেটভুক্তির কার্যক্রম সর্বোচ্চ কত দিনের মধ্যে ,নিষ্পত্তি করতে হবে তার জন্য কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা আইনে বা বিধিতে উল্লেখ নেই।[২৩] ফলে গেজেটভুক্তির এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে অনেক ক্ষেত্রেই দীর্ঘ সময়–কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিন বছরেরও বেশি সময় লেগে যায়। গেজেটভুক্তির এই প্রক্রিয়ায় কত সময় লাগতে পারে বা কত সময় লাগা উচিত, এ বিষয়ে প্রশাসনের তরফ থেকেও কোনো তাগিদ নেই। প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা না থাকার কারণে প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে যতটা সময় প্রয়োজন, সেটাই লেগে থাকে বলে তারা মনে করেন।

> ‘গেজেটভুক্তির জন্য কত সময় লাগবে এটা নির্দিষ্ট করে বলার কিছু নেই। কারও তিন মাসও লাগতে পারে কারও তিন বছর। প্রক্রিয়ায় যে সময় লাগবে সেটাই।’
> *- সংশ্লিষ্ট একজন সরকারি কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার*

গেজেটভুক্তির পর ভাতাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রেও রয়েছে দীর্ঘসূত্রতার অভিযোগ। গেজেটভুক্তির পর ভাতা পেতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিন থেকে ছয় মাস পর্যন্ত বা এরও বেশি সময় লেগে যায়। সম্মানী

ভাতার আবেদন করা আবেদনপ্রাপ্তির তারিখ হতে পরবর্তী ৬০ (ষাট) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনটি নিষ্পত্তি করার নির্দেশনা[২৪] থাকলেও অনেক ক্ষেত্রেই তা যথাযথভাবে পালিত না হওয়ায় ভাতাপ্রাপ্তি প্রক্রিয়া দীর্ঘ হয়ে পড়ে। এ ছাড়া বীর নিবাসের ঘরের জন্য আবেদন করলে তা পেতে দীর্ঘ সময় ব্যয় হয়। এ ক্ষেত্রেও সময়ের কোনো বাধ্যবাধকতা না থাকার কারণে আবেদন করার ছয় বছর অতিবাহিত হয়ে গেলেও কেউ কেউ এখনো ঘর পাননি বলে অভিযোগ রয়েছে।

যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়ার চ্যালেঞ্জ

আবেদন যাচাই-বাছাইয়ের জন্য কিছু কিছু সনদ প্রদর্শন করতে হয়। আবেদনপত্রের সাথে জাতীয় পরিচয়পত্র বা স্মার্টকার্ডের অনুলিপি ও ইউনিয়ন/পৌরসভা/ মহানগরের বাসিন্দা হিসেবে সংশ্লিষ্ট চেয়ারম্যান/ওয়ার্ড কাউন্সিলরের প্রত্যয়নপত্র সংযুক্ত করতে হয়। এ ছাড়া যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়ার জন্য মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারদের কাছ থেকে প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হয়। যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়ার জন্য এসব সনদ প্রদর্শন করা অনেক সময়ই প্রক্রিয়াকে আরও জটিল করে তোলে; বিশেষ করে অনেকের ক্ষেত্রেই দেখা যায়, জাতীয় পরিচয়পত্রে যে বয়স উল্লেখ করা রয়েছে তা অনুমানভিত্তিক, যার সাথে প্রকৃত বয়সের ব্যাপক ব্যবধান রয়েছে। এ ছাড়া কিছু কিছু ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারদের কাছ থেকে প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহ করাটাও কঠিন হয়ে পড়ে।

কেস-১ : জাতীয় পরিচয়পত্রের বয়সের সাথে প্রকৃত বয়সের গরমিল

করিমন বেগম (ছদ্মনাম)। যুদ্ধের সময় তার বয়স ছিল ১৫ কি ১৬ বছর। বিয়ে হয়েছে ২ বছর আগে। স্বামী ও শাশুড়ির সাথে তখন তিনি শ্বশুরবাড়িতেই থাকতেন। একদিন পাকিস্তানিরা তাদের এলাকায় হামলা করে। তখন তাকেসহ তার পার্শ্ববর্তী বাড়ির আরও দুজনকে পাকিস্তানি সৈন্যরা ধর্ষণ করে এবং ক্যাম্পে তুলে নিয়ে যায়। সেখানে তাদের ওপর চালানো হয় পাশবিক নির্যাতন। কয়েক দিন পর একজনের সহায়তায় তারা সেখান থেকে পালাতে সক্ষম হন এবং পরে ভারতের শরণার্থী ক্যাম্পে গিয়ে আশ্রয় নেন। তার স্বামী সব ঘটনা জানলেও এ বিষয়ে তাকে কখনো কোনো নির্যাতন করেননি। কিন্তু এলাকার লোকজন ও প্রতিবেশীদের কাছ থেকে তাকে সব সবই নানা কটু কথা শুনতে হয়েছে। জীবনের একটি বিভীষিকাময় অধ্যায় হিসেবে তিনি এ বিষয়টি সব সময় ভুলতে চেয়েছেন। এমনকি স্বেচ্ছাসেবীরা যখন এত বছর পর জানায় যে সরকার তাদের সম্মান দিচ্ছে, তখন তিনি সেটা বিশ্বাস করতে পারেননি। বারবার তাকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসা স্বেচ্ছাসেবীদের তাড়িয়ে দিয়েছেন। এরপর যখন আবেদন করতে রাজি হলেন এবং আবেদন করলেন, তখন দেখা গেল ঘটনার বয়সের সাথে তার জাতীয় পরিচয়পত্রে উল্লিখিত বয়স মিলছে না। জাতীয় পরিচয়পত্রে উল্লিখিত বয়স তার বয়স থেকে অনেক কম হয়ে যাওয়ায় ঘটনার সত্যতা প্রমাণ করা তার জন্য কঠিন পড়ে এবং তার আবেদনটি সুপারিশপ্রাপ্ত হয় না। তার সাথে আরও যে দুজন পাকিস্তানি সৈন্যদের দ্বারা ধর্ষণের শিকার হয়েছিলেন, তাদের একজন গেজেটভুক্ত হয়ে গেছেন। কিন্তু তথ্যগত ভুলের কারণে তার প্রক্রিয়াটি জটিলতার মুখে পড়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি তার সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, *‘এমনেই তো দেহি বছরের পর বছর লাগে। আর এহন তো আমার কাগজেই সমস্যা। এটা কি হইব আল্লা জানে। বাঁইচা থাকতে পামু কি না, জানি না।’*

আবাসন-সুবিধাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ

অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য 'অসচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আবাসন নির্মাণ' প্রকল্পের আওতায় আবাসন বরাদ্দের ব্যবস্থা রয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে আবাসন-সুবিধাপ্রাপ্তির জন্য সুনির্দিষ্ট পরিমাণ নিজস্ব জমির মালিকানা থাকার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। 'বীর নিবাস'-এর ঘর পাওয়ার জন্য আবেদনকারীর অবশ্যই দৈর্ঘ্য ৩৯ ফুট × প্রস্থ ২৯ ফুট সরেজমিন নিষ্কণ্টক নিজ নামে জমি থাকতে হবে।[২৫] অনেক ক্ষেত্রেই ন্যূনতম জমির মালিকানার এই শর্ত দরিদ্র ও ভূমিহীন বীরাঙ্গনাদের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ।

সক্ষমতা ও কার্যকারিতা

পরিকল্পনা ও উদ্যোগের ক্ষেত্রে ঘাটতি

সরকার বীরাঙ্গনাদের গেজেটভুক্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও কেন্দ্রীয় বা স্থানীয় পর্যায়ে বীরাঙ্গনাদের খুঁজে বের করার বা চিহ্নিত করার কোনো পরিকল্পনা নেই। সংবেদনশীলতা রক্ষার স্বার্থে বীরাঙ্গনা হিসেবে শুধু যারা স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসবেন গেজেটভুক্ত হওয়ার জন্য, তাদেরই যাচাই-বাছাই করে এর আওতায় আনার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ফলে এখন পর্যন্ত তালিকাভুক্ত ৪৪৮ জন বীরাঙ্গনার মধ্যে ৪৩৩ জন জীবিত অবস্থায় নিজেদের পক্ষে তালিকাভুক্ত হয়েছেন এবং ১৫ জন বীরাঙ্গনার মৃত্যুর পর তাদের পরিবারের সদস্যরা তাদের প্রতিনিধি হয়ে নাম তালিকাভুক্ত করেছেন।[২৬]

> 'দেশ স্বাধীন হয়েছে বহু বছর হয়ে গেছে। তারা আর কত অত্যাচার সহ্য করবেন। এত বছর পর তাদের সম্মাননা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে কিন্তু না জানার কারণে তাদের বেশির ভাগই এই সুবিধা পাচ্ছেন না। তাদের তো খুঁজে বের করতে হবে। তারা তো সামনে আসতে চাইবেন না। তাই বলে কি তাদের জানানোও হবে না। তাদের জানাতে হবে। তারপর সম্মান তারা নিতে চান কি চান না, তা তাদের ব্যাপার। আগে থেকে তো ধারণা করে রাখা ঠিক না। এখন দেখুন, বেশির ভাগ বীরাঙ্গনাই অসহায়-আশ্রয়হীন। তাদের খুঁজে বের না করলে তারা এসব জানবেন কীভাবে। সরকার বলছে তারা নিতে না চাইলে তাদের জোর করা হবে না। কিন্তু ভাই তাদের তো আগে জানাতে হবে, বোঝাতে হবে। আর তাদের খুঁজে বের করার মানে তো তাদের নাম-ঠিকানা সব প্রকাশ করে দেওয়া না। এ বিষয়ে যথাযথ পরিকল্পনা দরকার। না হলে শেষ পর্যন্ত বেশির ভাগই হিসাবের বাইরেই থেকে যাবেন।'
>
> *- একজন স্বেচ্ছাসেবক*

তা ছাড়া গেজেটভুক্তির প্রজ্ঞাপনের প্রচারে সুনির্দিষ্ট কাঠামো না থাকার কারণে গেজেটভুক্তির জন্য সরকারের এই আহ্বান অনেক ক্ষেত্রে প্রকৃত সুবিধাভোগীর কাছে পৌঁছাতে পারে না। গেজেটভুক্তির প্রজ্ঞাপন বিভিন্ন গণমাধ্যম, যেমন টেলিভিশন, রেডিও, সংবাদপত্রে প্রচার করা হয়ে থাকে। এ ছাড়া স্থানীয় পর্যায়ে উপজেলা পরিষদে নোটিশ টাঙানো এবং এলাকায় মাইকিংয়ের মাধ্যমে প্রজ্ঞাপনের সংবাদ প্রচার করা হয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই বীরাঙ্গনারা প্রান্তিক পরিসরে বসবাস করা এবং সরকারি এসব বার্তার বিষয়ে তাদের ধারণা না থাকার ফলে এই আহ্বান তাদের কাছে গিয়ে পৌঁছায় না বা তারা সেটা বুঝতে পারেন না। তা ছাড়া মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বরাদ্দকৃত সেবার তথ্যও পরিকল্পিতভাবে স্থানীয় পর্যায়ে প্রচার না করায় যথাসময়ে তথ্য পান না বলে অভিযোগ রয়েছে বীরাঙ্গনাদের।

জনবলের ঘাটতি

উপজেলা পর্যায়ে বীরাঙ্গনা বা মুক্তিযোদ্ধাদের গেজেটভুক্তির প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য বিশেষ কোনো দায়িত্বপ্রাপ্ত পদ নেই। বর্তমানে উপজেলা পর্যায়ে সমাজসেবা কর্মকর্তা তার অন্যান্য নির্ধারিত কাজের সাথে বীরাঙ্গনা বা মুক্তিযোদ্ধাদের গেজেটবিষয়ক কর্মকাণ্ড দেখে থাকেন। উপজেলা পর্যায়ের অধিকাংশ বীরাঙ্গনা শিক্ষাগত যোগ্যতার ঘাটতি এবং বয়সের কারণে গেজেটভুক্তির জন্য নির্ধারিত কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পাদন করতে জটিলতার সম্মুখীন হয়ে থাকেন। এ ছাড়া আবেদনপত্র লেখা বা পূরণ করতে সহায়তা করার জন্য জামুকায় কোনো জনবল নেই। অসহায় অনেক বীরাঙ্গনাকে এসব ক্ষেত্রে সহায়তা করার জন্য পারিবারিকভাবেও তেমন কেউ থাকেন না। অনেক ক্ষেত্রেই তখন এসব ক্ষেত্রে সহায়তার জন্য তাদের স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকদের ওপর নির্ভর করতে হয়।

হালনাগাদ ও নির্ভুল তথ্যের ঘাটতি

তথ্যের ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়ের ক্ষেত্রে ঘাটতি, বিশেষ করে হালনাগাদ তথ্য ও তথ্যের নির্ভুলতার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়ের ঘাটতি রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট এবং মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এমআইএসে তথ্যের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট অনুযায়ী এখন পর্যন্ত গেজেটভুক্ত মোট বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা যেখানে ৪৪৮ জন[২৭] সেখানে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এমআইএসে এন্ট্রি রয়েছে ৪০৩ জনের।[২৮] মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট এবং মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এমআইএসে গেজেটভুক্ত একই ব্যক্তির নাম এবং পিতা/স্বামীর নামের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন বানান, পদবি এমনকি ভিন্ন ভিন্ন নামও রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে থাকা ৪৪৮ জন বীরাঙ্গনার তালিকার মধ্যে ৮৯ জন বীরাঙ্গনার (১৯ দশমিক ৮৭ শতাংশ) নামের সাথে এমআইএসে উল্লিখিত নামের ভিন্নতা রয়েছে। এ ছাড়া পিতা/স্বামীর নামের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন বানান, পদবি এমনকি ভিন্ন ভিন্ন নাম রয়েছে ২০৭ জনের (৪৬ দশমিক ২১ শতাংশ)।

চিত্র ২ : বীরাঙ্গনাদের নাম ও পিতা/স্বামীর নামের ক্ষেত্রে ভিন্নতা বা ভুলের হার

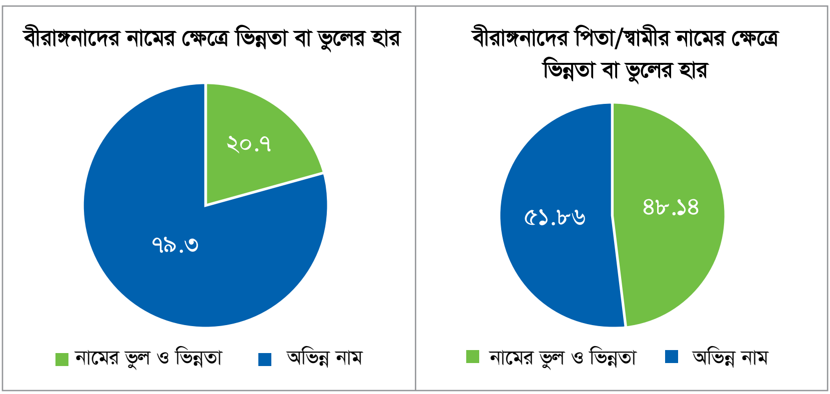

এ ছাড়া গেজেটে অনেকের নাম, ঠিকানায় ভুল রয়েছে এবং এ কারণে আবাসনের জন্য আবেদন করতে পারছেন না অনেকেই। গেজেটে এ ধরনের ভুল অনেক ক্ষেত্রে আবেদনভুক্তির সময় প্রদত্ত তথ্যের সময়ে ভুল তথ্য প্রদানের ফলে তৈরি হয়। এ ছাড়া পরবর্তী পর্যায়ে তথ্য লিপিবদ্ধকরণের সময় অথবা সংশোধিত তথ্য সব মাধ্যমে যথাযথভাবে পরিবর্তন না করার ফলে হয়ে থাকে। তা ছাড়া এমআইএসে থাকা তথ্যগুলো হালনাগাদ নয়। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান, মাঠপর্যায়ে সুবিধাগ্রহীতারা সহযোগিতামূলক আচরণ না করার কারণে অনেক ক্ষেত্রেই তথ্য আপডেট করা সম্ভব হয় না। এ ছাড়া মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে শুধু গেজেটভুক্তদের তথ্য লিপিবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু কতজনের আবেদন বর্তমানে মন্ত্রণালয়ের কাছে বিবেচনাধীন রয়েছে, এবিষয়ক কোনো তথ্য দেওয়া নেই। এমনকি এবিষয়ক কোনো তথ্য জামুকা থেকেও প্রকাশ করা হয়নি।

অংশগ্রহণ

বীরাঙ্গনাদের চিহ্নিত করা

সরকারি বা স্থানীয় পর্যায়ে বীরাঙ্গনাদের কোনো তালিকা নেই। বীরাঙ্গনাদের খুঁজে বের করা চ্যালেঞ্জিং একটি বিষয়। প্রথমত, এ ক্ষেত্রে কোনো তথ্য ও তালিকা নেই, যেটি ব্যবহার করে তাদের অবস্থান সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাচ্ছে এবং দ্বিতীয়ত হচ্ছে, পরিচিতি গোপন। পারিবারিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক চাপে নির্যাতিত এই নারীরা বাধ্য হয়েছিলেন নিজেদের নির্যাতনের ঘটনাকে গোপন করতে। অনেক ক্ষেত্রেই পরিবার ও সমাজের চাপের মুখে পরিবার-পরিজন ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতেও বাধ্য হয়েছিলেন। ফলে স্বাধীনতার ৫০ বছর পর তাদের খুঁজে বের করা প্রথম চ্যালেঞ্জ ও বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করা হয়।

> ‘কাজ করতে গিয়ে আমরা প্রথম যে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হই তা হচ্ছে খুঁজে বের করা। একটা কথা আমি আপনাকে বলে রাখি, পৃথিবীতে যে নিজে লুকিয়ে থাকে, তাকে খুঁজে বের করা কিন্তু সবচেয়ে কঠিন। কিডন্যাপ হোক, হাইজ্যাক হোক বা কেউ লুকিয়ে রাখুক, তাদের খুঁজে বের করা যায়। কিন্তু যে নিজে লুকিয়ে থাকে তাকে কিন্তু খুঁজে বের করা খুবই কঠিন।’
>
> *- বীরাঙ্গনাদের নিয়ে কাজ করছেন এমন একজন তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার*

দীর্ঘদিন ধরে আত্মগোপন করে থাকা বা পরিচয় প্রকাশে শঙ্কিত এসব বীরাঙ্গনা ও তাদের পরিবারের সদস্যরা তাদের পরিচয় গোপন করার চেষ্টা করেছেন। ফলে বীরাঙ্গনাদের নিয়ে কাজ করেছেন এমন ব্যক্তিবর্গ, যখন তাদের খোঁজার চেষ্টা করছিলেন, তখন শুরুতে বীরাঙ্গনাদের পরিবার-পরিজন এমনকি খোদ বীরাঙ্গনারাও নানাভাবে তাদের প্রত্যাখ্যান করেছেন। এ ছাড়া স্থানীয় লোকজন, বিশেষ করে স্বাধীনতাবিরোধী হিসেবে চিহ্নিতরাও (রাজাকার) তাদের বাধা দিয়েছে।

প্রত্যয়ন করার ক্ষেত্রে অসহযোগিতা

বীরাঙ্গনাদের গেজেটভুক্তির প্রক্রিয়ায় ঘটনার সত্যতা প্রমাণের জন্য বেশ কিছু প্রত্যয়নের প্রয়োজন হয়। এ ক্ষেত্রে তাদের স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার বা মুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থেকে প্রত্যয়ন সংগ্রহ

করতে হয়। ওই সময়ে বর্তমান ছিলেন, অর্থাৎ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী এমন তিনজনকে ঘটনার সত্যতার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করতে হয় এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধির কাছ থেকে প্রত্যয়ন সংগ্রহ করতে হয়। শুরুর দিকে স্থানীয় পর্যায়ে কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রত্যয়ন করার ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধাদের একাংশ অসহযোগিতামূলক আচরণ করেছেন। বীরাঙ্গনাদের প্রত্যয়ন করার ক্ষেত্রে তাদের মনোভাব ইতিবাচক ছিল না; বিশেষ করে বীরাঙ্গনাদের মুক্তিযোদ্ধা খেতাব দেওয়ায় বিষয়ে তাদের অনেকের বেশ আপত্তি ছিল।

এ ছাড়া প্রত্যয়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগোষ্ঠী বা প্রতিবেশীরাও অসহযোগিতামূলক আচরণ করে। অনেক ক্ষেত্রেই বীরাঙ্গনাদের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব বা ব্যক্তিগত দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের জের ধরেও অনেকে বীরাঙ্গনাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে অসহযোগিতা করেন। ক্ষেত্রবিশেষে স্থানীয় জনপ্রতিনিধির দিক থেকে সহযোগিতামূলক আচরণের ঘাটতি লক্ষ করা গেছে। মুক্তিযুদ্ধের পরে জন্মগ্রহণ করা এবং বীরাঙ্গনাদের নিয়ে সামাজিক পরিসরে বিদ্যমান নেতিবাচক মনোভাবের কারণে কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের কাছ থেকে প্রত্যাশিত সহায়তা পাওয়া যায়নি।

> ‘আমাদের দেশে বীরাঙ্গনাদের নিয়ে মনোভাব ভালো না। যে মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার চিহ্নিত করবেন, তিনি প্রকৃত কমান্ডার কি না, সেটা সন্দেহের বিষয়। নিজেকে মুক্তিযোদ্ধা বলে দাবি করা এই কমান্ডারদের অনেকের বয়স দেখলে বোঝা কঠিন যে তারা যুদ্ধের সময় কীভাবে যুদ্ধ করেছেন। একজন কমান্ডার একবার একজন বীরাঙ্গনার প্রসঙ্গে বলছিলেন, “ও তো ভালো মেয়ে মানুষ না…।” আমি তখন বলতে বাধ্য হয়েছিলাম যে “আপনি তো এভাবে বলতে পারেন না। কোন পরিস্থিতিতে তার সাথে এ অবস্থা হয়েছিল, সেটা তো আপনি আগে দেখবেন। তিনি নিজে ইচ্ছে করে তো কিছু করেননি।” এভাবে বলার পর তিনি কিছুটা দমেছিলেন।’
>
> *- বীরাঙ্গনাদের নিয়ে কাজ করছেন এমন একজন তথ্যদাতা*

যোগাযোগ

বীরাঙ্গনাদের সাথে স্থানীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের যোগাযোগের ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে। যেহেতু বীরাঙ্গনাদের গেজেটভুক্তি ও সুবিধাপ্রাপ্তির সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ায় সার্বিকভাবে সরাসরি সহায়তার জন্য প্রশাসনিকভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কেউ নেই এবং সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটিই কমবেশি স্থানীয়ভাবে স্বেচ্ছাসেবক ব্যক্তিদের সহায়তায় হয়ে থাকে, ফলে স্থানীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সাথে বীরাঙ্গনাদের নিয়মিত যোগাযোগ তৈরি হয়ে ওঠে না। এ ছাড়া নারী ও বয়স্ক হওয়ার কারণেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তারা প্রশাসনিক পরিসরে খুব বেশি যাতায়াত করতে পারেন না। ফলে তাদের জন্য কোনো সেবা বা সুবিধা বরাদ্দ হলে অনেক সময়ই তারা তা জানতে পারেন না। বেশির ভাগ সময়ই স্বেচ্ছাসেবীদের মাধ্যমে তাদের এই সংবাদগুলো জানতে হয়। এ ছাড়া কোনো সেবার জন্য কোনো আবেদন করা হলে তার আপডেট সম্পর্কে জানার জন্যও বীরাঙ্গনাদের স্বেচ্ছাসেবীদের সহায়তা নিতে হয়।

অনিয়ম ও দুর্নীতি

গেজেটভুক্তির প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ও দুর্নীতি

গেজেটভুক্তির বিভিন্ন ধাপে অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হতে হয় বীরাঙ্গনাদের। তথ্যদাতাদের মতে, কমবেশি সব আবেদনকারী বীরাঙ্গনাই নানা পক্ষ হতে, বিশেষ করে স্থানীয় পর্যায়ে অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার। তবে কাজ শেষ করার জন্য এবং পরবর্তী জটিলতা এড়ানোর জন্য তারা এ প্রসঙ্গে কথা বলেন না। কিছু কিছু প্রত্যয়নের সময় নিয়মবহির্ভূতভাবে টাকা আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। প্রত্যয়ন সংগ্রহ করার জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বীরাঙ্গনাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করা হয়ে থাকে। এ ছাড়া প্রশাসনিক পর্যায়ে কোনো আবেদন জমা দেওয়ার সময় পিয়ন বা সহকারীদের চা-নাশতা খাওয়ার টাকা দেওয়ার একধরনের অলিখিত নিয়ম রয়েছে। পিয়ন বা সহকারী না চাইলেও নিজ থেকেই তাদের কিছু দিয়ে আসার প্রবণতা রয়েছে। এ ছাড়া আবেদনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে দেওয়ার বিনিময়ে কেউ কেউ তাদের কাছে টাকা দাবি করে থাকে বলে অভিযোগ রয়েছে। গেজেটভুক্তির এই পুরো প্রক্রিয়া জটিল হওয়ার কারণে এবং প্রশাসন থেকে সরাসরি সহায়তা করার ব্যবস্থা না থাকার কারণে বীরাঙ্গনাদের অনেক ক্ষেত্রেই অনিয়ম ও দুর্নীতি শিকার হতে হয়।

বীর নিবাসের ঘর পাওয়ার ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতি

> ‘হেরা তো কয় ঘর পাইতে হইলে তো টাকাপয়সা কিছু খরচ করতে হইব। সরকার তোমারে এত লাখ ট্যাকার ঘর দিব, তোমারেও তো কিছু দিতে হইব...লাখখানেক টাকা চায়...তা না হইলে ঘরের নাকি ব্যবস্থা হইব না।’
>
> *- একজন বীরাঙ্গনা*

আবাসন সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য কোনো কোনো পক্ষ থেকে অবৈধভাবে অর্থ দাবি করা হয়। কয়েকটি জায়গায় মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সদস্যের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ রয়েছে। বীর নিবাসের ঘর পেতে হলে তাদের নির্দিষ্ট একটি অঙ্কের টাকা দিতে হবে নতুনা ঘর পাবে না– এমন হুমকি দিয়ে টাকা দাবি করার অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া আবাসনের আবেদনে অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের অগ্রাধিকার না দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। আবাসনের প্রজ্ঞাপনে অসচ্ছল বীরাঙ্গনাদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ঘর দেওয়ার কথা বলা হলেও তারা ঘর পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। আবেদন করার ছয় বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও কেউ কেউ এখনো ঘর পাননি।

বীরাঙ্গনা নন এমন ব্যক্তিদের গেজেটভুক্ত হওয়া

কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিতর্কিত ব্যক্তিদের গেজেটভুক্ত হয়ে যাওয়ার অভিযোগ রয়েছে। মিথ্যা সাক্ষ্য প্রমাণ ও দলিলের ভিত্তিতে বিতর্কিত ব্যক্তিদের গেজেটভুক্ত হয়ে যেতে পারে বলে মনে করে প্রশাসন। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান এবং সার্বিকভাবে তথ্য-প্রমাণাদি নিয়ে আসলে প্রশাসনের পক্ষেও তা ধরতে পারা সম্ভব হয় না। ফলে কিছু বানোয়াট ব্যক্তি গেজেটভুক্ত হয়ে যাচ্ছে বলে মনে করা হয়।

জবাবদিহি

অনিয়ম ও দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি ব্যবস্থার ঘাটতি

বীরাঙ্গনাদের গেজেটভুক্তি ও সুযোগ-সুবিধাপ্রাপ্তির প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। এসব নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির জন্য প্রশাসনের তেমন কোনো ব্যবস্থা নেই। অভিযোগ গৃহীত হলে তা নিরসনের ব্যবস্থা থাকলেও অনিয়ম ও দুর্নীতি শনাক্ত করার ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে। বীরাঙ্গনা ও তাদের প্রতিনিধিরা গেজেটভুক্তির বিভিন্ন ধাপে এবং আবাসন-সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে অনিয়মের শিকার হলেও পরবর্তী জটিলতা এড়ানোর জন্য দুর্নীতির অভিযোগ করা থেকে বিরত থাকে।

অনিয়ম ও দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ এবং তদারকির প্রসঙ্গে প্রশাসনের নির্দিষ্ট কোনো ব্যবস্থা নেই। তারা জানান যদি এমন ধরনের কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়, তাহলে তাৎক্ষণিকভাবে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মিথ্যা পরিচয়ধারী কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে তার গেজেট বাতিল এবং অন্য কোনো ধরনের অনিয়মের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যথাযোগ্য শাস্তির ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

> ‘বীরাঙ্গনাদের তালিকাভুক্তির এই পুরো প্রক্রিয়াই জটিল ও সময়সাপেক্ষ। অনেককেই কোনো না কোনোভাবে টাকাপয়সা দিতে হয়। তারা দেন। কিন্তু এটা নিয়ে তারা কথা বলেন না। এমনই নানান জটিলতা আছে। এরপর এটা নিয়ে নতুন করে আর কোনো ঝামেলা হোক সেটা চান না। অনেকে ভয় পান, এতে না আবার শেষে বাতিল হয়ে যায়। যিনি যতটা পারেন দেন।’
>
> *- একজন স্বেচ্ছাসেবীর সাক্ষাৎকার*

সংবেদনশীলতা

সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মধ্যে সংবেদনশীলতার ঘাটতি

সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিসরে বীরাঙ্গনাদের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব বিদ্যমান। মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতনের শিকার হওয়া এই নারীদের পরিবার ও সমাজ থেকে সহজভাবে গ্রহণ করা হয়নি। অনেককে পরিবারের আশ্রয় হারাতে হয়েছে, স্বামী-সংসার থেকে বহিষ্কৃত হতে হয়েছে। যারা পরিবারের কাছে আশ্রয় পেয়েছেন, তারা প্রায় সবাই বিষয়টি গোপন রাখার চেষ্টা করেছেন। এই পরিস্থিতিতে এত বছর ধরে আড়াল করে রাখা এই পরিচয় সামনে আনতে বীরাঙ্গনারা দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। তাদের পরিবার-পরিজন নিজেদের সম্মানের ভয়ে বীরাঙ্গনাদের সামনে আসতে বাধার সৃষ্টি করেছে। বীরাঙ্গনা হিসেবে স্বীকৃতি নেওয়ার জন্য আবেদন করতে রাজি হওয়ায় তাদের পরিবার-পরিজন দ্বারা নতুনভাবে নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিবার ও সমাজের চাপে গেজেটভুক্তির আবেদন জমা দেওয়ার পরও তা তুলে নিতে বাধ্য করা হয়েছে।

কেস-২ : সামাজিক অসহযোগিতা

সালমা বেগম (ছদ্মনাম)। যুদ্ধের কিছুদিন আগে তার বিয়ে হয়। যুদ্ধের সময় তিনি শ্বশুরবাড়িতেই ছিলেন। পাকিস্তানি সেনারা যেদিন তাদের বাড়িতে হামলা করে ওই দিন বাড়ির সবাই পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও তিনি পাকিস্তানি সেনাদের হাতে ধরা পড়ে যান এবং নির্যাতনের শিকার হন। ওই ঘটনার পর যুদ্ধের পুরো সময়টা তিনি শ্বশুরবাড়িতেই ছিলেন। তারাও তাকে নিয়ে তখন কিছু বলেন নাই। যুদ্ধের বছর দুয়েক পর তার একটি ছেলেও হয়। কিন্তু ধীরে ধীরে তার শ্বশুরবাড়ির লোকজন, প্রতিবেশীরা তাকে নানাভাবে কথা শোনাতে শুরু করে। কোনো বিষয়ে ঝগড়া হলেই ওই ঘটনার কথা বলে তাকে হেনস্তা করে। তার স্বামী সব শুনলেও কিছু বলেন না। এমনকি তিনিও কারণে-অকারণে তাকে নানা ধরনের অপমানজনক কথা বলেন ওই ঘটনাকে ঘিরে। এভাবে একটা সময় পর তিনি বাধ্য হন শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে চলে আসতে। আসার সময় তাকে তার ছেলেকে আনতে দেওয়া হয়নি এ কথা বলে যে তার সাথে থাকলে ছেলে তার মতোই চরিত্রহীন হবে। এমনকি তার সাথে পরে তার ছেলেকে দেখাও করতে দেওয়া হতো না। এরপর তার অন্যত্র বিয়ে হয়, তার আগের শ্বশুরবাড়ির পাড়াতেই। তারা সবটা জেনেই তাকে ঘরে তুলে এনেছিল। সেখানে তার একটি ছেলে হয়। দরিদ্রতার সাথে লড়াই করে তিনি তার এই ছেলেকে মানুষ করেন। তার স্বামী অসুস্থ হওয়ার কারণে কোনো কাজ করতে পারেন না। তার আগের ছেলে একই পাড়ায় থাকার পরও তার সাথে দেখা করে না, কথাও বলে না। যুদ্ধের এত বছর পরও তাকে এখনো ওই ঘটনার জন্য হেনস্তার শিকার হতে হয়। তার বর্তমান এই সংসারে তার ছেলে তাকে সব সময় সমর্থন করে। গেজেটভুক্তির জন্য সে-ই তার মাকে বুঝিয়েছে। তার অধিকারের জন্য সে তার সাথে লড়ছে। এর জন্য তার ছেলেকেও মানুষের কাছ থেকে নানা কটূক্তি সহ্য করতে হয়।

স্বীকৃতি প্রাপ্তির প্রক্রিয়ায় সংবেদনশীলতার ঘাটতি

গেজেটভুক্তির প্রক্রিয়ায় অন্যতম জটিলতা হচ্ছে যাচাই-বাছাই কমিটির সামনে আবেদনকারী বীরাঙ্গনাকে ১৯৭১ সালে তার সাথে হওয়া নির্যাতনের ঘটনা বর্ণনা করা, যা কোনোভাবেই সংবেদনশীল নয়। নির্যাতনের এ ঘটনা যা এত বছর ধরে তারা ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করছেন, তা নতুন করে আবার নিজ মুখে বর্ণনা করা তাদের জন্য খুবই কষ্টকর। এ ছাড়া তিন-চারজন মানুষের সামনে বসে এমন স্পর্শকাতর একটি বিষয় নিয়ে কথা বলাটাও তাদের জন্য কঠিন। এ ছাড়া বীরাঙ্গনাদের বেশির ভাগই এখন বেশ বয়স্ক। দীর্ঘদিন অভাব-অনটনের মধ্যে থেকে, রোগে ভুগে, নানা নির্যাতন সহ্য করে অনেকেই মানসিকভাবে সমর্থ নন। ফলে বার্ধক্যজনিত বা মানসিক কারণে পুরোনো অনেক স্মৃতি তারা হয় পুরোপুরি বা আংশিক ভুলে গেছেন। এমন পরিস্থিতিতেও তাদের পক্ষে কমিটির সামনে ধারাবাহিকভাবে পুরো ঘটনা বর্ণনা করা সম্ভব হয় না। এ ছাড়া বীরাঙ্গনাদের স্বীকৃতি প্রদানের এই প্রক্রিয়ায় সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের

কারণে সৃষ্ট নেতিবাচক মনোভাব থেকে বীরাঙ্গনা, তাদের পরিবার-পরিজন সর্বোপরি সাধারণ মানুষদের উত্তরণের জন্য কোনো পদক্ষেপ নেই।

স্বীকৃতিপ্রাপ্তি ও সুযোগ-সুবিধার সমস্যা

স্বীকৃতিপ্রাপ্তির পরও বীরাঙ্গনাদের পরিবার ও সমাজের দ্বারা হেনস্তার শিকার হতে হয়। বীরাঙ্গনাদের জন্য সরকারের সম্মানী ভাতাকে স্থানীয় পর্যায়ে ব্যঙ্গ করে 'পাঞ্জাবিদের ভাতা' হিসেবে ব্যবহার করে বীরাঙ্গনাদের অপদস্থ করা হয়। অনেকে এ ক্ষেত্রে নিজেদের স্বীকৃতি ও ভাতাপ্রাপ্তির বিষয়টি এড়ানোর জন্য বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করেন। ভাতার টাকাটি তিনি নিজের স্বামীর অথবা বাবার মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার সুবাদে পাচ্ছেন বলে সন্তানদের বলে থাকেন।

> 'এহনো কথা শুনতে হয় মা। এই যে কেউ আইলেই হেরা কইব ওই যে হের বাপ-মায়েরা আইছিল। পাঞ্জাবিগো ট্যাহা দিতে। পাঞ্জাবিরা তো গেছে গা। এহন হেরা হের ট্যাহা দিতাছে। পোলা-মাইয়াগো সামনেই যা-তা কয়।'
>
> *- একজন বীরাঙ্গনার সাক্ষাৎকার*

ভাতার টাকা নিয়েও বীরাঙ্গনাদের নানা সমস্যার শিকার হতে হয়। ছেলেমেয়েরা ভাতার টাকা ভাগাভাগী নিয়ে চাপ প্রয়োগ করে। ভাতার সম্পূর্ণ টাকা ছেলেমেয়েরা কে কতটুকু অংশ নেবে, কাকে কী দিতে হবে এ নিয়ে চাপ প্রয়োগ করে। এমনকি মেয়ের জামাইও মেয়েকে চাপ প্রয়োগ করে ভাতার টাকার অংশ দেওয়ার জন্য, না হলে মেয়েকে তালাক দিয়ে দেওয়ার হুমকি দেয়।

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

মুক্তিযুদ্ধের চার দশক পরে হলেও মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বীরাঙ্গনাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান সরকারের একটি অনন্য পদক্ষেপ। তবে বীরাঙ্গনাদের চিহ্নিত করা থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও সুযোগ-সুবিধা প্রদানের পুরো প্রক্রিয়ায় নানা ঘাটতি বিদ্যমান। বীরাঙ্গনাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও অধিকারপ্রাপ্তির প্রক্রিয়া যেখানে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে বাস্তবায়ন করা আবশ্যক, সেখানে পরিকল্পনাহীনতা, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ঘাটতি, কাঠামোগত জটিলতা, অনিয়ম-দুর্নীতির সুযোগ, জবাবদিহির ব্যবস্থা ও সংবেদনশীলতায় ঘাটতি প্রক্রিয়াটিকে করে তুলেছে জটিল। তার সাথে সামাজিক সচেতনতা ও সংবেদনশীলতার ঘাটতিও লক্ষণীয়। স্বাধীনতার এত বছর পরও সামাজিক মূল্যবোধে অনেকাংশেই স্থবিরতা রয়ে গেছে। স্থানীয় পর্যায়ে সামাজিক-সাংস্কৃতিক নেতিবাচক মনোভাবের কারণে বীরাঙ্গনারা এখনো প্রান্তিকীকরণের শিকার। বীরাঙ্গনাদের নিয়ে বিভিন্ন বেসরকারি ও নারীবিষয়ক প্রতিষ্ঠান এবং মিডিয়ার নির্দিষ্ট কিছুসংখ্যক কাজ থাকলেও তা নারীবিষয়ক অন্য যেকোনো কাজের তুলনায় বেশ অপ্রতুল। বীরাঙ্গনাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও অধিকার প্রদানের এ প্রক্রিয়াটি গতানুগতিক অন্যান্য প্রক্রিয়া থেকে ভিন্ন। কিন্তু বীরাঙ্গনাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও সুযোগ-সুবিধাপ্রাপ্তির পুরো প্রক্রিয়া গতানুগতিক আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিনির্ভর। সংবেদনশীল এ বিষয়টি বিশেষ বিবেচনায় না রাখার কারণে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি বীরাঙ্গনাদের জন্য অনেক ক্ষেত্রেই জটিলতার সৃষ্টি করছে।

সুপারিশ

১. বীরাঙ্গনাদের খুঁজে বের করার জন্য নির্দিষ্ট কাঠামো ঠিক করতে হবে। উপজেলা পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী ও তরুণ প্রজন্মের নাগরিকদের নিয়ে কমিটি গড়ে তোলা যেতে পারে, যেখানে মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শীদের সহায়তা নিয়ে তরুণ প্রজন্ম স্থানীয় পর্যায়ে বীরাঙ্গনাদের খুঁজে বের করবে এবং তালিকাভুক্ত করতে সার্বিক সহায়তা করবে।

২. স্থানীয়/উপজেলা পর্যায়ে গেজেটভুক্তির আবেদনের প্রক্রিয়া থেকে সব সুযোগ-সুবিধাপ্রাপ্তির প্রক্রিয়ায় সার্বিকভাবে সহায়তা করার জন্য মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় থেকে নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে দায়িত্ব প্রদান করতে হবে। গেজেটভুক্তি ও অন্যান্য সুবিধাপ্রাপ্তির তথ্য স্থানীয়/উপজেলা পর্যায়ে নির্দিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির মাধ্যমে সুবিধাভোগীর কাছে পৌঁছাতে হবে।

৩. গেজেটভুক্তি হতে শুরু করে ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাপ্রাপ্তির প্রক্রিয়া আবেদন করার পর সর্বোচ্চ কত দিনের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে সে বিষয়ে নির্দিষ্ট নির্দেশনা থাকতে হবে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।

৪. সার্বিক তথ্য-প্রমাণাদি যাচাই-বাছাই করে আবেদনের সত্যতা পাওয়া গেলে বীরাঙ্গনাদের সাক্ষাৎকারের বিষয়টি বাদ দিতে হবে।

৫. গেজেটে তথ্যের নির্ভুলতা নিশ্চিত করতে হবে এবং তথ্যগত জটিলতা এড়ানোর জন্য, বিশেষ করে জাতীয় পরিচয়পত্রে বয়সসংক্রান্ত ভুল সংশোধনের ক্ষেত্রে দ্রুত ও বিশেষ পদক্ষেপ নিতে হবে।

৬. বীরাঙ্গনাদের আবাসন-সুবিধা পাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ জমির বিষয়টি বাতিল করতে হবে এবং অসচ্ছল ও ভূমিহীন বীরাঙ্গনাদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আবাসন বরাদ্দ করতে হবে।

৭. সমাজে বীরাঙ্গনাদের সম্মানজনক অবস্থানের জন্য তাদের অবদানকে পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। মুক্তিযুদ্ধ ও নারীবিষয়ক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে/কাজে বীরাঙ্গনাবিষয়ক কার্যক্রম আরও গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে এবং গণমাধ্যমে বীরাঙ্গনাদের অবদান গুরুত্বের সাথে তুলে ধরতে হবে।

৮. স্বাধীনতা ও বিজয় দিবসকেন্দ্রিক বিভিন্ন সরকারি অনুষ্ঠানে বীরাঙ্গনাদের সম্পৃক্ত করতে হবে।

৯. বীরাঙ্গনাদের সামাজিক স্বীকৃতির জন্য সচেতনতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে, যাতে বীরাঙ্গনারা নিজেদের প্রাপ্য সম্মান গ্রহণের জন্য এগিয়ে আসতে উদ্বুদ্ধ হন।

১০. বীরাঙ্গনাদের তালিকাভুক্তি হতে শুরু করে বিভিন্ন সুবিধাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে কার্যকর জবাবদিহি কাঠামো তৈরি করতে হবে এবং অনিয়ম ও দুর্নীতির বিষয়ে প্রশাসনকে বিশেষভাবে নজরদারি করতে হবে।

তথ্যসূত্র

১ *সমকাল*, 'মুক্তিযুদ্ধে অবদান ও স্বীকৃতি', ৩০ জানুয়ারি ২০১৪; samakal.com/todays-print-edition/tp-editorial-comments/article/140136137/ (২৮ জানুয়ারি ২০২২)।

২ দৈনিক *আমাদের সময়*, 'মুক্তিযুদ্ধে বীরাঙ্গনাদের অবদান ও স্বীকৃতি', ১৫ ডিসেম্বর ২০১৯; www.dainikamadershomoy.com/post/231819 (২৮ জানুয়ারি ২০২২)।

৩ Sharlach, L. (2000). 'Rape as genocide: Bangladesh, the former Yugoslavia, and Rwanda'. *New Political Science*, 22(1), 89-102.

৪ *সারা বাংলা*, 'মুক্তিযুদ্ধে নারী নির্যাতন কড়চা', sarabangla.net/post/sb-659215/ (২ এপ্রিল ২০২২)।

৫ পাকিস্তানি সেনাদের ধর্ষণ ও নির্যাতনের বহুমাত্রিক দিক- ইতিহাসের কৃষ্ণ অধ্যায়, songramernotebook.com/archives/45073 (২২ জানুয়ারি ২০২২)।

৬ Mookherjee N. History and the Birangona. The ethics of representing narratives of sexual violence of the 1971 Bangladesh war, 2017.

৭ বীরাঙ্গনা ও যুদ্ধশিশুদের পুনর্বাসনে বঙ্গবন্ধু, ২১ মার্চ ২০২০।

৮ প্রাগুক্ত।

৯ ঢাকা ট্রিবিউন, 'বীরাঙ্গনা : বঙ্গবন্ধুর কন্যারা' ১৬ মার্চ ২০২০, https://bangla-archive.dhakatribune.com/bangladesh/2020/03/17/21213 (২২ জানুয়ারি ২০২২)

১০ বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮।

১১ আলী, 'বীরাঙ্গনাদের সীমাহীন ত্যাগ অতঃপর মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি', ১১ ডিসেম্বর ২০২০; sangbad.net.bd/opinion/post-editorial/21257/ (২৫ জানুয়ারি ২০২২)।

১২ প্রাগুক্ত

১৩ বীরাঙ্গনা গেজেট, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বিস্তারিত দেখুন : molwa.gov.bd

১৪ মুক্তিযোদ্ধা গেজেটভুক্তির প্রক্রিয়া, জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল, বিস্তারিত দেখুন : http://www.jamuka.gov.bd/site/page/2c18b120-5a43-45f5-a4f0-666e92b8d595/

১৫ *প্রথম আলো*, 'বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা হচ্ছে ২০,০০০ টাকা', ৯ জুন ২০২১; www.prothomalo.com/business/ (২৫ জানুয়ারি ২০২২)।

১৬ সম্মানী ভাতা বিতরণবিষয়ক প্রজ্ঞাপন, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বিস্তারিত দেখুন : dpp.gov.bd/upload_file/gazettes/40559_50451.pdf

১৭ সব বীর মুক্তিযোদ্ধা পাবেন উৎসব-নববর্ষ-বিজয় দিবস ভাতা, ৫ এপ্রিল ২০২১; www.jagonews24.com/national/news/656377# (২৬ জানুয়ারি ২০২২)।

১৮ *যুগান্তর*, 'মুজিববর্ষেই দ্বিগুণ হলো বীর নিবাস', ২৭ মার্চ ২০২১; www.jugantor.com/todays-paper/first-page/405912/ (২৫ জানুয়ারি ২০২২)।

১৯ বীর মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যুতে রাষ্ট্রীয়ভাবে সম্মান প্রদর্শন আদেশ, ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: http://www.molwa.gov.bd/sites/default/files/files/molwa.portal.gov.bd/policies/b693a503_c383_4e07_83c0_925f6a5dc06f/

২০ বীরাঙ্গনা গেজেট, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বিস্তারিত দেখুন: http://www.molwa.gov.bd/

২১ বীরাঙ্গনা গেজেট, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বীর মুক্তিযোদ্ধা তথ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম, বিস্তারিত দেখুন: http://www.molwa.gov.bd/

২২ প্রাগুক্ত।

২৩ জামুকা অ্যাক্ট ২০০২, বিস্তারিত দেখুন, http://www.jamuka.gov.bd/sites/default/files/files/jamuka.portal.gov.bd/law/984bb742_762a_46ef_87df_a0acda31452b/Jamuca%20Act,2002.pdf; মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট আইন ২০১৮, বিস্তারিত দেখুন, http://www.molwa.gov.bd/sites/default/files/files/molwa.portal.gov.bd/page/802824c6_af5c_49c6_9ac2_de6bbbff58ed/

২৪ ভূমিহীন ও অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বাসস্থান নির্মাণ প্রকল্প, বিস্তারিত দেখুন, http://www.molwa.gov.bd/site/page/ab9b255d-84a8-4bf1-9aaa-ac4714c640dc/%E0%A7%AB

২৫ ভূমিহীন ও অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বাসস্থান নির্মাণ প্রকল্প, *প্রাগুক্ত*।

২৬ বীরাঙ্গনা গেজেট, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, *প্রাগুক্ত*।

২৭ বীরাঙ্গনা গেজেট, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, *প্রাগুক্ত*।

২৮ বীরাঙ্গনা গেজেট, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বীর মুক্তিযোদ্ধা তথ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম, *প্রাগুক্ত*।

তৃতীয় অধ্যায়

পরিবেশ ও জলবায়ু অর্থায়ন

বাংলাদেশে কয়লা ও এলএনজি বিদ্যুৎ প্রকল্প সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়*

মো. মাহ্‌ফুজুল হক ও মো. নেওয়াজুল মওলা

গবেষণার প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন বাংলাদেশের সংবিধানের মূলনীতির (১৮-ক অনুচ্ছেদ) অংশ হলেও পরিবেশগত সংকটাপন্ন ও ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় কয়লা ও এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে।[১] প্যারিস চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ হ্রাস এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রসারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, যা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৭ ও ১৩-এর পূর্বশর্ত হিসেবে গণ্য করা হয়। অন্যদিকে সবার জন্য সুলভ, সাশ্রয়ী এবং পরিবেশবান্ধব বিদ্যুৎ সরবরাহে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ও জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী কয়লা ও তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসকে (এলএনজি) প্রাধান্য দিয়ে বাংলাদেশে জ্বালানি খাতে বিনিয়োগ অব্যাহত রয়েছে। ২০২১ সালে ১০টি কয়লাভিত্তিক প্রকল্প বন্ধ করার পরও[২] ২০৩০ সালের মধ্যে সরকার ১০,০০০-১২,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কয়লা থেকে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে, যার পরিমাণ হবে মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের এক-চতুর্থাংশ। বাতিলকৃত কয়েকটি প্রকল্পকে এলএনজিতে রূপান্তর করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যা বিদ্যুৎ খাতকে আরও ব্যয়বহুল আমদানিনির্ভর জীবাশ্ম জ্বালানির দিকে ঝুঁকে পড়াকেই ইঙ্গিত করে। এ ছাড়া বিদেশি ঋণের ঝুঁকি নিয়ে জীবাশ্ম জ্বালানিনির্ভর বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে এবং প্রয়োজনের বেশি (উদ্বৃত্ত) উৎপাদনের ফলে ক্যাপাসিটি চার্জ প্রদান অব্যাহত রয়েছে।[৩]

পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) এবং ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নবায়নযোগ্য খাত থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি না হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করে এ খাত থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধিতে জোর দেওয়া হলেও এ-সংক্রান্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ঘাটতি রয়েছে। তা ছাড়া পাওয়ার সিস্টেম মাস্টারপ্ল্যান (পিএসএমপি) এবং ইন্টিগ্রেটেড এনার্জি অ্যান্ড পাওয়ার মাস্টারপ্ল্যান (আইইপিএমপি) প্রস্তুতে জাইকা ও টোকিও ইলেকট্রিক পাওয়ার কোম্পানি-টেপকোর অঙ্গসংগঠনের স্বার্থের দ্বন্দ্ব রয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। অন্যদিকে দ্রুত বিদ্যুৎ সরবরাহ আইনের আওতায় জ্বালানি প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে কয়লাবিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যয় বৈশ্বিক গড়ের দ্বিগুণ। জনপরিসরে এ-সংক্রান্ত তথ্যের স্বল্পতা রয়েছে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে বিবিধ অনিয়মের অভিযোগও গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

---

* ২০২২ সালের ১১ মে ঢাকায় ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ।

ইতিপূর্বে টিআইবি পরিচালিত গবেষণায় কয়লাবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ এবং পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষায় সুশাসনের ঘাটতি প্রতিফলিত হয়েছে। তবে কয়লা এবং এলএনজি বিদ্যুৎ প্রকল্পের পরিকল্পনা, অনুমোদন ও বাস্তবায়ন কার্যক্রমে সুশাসন-সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ গবেষণার ঘাটতি রয়েছে। ফলে কয়লা এবং এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলোর পরিকল্পনা, অনুমোদন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার দিকগুলো সুশাসনের আঙ্গিকে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করার প্রয়োজনীয়তা থেকে এ গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য কয়লা ও এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের পরিকল্পনা, অনুমোদন এবং বাস্তবায়নের নীতিকাঠামো বিশ্লেষণসহ সুশাসনের চ্যালেঞ্জগুলো চিহ্নিত করা। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে :

- কয়লা ও এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার এবং সংশ্লিষ্ট আইন, নীতি ও বিধিবিধান প্রতিপালনে চ্যালেঞ্জগুলো চিহ্নিত করা;
- কয়লা ও এলএনজিভিত্তিক প্রকল্প অনুমোদনের কারণ এবং প্রভাবকগুলো চিহ্নিত করা;
- গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত কয়লা ও এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের অনুমোদন এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন, মাত্রা ও কারণ চিহ্নিত করা এবং
- চ্যালেঞ্জগুলো উত্তরণে সুপারিশ প্রস্তাব করা।

গবেষণাপদ্ধতি ও সময়কাল

এটি একটি গুণগত পদ্ধতির গবেষণা। তবে ক্ষেত্রবিশেষে সংখ্যাগত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। গুণগত পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করে তথ্য সংগ্রহ, যাচাই ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ গবেষণায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণাটি ফেব্রুয়ারি ২০২১ থেকে এপ্রিল ২০২২-এর মধ্যে সম্পন্ন করা হয়।

প্রকল্প নির্বাচন : গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে তিনটি প্রকল্প (দুটি কয়লাভিত্তিক ও একটি এলএনজিভিত্তিক) বেছে নেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, পিএসএমপি বাস্তবায়নে প্রকল্পগুলো অনুমোদন (দেখুন পরিশিষ্ট ১: প্রকল্প অনুমোদনের প্রক্রিয়া) করা হয়েছে। প্রকল্প নির্বাচনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করা হয়েছে :

ক. প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা, জলবায়ু ঝুঁকি বিবেচনা করে প্রকল্পের অবস্থান;

খ. প্রকল্পের আকার ও বাজেট;

গ. প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি এবং

ঘ. প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, বাস্তুতন্ত্র এবং প্রকল্প নিকটবর্তী এলাকার জনগোষ্ঠীর জীবিকার ওপর প্রভাব।

সারণি ১ : গবেষণার জন্য নির্বাচিত প্রকল্প

প্রকল্পের নাম	ধরন	অর্থায়নকারী	ক্ষমতা (মে.ও.)	চুক্তির সাল	অবস্থান
বরিশাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র	কয়লা	ডিএফসি হোল্ডিং; হংকং হোল্ডিংস; আইসোটেক; পাওয়ার চায়না কনসোর্টিয়াম; বাংলাদেশ সরকার	৩৫০	২০১৭	নিশানবাড়িয়া, তালতলী, বরগুনা
বাঁশখালী এসএস বিদ্যুৎকেন্দ্র	কয়লা	এস আলম গ্রুপ; সেপকো; এইচটিজি ডেভেলপমেন্ট গ্রুপ: চীনের ঋণ (৭টি ব্যাংক) বাংলাদেশ সরকার	১৩২০	২০১৩	গন্ডামারা, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম
মাতারবাড়ী এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্র	এলএনজি	কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড, মিতসুই কোম্পানি লিমিটেড	৬০০	২০১৫	মাতারবাড়ী, মহেশখালী, কক্সবাজার

তথ্য সংগ্রহপদ্ধতি : গবেষণায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্যের উৎস ছিল মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার ও ফোকাস দলীয় আলোচনা (এফজিডি)। মুখ্য তথ্যদাতা হিসেবে সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, জ্বালানি ও ইআইএ বিশেষজ্ঞ, অর্থনীতিবিদ, আইনজীবী, সংশ্লিষ্ট স্থানীয় জনগণ, মানবাধিকারকর্মী, জনপ্রতিনিধি এবং গণমাধ্যমকর্মীর কাছ থেকে সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট স্থানীয় জনগণের মধ্যে এফজিডি করা হয়েছে। পরোক্ষ তথ্য হিসেবে সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও নীতিমালা, প্রাসঙ্গিক গবেষণা প্রতিবেদন, গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ, পরিবেশগত সমীক্ষা প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি প্রতিবেদন এবং ওয়েবসাইট বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

সারণি ২ : তথ্যের ধরন, উৎস ও সংগ্রহপদ্ধতি

তথ্যের ধরন	তথ্য সংগ্রহপদ্ধতি	তথ্যের উৎস
প্রত্যক্ষ তথ্য	মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার	সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, জ্বালানি ও ইআইএ বিশেষজ্ঞ, অর্থনীতিবিদ, আইনজীবী, সংশ্লিষ্ট স্থানীয় জনগণ, মানবাধিকারকর্মী, জনপ্রতিনিধি, গণমাধ্যমকর্মী, ইত্যাদি
	ফোকাস দলীয় আলোচনা (এফজিডি)	সংশ্লিষ্ট স্থানীয় জনগণ
পরোক্ষ তথ্য	বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা	সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও নীতিমালা, প্রাসঙ্গিক গবেষণা প্রতিবেদন, গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ, পরিবেশগত সমীক্ষা প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি প্রতিবেদন এবং ওয়েবসাইট

বিশ্লেষণকাঠামো

ছয়টি সূচকের আলোকে এই গবেষণার তথ্য সংগ্রহ, যাচাই এবং প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে আইন ও নীতির প্রতিপালন, সক্ষমতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, অংশগ্রহণ এবং অনিয়ম ও দুর্নীতি (সারণি ৩)।

সারণি ৩ : সুশাসনের নির্দেশকের ভিত্তিতে বিশ্লেষণকাঠামো

সুশাসনের নির্দেশক	পর্যবেক্ষণের সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্র
আইন ও নীতির প্রতিপালন	• আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার এবং জাতীয় আইন, নীতি ও বিধান
সক্ষমতা	• প্রযুক্তিগত সক্ষমতা; জ্বালানি খাতের অবকাঠামো; জ্বালানি প্রকল্পের আর্থিক ব্যবস্থাপনা
স্বচ্ছতা	• তথ্য প্রকাশ- স্বপ্রণোদিত এবং চাহিদাভিত্তিক • ওয়েবসাইট ও হালনাগাদ তথ্য ব্যবস্থাপনা
জবাবদিহি	• তদারকি এবং নিরীক্ষা; অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া • প্রকল্প অনুমোদনে বিবিধ চুক্তি সম্পাদন
অংশগ্রহণ	• স্থান নির্বাচন, পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়নসহ ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ • স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন, জীবিকা, প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থান
অনিয়ম ও দুর্নীতি	• প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়ন • পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা সম্পাদন ও পরিবেশ ছাড়পত্র প্রদান • ভূমি অধিগ্রহণ, ক্ষতিপূরণ নিরূপণ এবং বিতরণ • বিভিন্ন অংশীজনের স্বার্থ

গবেষণার ফলাফল

সংশ্লিষ্ট আইন, নীতি ও বিধিমালা : প্রণয়ন ও প্রতিপালনে চ্যালেঞ্জ

জ্বালানি মহাপরিকল্পনা পাওয়ার সিস্টেম মাস্টারপ্ল্যান (পিএসএমপি) প্রস্তুত

বাংলাদেশ সরকার জ্বালানি খাতের মহাপরিকল্পনা (পিএসএমপি) নিজেরা প্রস্তুত করতে পারেনি। এই মহাপরিকল্পনা তৈরিতে সরকার বারবার জাইকার অর্থ গ্রহণ করেছে এবং জাইকা একই প্রতিষ্ঠানকে (টোকিও ইলেকট্রিক পাওয়ার কোম্পানি-টেপকো) বারবার পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে।[৪] দেখা যায় জীবাশ্ম জ্বালানি খাতে জাপানের নিজস্ব ব্যবসা সম্প্রসারণের স্বার্থে কয়লা এবং এলএনজিকে প্রাধান্য দিয়ে বাংলাদেশের জ্বালানি মহাপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে। তা ছাড়া পিএসএমপি প্রস্তুতে দেশীয় বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণের সুযোগ রাখা হয়নি। এমনকি বিদ্যুৎ বিভাগ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে কার্যকর সমন্বয় করাসহ জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় যথাযথ ভূমিকা পালন করেনি বলে সংশ্লিষ্ট অংশীজন তথ্য প্রদান করেন।[৫] পিএসএমপি প্রস্তুতের সাথে জড়িত

প্রতিষ্ঠানের প্রকল্প বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ এবং জ্বালানি খাতের প্রকল্প বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট কিছু প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তির সুযোগ তৈরি করা হয়েছে, ফলে স্বার্থের দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে। যেমন, টেপকোর অঙ্গসংগঠন টেপসকোসহ (টোকিও ইলেকট্রিক পাওয়ার সার্ভিস কোম্পানি লিমিটেড) জেরা ও মারুবেনিকে বিদ্যুৎ উৎপাদন, পরিবহন, বিতরণসহ ইআইএ ও ইঞ্জিনিয়ারিং পরামর্শক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।[৬]

রিভিজিটিং পাওয়ার সিস্টেম মাস্টারপ্ল্যান (পিএসএমপি) ২০১৬

ভবিষ্যৎ জ্বালানি চাহিদা নিরূপণ : পিএসএমপিতে (২০১৬) ভবিষ্যৎ জ্বালানির চাহিদা নিরূপণে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে সরবরাহ ও চাহিদার অসংগতিসহ ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতিতে ২০৪১ সালের মধ্যে ৮২ হাজার মেগাওয়াট জ্বালানি চাহিদা প্রাক্কলন করা হয়েছে, যার ৭০ শতাংশ কয়লা ও গ্যাস থেকে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।[৭] নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকার ১৮টি কয়লা ও এলএনজি প্রকল্প অনুমোদন দিয়েছে। ফলে চাহিদা না থাকলেও প্রাক্কলন অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন করায় সক্ষমতার অর্ধেক বিদ্যুৎ ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে এবং অব্যবহৃত বিদ্যুতের জন্য ক্রমাগত ভর্তুকি গুনতে হচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (বিপিডিবি) জন্য ভর্তুকির পরিমাণ ছিল ১১ হাজার ৭০০ কোটি টাকা। উল্লেখ্য, ২০২০ সাল পর্যন্ত বিপিডিবির মোট ৬২ হাজার ৭০২ কোটি টাকার পুঞ্জীভূত ক্ষতি হয়েছে।

জ্বালানি মিশ্রণ নির্ধারণ (এনার্জি মিক্স) : পিএসএমপি (২০১৬) প্রস্তুতে জ্বালানি মিশ্রণে আমদানিনির্ভর কয়লা ও এলএনজিকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু বৈশ্বিক বাজারে জ্বালানির দাম ও জ্বালানি ব্যবস্থার ক্রমাগত রূপান্তরকে বিবেচনার ক্ষেত্রে ঘাটতি থাকায় বারবার জ্বালানি মিশ্রণে পরিবর্তন করতে হয়েছে। ফলে কখনো অভ্যন্তরীণ কয়লা ও গ্যাস আবার কখনো আমদানিনির্ভর কয়লা ও এলএনজিকে গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে। তা ছাড়া অভ্যন্তরীণ গ্যাস ও কয়লা উত্তোলন এবং এর দক্ষ ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিতে ঘাটতি রয়েছে।[৮] ফলে জ্বালানিনীতি পরিবর্তনের সাথে সাথে জ্বালানি অবকাঠামো নির্মাণে পরিবর্তন করা হচ্ছে এবং এ খাতে বিনিয়োগে আর্থিক ক্ষতি ও অপচয় হচ্ছে। উল্লেখ্য, এক দশকে বিদ্যুতের দাম গড়ে ৯১ শতাংশ বৃদ্ধিসহ মোট নয়বার বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে।[৯]

জ্বালানিব্যবস্থার রূপান্তর/নবায়নযোগ্য উৎসে গুরুত্ব প্রদান : পিএসএমপি (২০১৬) প্রস্তুতে জ্বালানিব্যবস্থার রূপান্তরকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়নি। বৈশ্বিক বাজারে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন খরচ ৮৯ শতাংশ পর্যন্ত কমলেও এই জ্বালানিকে গুরুত্ব প্রদানে ঘাটতি রয়েছে; বিশেষ করে ৩০ হাজার মেগাওয়াট নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা থাকলেও এ খাতকে পর্যাপ্ত গুরুত্ব প্রদান করা হয়নি। এ খাত থেকে ২০২১ সালের মধ্যে মাত্র ২ হাজার ৮০০ মেগাওয়াট ও ২০৪১ সালে ৯ হাজার ৪০০ মেগাওয়াট উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। অন্যদিকে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-৭ মতে, নিম্নমধ্যম আয়ের দেশের জন্য মোট ব্যবহৃত বিদ্যুতের ১৭ শতাংশ নবায়নযোগ্য হওয়ার শর্ত হলেও তা ১০ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে।

নির্ধারিত এই উৎপাদন সক্ষমতার ১০ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২০২১ সালের মধ্যে মাত্র ৭৭৯ মেগাওয়াট (মোট সক্ষমতার ২ দশমিক ৩ শতাংশ) উৎপাদন সক্ষমতা অর্জন করেছে। এ ছাড়া ২০২১ সাল পর্যন্ত ৪২টি নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্পের মধ্যে মাত্র চারটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং নবায়নযোগ্য উৎস থেকে গ্রিডে প্রাইভেট বিদ্যুৎ বিক্রয়ের কার্যকর মডেল না থাকায় ক্ষেত্রবিশেষে উৎপাদিত বিদ্যুৎ অব্যবহৃত থাকছে।

সঞ্চালন লাইন প্রস্তুতে গুরুত্ব প্রদান : পিএসএমপিতে (২০১৬) জ্বালানি উৎপাদনে গুরুত্ব প্রদান করা হলেও সঞ্চালন লাইন তৈরিতে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ফলে সঞ্চালন লাইন না থাকায় ক্ষেত্রবিশেষে নির্মিত বিদ্যুৎকেন্দ্র উৎপাদনে এলেও জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। উৎপাদিত বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে না পারায় ক্যাপাসিটি চার্জ বাবদ ভর্তুকি প্রদানের ফলে সরকারের আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০

সাময়িক সময়ের জন্য দ্রুত বিদ্যুৎ উৎপাদনে ২০১০ সালে চার বছর মেয়াদে বিশেষ বিধান আইনটি প্রণয়ন করা হলেও উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরও ৩ দফা মেয়াদ বৃদ্ধি করে ২০২৬ সাল পর্যন্ত আইনটি কার্যকর রাখা হয়েছে। এই আইনের আওতায় পরিবেশবান্ধব এবং আর্থিকভাবে সাশ্রয়ী নয় এমন বড় ও দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্পগুলো অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে। অপরিকল্পিতভাবে রেন্টাল বা কুইক রেন্টালসহ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রকল্প বাস্তবায়নে অনিয়মের সুযোগ তৈরি হয়েছে। ধারা (৩)-এ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৬-কে পাশ কাটিয়ে এই আইনের প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ফলে যোগ্য প্রতিষ্ঠান থাকলেও উন্মুক্ত দরপত্র প্রক্রিয়ায় না গিয়ে পূর্বনির্ধারিত কিছু প্রতিষ্ঠানকে কাজ দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। ফলে জ্বালানি খাতের বিবিধ ক্রয়, ঠিকাদার নিয়োগ এবং কার্যাদেশ প্রদানসহ প্রকল্প বাস্তবায়নে অনিয়মের ঝুঁকি বৃদ্ধি পেয়েছে। তা ছাড়া অযোগ্য প্রতিষ্ঠান থেকে অধিক দামে বিদ্যুৎ ক্রয়ের চুক্তি করা, সময়মতো উৎপাদনে আসতে ব্যর্থ হওয়া এবং জ্বালানি খাতে ব্যয় বৃদ্ধিসহ এ খাতে রাষ্ট্রীয় অর্থের অপচয় হচ্ছে। ধারা (৯)–এ এই আইনের অধীনে গৃহীত প্রকল্পে সম্পাদিত বিবিধ কার্যক্রমের বৈধতা সম্পর্কে আদালতের এখতিয়ার রহিত করা হয়েছে। ফলে বাস্তবায়নকৃত কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট আইনের লঙ্ঘন, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির ঘাটতি সম্পর্কে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ নেই। কিছু ইনডিপেনডেন্ট পাওয়ার প্রডিউসার (আইপিপি) গত ১০ বছরে কোনো বিদ্যুৎ উৎপাদন না করলেও সরকার তাদের ৪৩ হাজার ১৭০ কোটি টাকা অন্যায্যভাবে পরিশোধ করতে বাধ্য হয়েছে।

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫

এই আইনে সীমানা নির্ধারণ ও প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা এবং এ ধরনের এলাকা ব্যবস্থাপনার কথা বলা হলেও [ধারা ৫ (১ ও ২)] এলাকার সীমানা নির্ধারণসংক্রান্ত কোনো নির্দেশনা নেই। ফলে ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও কিছু সংকটাপন্ন এলাকার সীমানা নির্ধারণ করা হচ্ছে না এবং প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা হিসেবেও ঘোষণা করা হচ্ছে না। এ ছাড়া এই আইনে ‘অপরিহার্য

জাতীয় স্বার্থে'র উল্লেখ রেখে জলাধার ভরাট ও শ্রেণি পরিবর্তনের সুযোগ রাখা হয়েছে [ধারা ৬(ঙ)]। কিন্তু এই 'অপরিহার্য জাতীয় স্বার্থ'–এর সংজ্ঞা নির্দিষ্ট না থাকায় এই ধারার অপব্যবহার করা হচ্ছে এবং জলাধারের শ্রেণি পরিবর্তন করে প্রকল্পের স্থাপনা নির্মাণ করা হচ্ছে। যেমন, মাতারবাড়ীতে কুহেলিয়া নদীর পাড় ধরে ৭ দশমিক ৩৫ কিমি বাঁধ-কাম সড়ক নির্মাণের জন্য গৃহীত ৬২ দশমিক ২৫ একর জমি নদী ও খাস শ্রেণিভুক্ত হলেও তার শ্রেণি পরিবর্তনের সুপারিশ করা হয়েছে এবং নদীর ৮-১০ মিটার ভেতরে বাঁধ ও রাস্তা নির্মাণ এবং নদীর ভেতরে দ্বীপ নির্মাণ করে সেতু নির্মাণকাজ পরিচালনা করা হচ্ছে। এই আইনে পরিবেশগত ছাড়পত্রের বিষয়ে বলা হলেও [ধারা ১২] অবস্থানগত ছাড়পত্র নিয়ে প্রকল্পের কাজ শুরুর সুযোগ রাখা হয়েছে এবং পরে কাজ অনেকখানি হয়ে যাওয়ার পর 'পরিবর্ধিত পরিবেশ সমীক্ষা' (এক্সটেনশন ইআইএ) করার মাধ্যমে ছাড়পত্র দেওয়ার সুযোগ রাখা হয়েছে। ফলে এই সুযোগের অপব্যবহার করে পরিবেশ-প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ ও বিপজ্জনক এলাকায় কয়লা, এলএনজিসহ অন্যান্য ভারী শিল্প প্রকল্প গ্রহণ এবং নির্মাণকাজ পরিচালনা করা হচ্ছে। ক্ষেত্রবিশেষে নদী ও জলাধার সুরক্ষায় জড়িত প্রতিষ্ঠান, যেমন নদী কমিশনের আপত্তিকে অগ্রাহ্য করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, সরেজমিন পরিদর্শনে জলাধার ভরাটের সত্যতা পেলেও পরিবেশ অধিদপ্তর আইনি ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারছে না এবং নির্মাণকাজও বন্ধ করতে পারছে না বলে অভিযোগ রয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে ত্রুটিপূর্ণ ইআইএ দিয়ে ছাড়পত্র নেওয়া হচ্ছে এবং ইআইএ সংশোধনের নামে দফায় দফায় ইআইএ পরিবর্তন করা হচ্ছে।

জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অনুমিত অবদান (আইএনডিসি) প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ

প্যারিস চুক্তির আওতায় আইএনডিসিতে বাংলাদেশ শর্তহীনভাবে ৫ শতাংশ এবং তহবিল প্রাপ্তিসাপেক্ষে ১৫ শতাংশ কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের প্রতিশ্রুতি প্রদান করলেও[১০] তা বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়নি। বাংলাদেশ সরকারের প্রতিশ্রুত কার্বন নিঃসরণ হ্রাসসংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে আলাদা পরিকল্পনাসহ নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের রূপরেখা নেই। অন্যদিকে, সুপার ক্রিটিক্যাল ও আলট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল প্রযুক্তির নামে কয়লা প্রকল্প বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে এবং প্রস্তাবিত ১৮টি প্রকল্প থেকে ২০৩০ সালনাগাদ প্রতিবছর ১ লাখ ১০ হাজার টন কার্বন নিঃসরণের আশঙ্কাসহ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ৬৩ গুণ বৃদ্ধির আশঙ্কা রয়েছে। তা ছাড়া ২০০৮ সালে জ্বালানি খাত থেকে ৪১ মিলিয়ন টন কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসরিত হয়েছে এবং ২০১৯ সালে তা বেড়ে ৮৯ মিলিয়ন টনে উন্নীত হয়েছে, যা ২০০৮ সালের তুলনায় ১১৮ শতাংশ বেশি।

চিত্র ১ : বাংলাদেশে কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসরণের পরিমাণ (২০০৮-২০১৯)

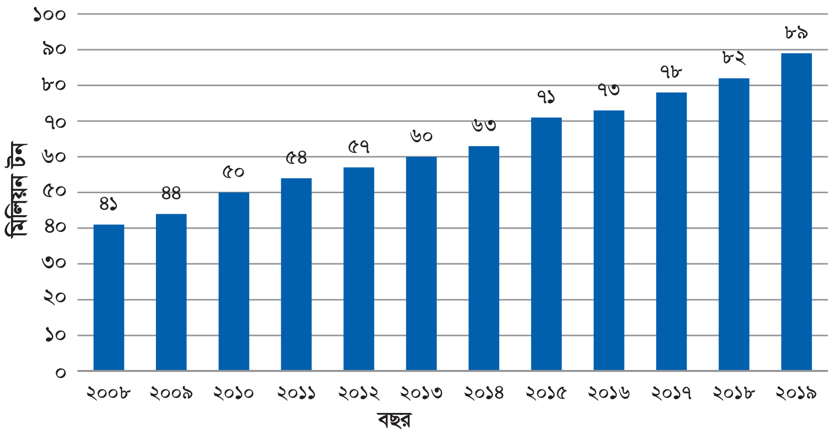

সক্ষমতার চ্যালেঞ্জ

কয়লা এবং এলএনজিভিত্তিক প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রযুক্তিগত সক্ষমতার ঘাটতি

কয়লা ও এলএনজিভিত্তিক প্রকল্প বাস্তবায়নে বাংলাদেশের নিজস্ব প্রযুক্তিগত সক্ষমতার ঘাটতি রয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নে নিজস্ব প্রযুক্তিগত সক্ষমতা না থাকার ফলে আমদানিনির্ভর প্রযুক্তি দিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সেই সাথে চীন ও জাপানের পুরোনো এবং ব্রাউন ফিল্ড বয়লারগুলোকে গ্রিন নামে চালিয়ে দেওয়াসহ উন্নত দেশের উদ্বৃত্ত ও অব্যবহৃত কয়লা প্রযুক্তির 'ডাম্পিং ক্ষেত্র' হিসেবে বাংলাদেশকে ব্যবহার করার অভিযোগ করেন এ খাতসংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা।[১১]

জ্বালানি খাতের অবকাঠামোগত ঘাটতি

অভ্যন্তরীণ কয়লা ও গ্যাসের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিতে সক্ষম না হওয়ায় আমদানিনির্ভর জ্বালানি দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা করা হয়েছে।[১২] উল্লেখ্য, পেট্রোবাংলার বর্তমান মোট চাহিদার ৫২ দশমিক ৩ শতাংশের বেশি গ্যাস সরবরাহ করার সক্ষমতা নেই। সুপরিকল্পিত রূপরেখা প্রণয়ন না করেই মাতারবাড়ী এলএনজি বিদ্যুৎ প্রকল্পসহ ১১টি আমদানিনির্ভর এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছে।[১৩] বাংলাদেশে ৩০ হাজার মেগাওয়াট নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের সুযোগ থাকলেও এ-সংক্রান্ত অবকাঠামো প্রস্তুতে ঘাটতি রয়েছে। জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুৎ সরবরাহে সঞ্চালন লাইন প্রস্তুতকে পর্যাপ্ত গুরুত্ব প্রদান না করার ফলে উৎপাদিত বিদ্যুৎ লাইনে সঞ্চালন করতে সক্ষম হয়নি।[১৪]

জ্বালানি প্রকল্পের আর্থিক ব্যবস্থাপনা

প্রভাবশালী আইপিপিদের বিনিয়োগ প্রস্তাবে সরাসরি রাজি হওয়াসহ আনসলিসিটেড প্রকল্প গ্রহণ করেছে।[১৫] বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি) উন্মুক্ত ক্রয়-প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে না পারায় অর্থায়ন-সংক্রান্ত বৈদেশিক ঋণের চুক্তি সম্পাদন এবং বিদ্যুতের দাম নির্ধারণে

দর-কষাকষিসহ দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থ বিবেচনায় নিতে সক্ষম হয়নি। তা ছাড়া একই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকল্প বাস্তবায়ন, অর্থের উৎস সন্ধান এবং অর্থায়নসহ পুরো বিষয় সমন্বয় করায় সুদের হার ও শর্ত নির্ধারণে দর-কষাকষির সুযোগ ছিল না বলে সংশ্লিষ্ট অংশীজনরা জানান। ফলে উচ্চ সুদে বিদেশি ঋণ গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রতিষ্ঠানগুলো চীনের বিবিধ ব্যাংক থেকে নন-কনসেশনাল বা কঠিন শর্তে ঋণ নিয়েছে এবং সরকারের পক্ষ থেকে ঋণের গ্যারান্টি প্রদান করা হয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান ঋণের সুদ এবং ইকুইটির লাভও গ্রহণ করবে বলে সংশ্লিষ্ট তথ্যদাতারা জানান। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যাংক সুদের হার ৫-৬ শতাংশ নির্ধারণ এবং কাজ শেষ হওয়ার আগেই সুদ প্রদান করার শর্ত রয়েছে। অন্যদিকে বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান সঠিক সময়ে প্রকল্পের কাজ শেষ করতে ব্যর্থ হলেও বিপিডিবি কর্তৃক নামমাত্র ক্ষতিপূরণ আদায় করার সুযোগ রাখা হয়েছে। এ ছাড়া প্রকল্পের জন্য দুই বা ততোধিক সভ্রেইন গ্যারান্টির নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। যেমন দেশি-বিদেশি উৎপাদনকারীদের জন্য তিন-পাঁচ গুণ বেশি দামের নিশ্চয়তা, নিয়মিত বিদ্যুৎ ক্রয়ের শর্ত এবং বিদ্যুৎ ক্রয় না করলেও ক্যাপাসিটি চার্জ প্রদান, মোট বিনিয়োগের ১০ শতাংশের সমপরিমাণ অর্থের খুচরা যন্ত্রপাতি প্রতিবছর করমুক্ত আমদানির সুবিধা, প্রকল্পের জন্য জমি ক্রয়ে সরকারি রেজিস্ট্রেশন ফি মওকুফ করা ইত্যাদি সুযোগ রয়েছে।[১৬]

স্বচ্ছতার চ্যালেঞ্জ

কয়লা ও এলএনজিভিত্তিক প্রকল্প বাস্তবায়নে তথ্যের উন্মুক্ততা এবং স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ঘাটতি বিদ্যমান। গবেষণায় নির্বাচিত প্রকল্পগুলোর মধ্যে সব কয়টিই স্বপ্রণোদিতভাবে বা চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ করেনি (সারণি ৪ দেখুন)।

সারণি ৪ : গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত তিনটি প্রকল্পের স্বচ্ছতার চ্যালেঞ্জ

প্রকল্প তথ্য	বরিশাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র	বাঁশখালী এসএস বিদ্যুৎকেন্দ্র	মাতারবাড়ী এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্র
প্রকল্পের ডিপিপি ও ইআইএ প্রতিবেদন স্বপ্রণোদিত হয়ে কিংবা চাহিদা সাপেক্ষে প্রকাশ	X	X	প্রযোজ্য নয়
ঋণের হার, শর্ত, মুনাফা বণ্টন ও মুনাফার আয়কর সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ	X	X	প্রযোজ্য নয়
আর্থিক লেনদেনসহ নিরীক্ষা প্রতিবেদন এবং বাজেট সম্পর্কিত তথ্য উন্মুক্ত করা	X	X	প্রযোজ্য নয়
ভূমি ক্রয়/অধিগ্রহণে প্রকল্প সম্পর্কে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রদান	X	X	প্রযোজ্য নয়
চুক্তি ও ক্রয় প্রক্রিয়ার তথ্যাদি স্বপ্রণোদিত হয়ে কিংবা চাহিদা সাপেক্ষে প্রকাশ	X	X	প্রযোজ্য নয়
ওয়েবসাইটে প্রকল্পসংক্রান্ত তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ করা	X	X	X

(X-হয়নি; √-হয়েছে)

উল্লেখ্য, মাতারবাড়ী এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিপিজিসিবিএল) এবং মিতসুই কোম্পানির মধ্যে নন-বাইন্ডিং চুক্তি হলেও এখনো যৌথ কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধিত হয়নি। তাই পূর্ণাঙ্গ ডিপিপি প্রস্তুতসহ প্রকল্প বাস্তবায়নের কিছু কার্যক্রম শুরু হয়নি।

জবাবদিহির চ্যালেঞ্জ

তদারকি কার্যক্রমের ঘাটতি

পরিবেশ অধিদপ্তর মাঠপর্যায়ে বিদ্যুৎকেন্দ্রের দূষণ নির্গমন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশের ক্ষতি-সংক্রান্ত বিষয় নিয়মিত তদারকি করে না বলে সংশ্লিষ্ট তথ্যদাতারা জানান।[১৭] এ ছাড়া প্রকল্পের নামে সরকারি-বেসরকারি জমি দখল এবং সংশ্লিষ্ট স্থানীয় ভূমি অফিসসহ দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসগুলোর বিরুদ্ধে তাদের এখতিয়ার রয়েছে এমন বিষয়ের তদারকি না করার অভিযোগ রয়েছে।[১৮] অন্যদিকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা তদারকি ও রক্ষণাবেক্ষণে পরিবেশ অধিদপ্তর ও বন বিভাগের বিবিধ আপত্তি প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান অগ্রাহ্য করে বলে সংশ্লিষ্ট অংশীজনরা জানান।[১৯] প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়ে নির্মাণ কাজের দ্বারা সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতির যথাযথ তদারকি ব্যবস্থা ও পরিকল্পনা পরিবেশ অধিদপ্তরের নেই। এমনকি নদী ও খালে কয়লা প্রকল্পের বর্জ্য নিয়মিত নিক্ষেপ করলেও প্রকল্প কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।[২০]

নিরীক্ষায় ঘাটতি

বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর বার্ষিক নিরীক্ষার জন্য প্রতিবছর একই প্রতিষ্ঠান নিয়োগ দেওয়া হয় এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনগুলো নিয়মিত ওয়েবসাইটে হালনাগাদ করা হয় না। এ ছাড়া কোন কোন খাতে কীভাবে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় হয়েছে, নিরীক্ষায় এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে কোনো ব্যাখ্যা চাওয়া হয় না বলে সংশ্লিষ্ট তথ্যদাতারা জানান।

অভিযোগ গ্রহণ ও নিরসনব্যবস্থায় ঘাটতি

ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তিতে স্থানীয় দপ্তরগুলোর অনীহা রয়েছে। এ ছাড়া সহযোগিতা না করা এবং ইচ্ছাকৃত কালক্ষেপণসহ অভিযোগকারীদের হয়রানি করার অভিযোগও রয়েছে।[২১] স্থানীয় প্রশাসনের বিরুদ্ধে অভিযোগকারীদের ভীতি প্রদর্শন, চাপ প্রয়োগ ও হেনস্তা করা হয়।[২২] স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায় থেকে প্রকল্প কর্তৃপক্ষের দ্বারা সংঘটিত দুর্নীতি ও অনিয়মের পৃষ্ঠপোষকতার অভিযোগ রয়েছে। প্রভাবশালী ব্যক্তি কর্তৃক বিচার-প্রক্রিয়া প্রভাবিত করা হয়ে থাকে বলেও ভুক্তভোগীরা জানান।[২৩] জমি অধিগ্রহণে জমির মালিকদের হয়রানি ও মামলা প্রদান করা হলেও এমন অনিয়মের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না।[২৪] জাল দলিল তৈরি ও জালিয়াতির কারণে দুদক মামলা করলেও জাল দলিলের গ্রহীতাকে বাদ দিয়ে দলিলের সাক্ষীদের বিরুদ্ধে মামলা করার মাধ্যমে মূল অভিযুক্তদের অপরাধ থেকে ছাড় পাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিচারের আওতায় আনা হয় না বলে তথ্যদাতারা জানান।[২৫]

সারণি ৫ : প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়নে জবাবদিহির চ্যালেঞ্জ

প্রকল্প তথ্য	বরিশাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র	বাঁশখালী এসএস বিদ্যুৎকেন্দ্র	মাতারবাড়ী এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্র
পরিবেশগত ও সামাজিক সমীক্ষা সম্পাদন	√	√	X
বিদ্যুৎ ও জ্বালানি দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০-এর আওতায় পরিবেশের প্রতি ঝুঁকিপূর্ণ জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র অনুমোদন	√	√	প্রযোজ্য নয়
স্ট্যান্ডার্ড অ্যাগ্রিমেন্ট প্রসেস অনুসরণ করে চুক্তির মাধ্যমে প্রকল্প অনুমোদন	X	X	প্রযোজ্য নয়
সম্পূর্ণভাবে ডিপিপি প্রস্তুত করে প্রকল্প অনুমোদন	X	X	প্রযোজ্য নয়
পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৮ অনুযায়ী এবং উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে ক্রয়সহ বিবিধ চুক্তি সম্পাদন	X	X	প্রযোজ্য নয়
উন্মুক্ত পদ্ধতিতে টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা	X	X	প্রযোজ্য নয়
প্রকল্পের মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক কর ছাড়	√	√	প্রযোজ্য নয়
ইপিসি ঠিকাদারদের আয়কর, পরামর্শক কর, উৎপাদন ও ভ্যাট রেয়াত দেওয়া	√	√	প্রযোজ্য নয়
জ্বালানি আমদানিতে এনআরবি কর্তৃক ৫% থেকে ১৫% পর্যন্ত ভ্যাট ছাড়	√	√	প্রযোজ্য নয়
ট্রান্সফরমার, ক্যাপাসিটর, সুরক্ষা সরঞ্জাম ও যন্ত্রাংশ পিপিআর অনুযায়ী ক্রয়	X	X	প্রযোজ্য নয়
বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রকল্পের পক্ষে ঋণ পরিশোধের গ্যারান্টি প্রদান	√	√	প্রযোজ্য নয়

(X-হয়নি; √-হয়েছে)

বাঁশখালী এসএস বিদ্যুৎকেন্দ্র সময়মতো উৎপাদনে আসতে না পারায় সময় বর্ধিত করা হয়েছে।[২৬] এই বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণকালীন সরকারের কাছ থেকে ৩ হাজার ১৮৯ কোটি টাকা কর ও ভ্যাট রেয়াত বাবদ গ্রহণ করা হয়েছে।

অংশগ্রহণের চ্যালেঞ্জ

প্রকল্পের স্থান নির্বাচনে স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিদের মতামত গ্রহণ করা হয়নি। ক্ষেত্রবিশেষে নীতিনির্ধারকদের সাথে সভায় প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের বাদ দিয়ে শুধু অনৈতিক সুবিধাভোগীদের অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়েছে এবং প্রকল্প কর্তৃপক্ষের শিখিয়ে দেওয়া কথাই

সভায় উপস্থাপন করা হয়েছে। পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় (আইইই, ইআইএ ও এসআইএ) স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করায় ঘাটতি ছিল। প্রকল্পের ফলে পরিবেশগত বিপন্নতা ও পরিবেশের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে স্থানীয় জনগণের মতামত পরিবেশগত সমীক্ষায় গ্রহণ করা হয়নি। ক্ষতিপূরণ নির্ধারণে স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিসহ অন্যান্য অংশীজনের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা হয়নি বলে সংশ্লিষ্ট তথ্যদাতারা জানান। স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন, জীবিকা, প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থান নিশ্চিতে ঘাটতি রয়েছে।

অনিয়ম ও দুর্নীতি

প্রকল্প অনুমোদনে দুর্নীতি

জ্বালানি খাতের নীতিনির্ধারক এবং মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের যোগসাজশে যথাযথ বিশ্লেষণ না করে প্রভাবশালীদের স্বার্থে কয়লা ও এলএনজি প্রকল্প অনুমোদনের অভিযোগ রয়েছে।[২৭] প্রকল্প অনুমোদনের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিবসহ কর্মকর্তা নিয়োগ ও বদলিতে বিদেশি লবিস্টদের প্রভাব রয়েছে এবং যোগসাজশের মাধ্যমে সরকারি আমলাদের নিয়ন্ত্রণে রেখে ('ক্যাপচার') তাদের নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয় বলে এ খাতসংশ্লিষ্ট তথ্যদাতারা জানান। প্রকল্প অনুমোদনের ক্ষেত্রে স্ট্যান্ডার্ড অ্যাগ্রিমেন্ট প্রসেস অনুসরণ না করেই চুক্তির মাধ্যমে প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট অংশীজনরা তথ্য প্রদান করেন। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত, পাকিস্তানসহ চীন ও অস্ট্রেলিয়ায় নির্মিত কয়লাবিদ্যুৎ কেন্দ্রে উৎপাদিত প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের দাম বাংলাদেশি টাকায় ৩.৪৬-৫.১৫ পড়লেও গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পে বেশি মূল্যে বিদ্যুৎ ক্রয়ের সুযোগ রেখে প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।[২৮]

সারণি ৬ : পার্শ্ববর্তী দেশের তুলনায় নির্বাচিত প্রকল্পে বেশি মূল্যে বিদ্যুৎ ক্রয়ের সুযোগ

বিদ্যুৎকেন্দ্র	ইউনিটপ্রতি বিদ্যুতের দাম (টাকা)	পার্শ্ববর্তী দেশের তুলনায় অতিরিক্ত দাম (টাকা)	পার্শ্ববর্তী দেশের তুলনায় অতিরিক্ত দাম (শতাংশ)
বরিশাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র	৬.৬১	১.৪৬-৩.১৫	২২-৪৮
বাঁশখালী এসএস বিদ্যুৎকেন্দ্র	৬.৭৭	১.৬২-৩.৩১	২৪-৪৯

প্রতি টন কয়লার প্রাথমিক দাম ১২০ ডলার হিসাব করে বিদ্যুতের মূল্য নির্ধারণ করা হলেও উৎপাদন শুরুর পর প্রকল্প ব্যয়সহ জ্বালানি মূল্য, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের ওপর নির্ভর করে দাম বাড়ানোর সুযোগ রাখা হয়েছে। এ ছাড়া কয়লা পরিবহন ব্যয় বেশি পড়লে ইউনিটপ্রতি বিদ্যুতের দাম ২-৩ গুণ বেশি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।[২৯] এ ক্ষেত্রে প্রভাবশালী বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো (আইপিপি) সরাসরি জ্বালানি আমদানি করার সুযোগ প্রদানে সরকারের ওপর অনৈতিক চাপ প্রয়োগ করেছে। আইন পরিবর্তন করে রাষ্ট্রীয় জ্বালানি আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের ক্ষমতা রহিত করা হয়েছে বলে এ খাতসংশ্লিষ্ট তথ্যদাতারা জানান।[৩০] বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে সরাসরি জ্বালানি আমদানি করার সুযোগ দেওয়ায় রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগসাজশে জ্বালানির দাম ক্রয়মূল্যের চেয়ে অধিক দেখানোর সম্ভাবনা এবং অর্থ পাচারের ঝুঁকি রয়েছে।[৩১] ব্যক্তিমালিকানাধীন খাত থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ক্রয়ের কোনো

সীমারেখা/লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়নি।[৩২] এ ছাড়া কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে প্রতি মেগাওয়াটের জন্য নির্মাণ ব্যয় সরকারি প্রাক্কলন অনুযায়ী ৭-৮ কোটি টাকা হলেও বরিশাল প্রকল্পে **১৩ দশমিক ৭৫** কোটি টাকা এবং বাঁশখালীতে **১৬ দশমিক ৫** কোটি টাকা পর্যন্ত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। অতিরিক্ত টাকা সংশ্লিষ্টদের কমিশন হিসেবে গ্রহণের অভিযোগ করেন সংশ্লিষ্ট তথ্যদাতারা।

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পে ইআইএ সংশ্লিষ্ট অনিয়ম

বরিশাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র : প্রাথমিকভাবে ইআইএ ছাড়াই প্রকল্পের কাজ শুরু করা হয়[৩৩] এবং পরিবেশগত ছাড়পত্র ছাড়াই কাজ চলমান রাখা হয়। পরবর্তী সময়ে ইআইএ অনুমোদন দেওয়া হলেও দেশের দ্বিতীয় সুন্দরবন নামে পরিচিত টেংরাগিরি বনের পরিবেশগত বিপন্নতাকে গুরুত্বের সাথে সমীক্ষায় বিবেচনা করা হয়নি; বিশেষ করে আন্ধারমানিক ইলিশ অভয়ারণ্য ও গোরাপদ্মা সবুজ বেষ্টনীর ক্ষতির ঝুঁকি বিবেচনা করা হয়নি। অন্যদিকে প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ইআইএ অনুমোদনের শর্ত অমান্য করা হয়েছে। যেমন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পসংলগ্ন এলাকার স্লুইসগেট বন্ধ ও খাল ভরাট করা হয়েছে, প্রাকৃতিক বনভূমি জন্মানোর প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত করা হয়েছে এবং পরিবেশ নিরাপত্তাজনিত বিধিনিষেধ ১ কিমি হলেও তা অমান্য করে শুভ সন্ধ্যা সৈকত থেকে বালি উত্তোলন করা হয়েছে। অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের আপত্তি উপেক্ষা করা হয়েছে। যেমন অবৈধভাবে নদীর জায়গা ভরাট করায় জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন কর্তৃক জেলা প্রশাসন মারফত কাজ বন্ধের হুকুম সত্ত্বেও বিদ্যুৎকেন্দ্রের চিমনি নির্মাণ করা হয়েছে।[৩৪]

চিত্র ২ : বরিশাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র ও নিকটবর্তী প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন সব এলাকা

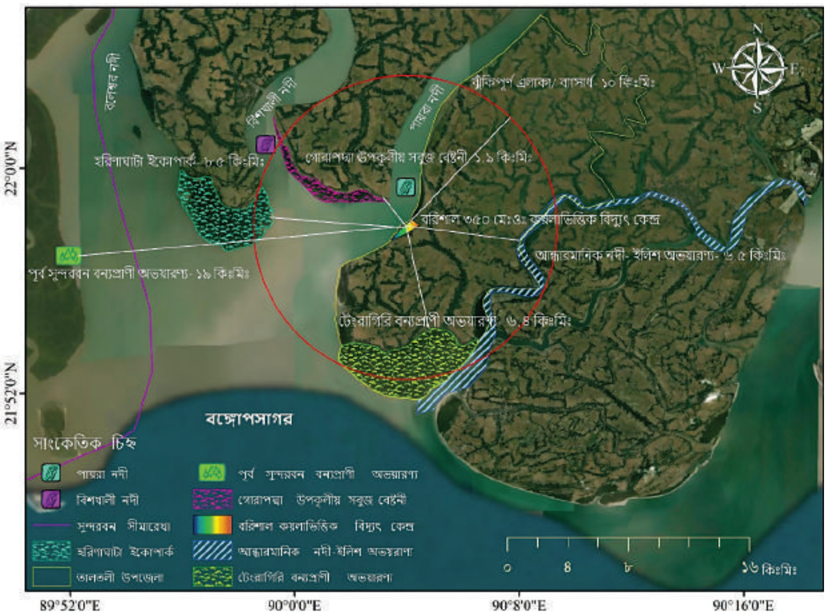

সূত্র : গবেষক কর্তৃক জিআইএস বিশ্লেষণ।

বাঁশখালী এসএস বিদ্যুৎকেন্দ্র : ত্রুটিপূর্ণ ইআইএ প্রতিবেদন দেওয়া হলেও পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে;[৩৫] বিশেষ করে পরিবেশ অধিদপ্তরের বিরুদ্ধে প্রভাবিত হয়ে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া ইআইএ প্রতিবেদন বারবার পরিবর্তন করা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট তথ্যদাতারা জানান। অন্যদিকে বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে গরম পানি সাগরে ফেললে জলজ জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি মোকাবিলার পদক্ষেপ সম্পর্কে ইআইএতে উল্লেখ নেই। বায়ুর গুণগত মান পরীক্ষার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়নি। এ ছাড়া ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় প্রকল্পের ফলে বায়ু, পানি, ছাই ও শব্দদূষণের প্রভাব সম্পর্কে ইআইএ প্রতিবেদনে সঠিক তথ্য প্রদান করা হয়নি। প্রকল্পের স্থাপনা নির্মাণে উপকূল এবং সমুদ্রতটের জায়গা ভরাট করা হয়েছে। জলকদর খালে মাটি ভরাট করায় আশপাশের এলাকায় নিয়মিত জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয় বলে স্থানীয় তথ্যদাতারা জানান। এ ছাড়া বন ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের জমি ব্যবহার করে প্রকল্প বাস্তবায়ন করায় পরিবেশের দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতির ঝুঁকি রয়েছে।[৩৬]

চিত্র ৩ : বাঁশখালী এসএস বিদ্যুৎকেন্দ্র ও নিকটবর্তী প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন সব এলাকা

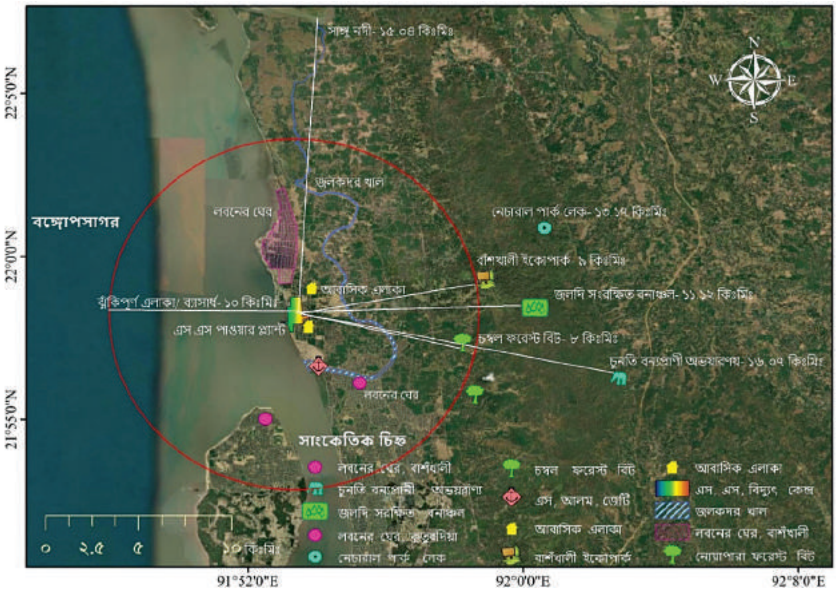

সূত্র: গবেষক কর্তৃক জিআইএস বিশ্লেষণ।

মাতারবাড়ী এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্র : ইআইএ সম্পাদন না করেই প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে। জলাধার ভরাট করে রাস্তা নির্মাণ ও পানি প্রবাহের প্রতিবন্ধকতা তৈরির ফলে জনবসতি এলাকায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হচ্ছে বলে স্থানীয়রা জানান। অন্যদিকে খাল, নদী ও জলাভূমি দখল করে রাস্তা নির্মাণ করলেও পরিবেশ অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। উল্লেখ্য, মাতারবাড়ীতে ১০ বর্গকিমি এলাকার মধ্যে ৮টি বৃহৎ বিদ্যুৎ

প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ভূমিরূপ ও ভূমি ব্যবহারের ব্যাপক পরিবর্তন হলেও সম্মিলিত পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা করা হয়নি।[৩৭] অন্যদিকে অধিগ্রহণকৃত জমি ভরাটের জন্য সমুদ্র থেকে অতিরিক্ত বালু উত্তোলনের ফলে মাতারবাড়ীর পশ্চিম পাশে বেড়িবাঁধের ১ কিমি এলাকায় ভাঙন দেখা দিয়েছে।[৩৮]

চিত্র ৪ : মাতারবাড়ী এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্র ও নিকটবর্তী প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন সব এলাকা

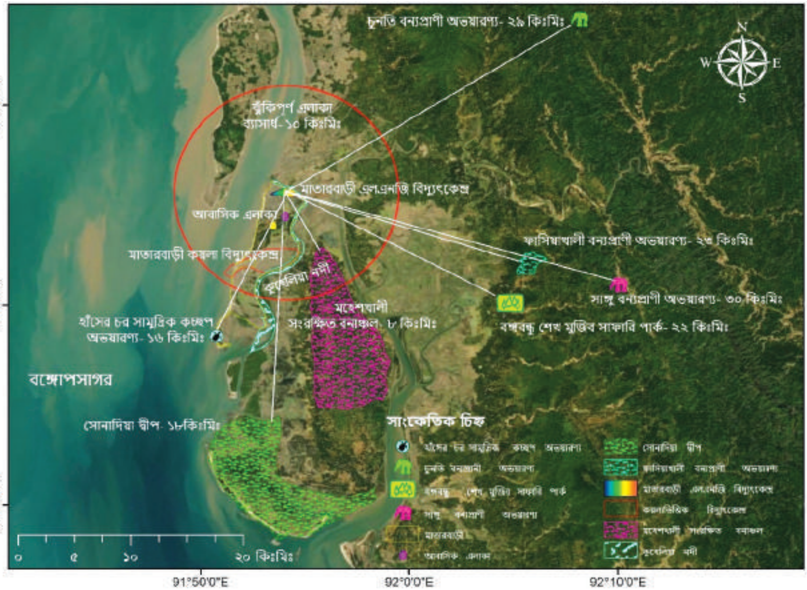

সূত্র : গবেষক কর্তৃক জিআইএস বিশ্লেষণ।

প্রয়োজনের অধিক জমি ক্রয় বা অধিগ্রহণ

প্রতি মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে নির্বাচিত কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য গড়ে শূন্য দশমিক ৬৯ একর এবং এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য শূন্য দশমিক ৬৫ একর জমি ক্রয় বা অধিগ্রহণ করা হয়েছে। পার্শ্ববর্তী দেশে নির্মিত কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে প্রতি মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে গড়ে শূন্য দশমিক ২৩ একর এবং এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য শূন্য দশমিক ০৫৩ একর জমি প্রয়োজন হয়।[৩৯] সেই হিসাবে গবেষণার আওতাভুক্ত বিদ্যুৎকেন্দ্রে মোট ৯৪২ একর অতিরিক্ত জমি ক্রয় বা অধিগ্রহণ করা হয়েছে।

সারণি ৭ : নির্বাচিত প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনের অধিক জমি ক্রয় বা অধিগ্রহণ

বিদ্যুৎকেন্দ্রের ধরন	বিদ্যুৎকেন্দ্র	উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	প্রয়োজনীয় জমি (একর)	ক্রয়/ অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)	অতিরিক্ত ক্রয়/ অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
কয়লাভিত্তিক	বরিশাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র	৩৫০	৮১	৩১০	২৩০
	বাঁশখালী এসএস বিদ্যুৎকেন্দ্র	১৩২০	৩০৪	৬৬০	৩৫৭
এলএনজিভিত্তিক	মাতারবাড়ী এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্র	৬৩০	৩৩	৩৮৮	৩৫৫
মোট		২২৭০	৪১৮	১৩৫৮	৯৪২

এ ছাড়া গবেষণার আওতাভুক্ত তিনটি বিদ্যুৎ প্রকল্পে শুধু ভূমি ক্রয় বা অধিগ্রহণ এবং ক্ষতিপূরণ প্রদানে মোট ৩৯০ কোটি ৪৯ লাখ টাকার দুর্নীতি হয়েছে (আংশিক প্রাক্কলনের জন্য দেখুন সারণি ৮)।

সারণি ৮ : ভূমি ক্রয় বা অধিগ্রহণ এবং ক্ষতিপূরণ প্রদানে দুর্নীতি

ভূমি ক্রয় বা অধিগ্রহণ এবং ক্ষতিপূরণ প্রদানে দুর্নীতির ক্ষেত্রগুলো	দুর্নীতির পরিমাণ (টাকা)*			অর্থের গ্রহীতা***
	বরিশাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র[৪০]	বাঁশখালী এসএস বিদ্যুৎকেন্দ্র[৪১]	মাতারবাড়ী এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্র	
ইজারাকৃত জমি ব্যবহারকারীদের ক্ষতিপূরণের অর্থ আত্মসাৎ	২ কোটি ২৯ লাখ	**	**	বিদ্যুৎকেন্দ্রের কর্মকর্তা -কর্মচারীদের একাংশ, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, ডরপ এনজিওকর্মী, ভূমি অধিগ্রহণ শাখার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশ এবং মধ্যস্বত্বভোগী
ইজারাকৃত জমি ব্যবহারকারীদের ক্ষতিপূরণের অর্থ থেকে কমিশন আদায়	৪৫ লাখ ৯০ হাজার	৫৫ কোটি	**	
ব্যক্তিগত জমি ক্রয় বা অধিগ্রহণ বাবদ মূল্য প্রদানে কমিশন আদায়	**	২০০ কোটি	৮২ কোটি ৫ লাখ	
ব্যক্তিগত জমির ক্ষতিপূরণের এককালীন অনুদানের টাকা আত্মসাৎ	**	**	৩৩ কোটি	
ব্যক্তিগত জমির ক্ষতিপূরণের এককালীন অনুদানের টাকা প্রদানে কমিশন আদায়	**	**	৪ কোটি ৪০ লাখ	
ব্যক্তিমালিকানাধীন জমি জবরদখল এবং অর্থ প্রদান না করা	২ কোটি ৪১ লাখ	**	**	
খাসজমির জাল দলিল তৈরি করে তা বিক্রয় বাবদ অর্থ গ্রহণ	১০ কোটি ৭৫ লাখ	**	**	

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন...

...পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পরের অংশ

ভূমি ক্রয় বা অধিগ্রহণ এবং ক্ষতিপূরণ প্রদানে দুর্নীতির ক্ষেত্রগুলো	দুর্নীতির পরিমাণ (টাকা)*			অর্থের গ্রহীতা***
	বরিশাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র[৪০]	বাঁশখালী এসএস বিদ্যুৎকেন্দ্র[৪১]	মাতারবাড়ী এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্র	
মোট টাকা	১৫ কোটি ৫৯ লাখ ৯০ হাজার	২৫৫ কোটি	১১৯ কোটি ৪৫ লাখ	

* দুর্নীতির কারণে ক্ষতিগ্রস্তের আংশিক প্রাক্কলন পূর্ণ সংখ্যায় উপস্থাপন করা হয়েছে।
** সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি।
*** প্রদত্ত তথ্য সব পদ, কর্মী ও সব সময়ের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য নয়।

ভূমি ক্রয় বা অধিগ্রহণে দুর্নীতি

বরিশাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র : সরকারের অগ্রাধিকার প্রকল্প বলে আইসোটেক কর্তৃক প্রশাসনের সহায়তায় জমির মালিকদের জোরপূর্বক উচ্ছেদ ও ভূমি দখল করা হয়েছে। ক্রয়কৃত জমির চেয়ে বেশি জায়গা দখল এবং ক্ষেত্রবিশেষে জমি ক্রয় না করেই জোরপূর্বক দখল করা হয়েছে। বাঁধে বসবাসকারী জেলে পরিবারের ওপর হামলা, মামলা, ভয়ভীতি প্রদর্শনসহ জোরপূর্বক উচ্ছেদ করা হয়েছে।[৪২] দলিল ও ভুয়া মালিক তৈরি করে খাস ও ব্যক্তিমালিকানাধীন জমি হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে।[৪৩] বিশটি রাখাইন পরিবারের ৭০ একর কৃষিজমি ও উপকূলীয় বনসহ নদী ও খাল দখল করা হয়েছে।

বাঁশখালী এসএস বিদ্যুৎকেন্দ্র : বিদ্যুৎকেন্দ্রটি নির্মাণে ২ কিমি সমুদ্রতট দখল করে লবণচাষিদের উচ্ছেদ করা হয়েছে।[৪৪] খাসজমিসহ স্থানীয়দের প্রায় ১০০ একর জমি জোরপূর্বক দখলের অভিযোগ করা হয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে জমির মালিকদের নামমাত্র মূল্য দিয়ে জমি রেজিস্ট্রি করে নেওয়া হয়েছে বলেও ভুক্তভোগীরা অভিযোগ করেন। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি কম মূল্যে স্থানীয়দের থেকে জমি ক্রয় করে বেশি মূল্যে এস আলম কর্তৃপক্ষের কাছে বিক্রি করেছে বলে তথ্যদাতারা জানান।[৪৫]

মাতারবাড়ী এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্র : বিদ্যুৎকেন্দ্রটি নির্মাণে স্থানীয়দের থেকে জোরপূর্বক ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তদের জমির মূল্য পেতে ২০-৩০ শতাংশ পর্যন্ত জেলা প্রশাসনের ভূমি অধিগ্রহণ শাখার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রদানে বাধ্য করা হয়েছে।[৪৬] লবণঘেরকে নাল জমি দেখিয়ে কম মূল্যে জমি ক্রয় করারও অভিযোগ রয়েছে।

ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদানে অনিয়ম

বরিশাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র : ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদানে বিবিধ অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় ভুয়া আপত্তি ও মামলা দায়ের করে জমির প্রকৃত মালিকদের ক্ষতিপূরণ পেতে বাধার সৃষ্টি করা হয়েছে। এ ছাড়া প্রশাসনের সহায়তায় জমির মালিকদের চাপে ফেলে বাজারমূল্যের চেয়ে কম মূল্যে আইসোটেকের কাছে জমি বিক্রি করতে বাধ্য করাসহ মূল্য পরিশোধে ইচ্ছাকৃতভাবে কালক্ষেপণ করা হয়েছে বলে তথ্যদাতারা অভিযোগ করেন।[৪৭] জমির দাম ও ক্ষতিপূরণ প্রদানে আইসোটেকের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারীদের কমিশন আদায়ের অভিযোগ রয়েছে।[৪৮]

বাঁশখালী এসএস বিদ্যুৎকেন্দ্র : প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে স্থানীয়দের চাপে ফেলে ও ভয়ভীতি প্রদর্শন করে জমি বিক্রিতে বাধ্য করা এবং নামমাত্র মূল্যে তা ক্রয় করার বিষয়ে স্থানীয় ভুক্তভোগীরা অভিযোগ করেন।[৪৯]

মাতারবাড়ী এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্র : ক্ষতিপূরণ বাবদ এককালীন অনুদান প্রদানে 'ডরপ' এনজিওর কর্মীদের একাংশ ১০-২০ শতাংশ কমিশন আদায় করেছেন। তারা ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিক এবং শ্রমিকদের মিথ্যা অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর করিয়ে ক্ষতিপূরণের অর্থ আত্মসাৎ করেছেন বলে স্থানীয় ভুক্তভোগীরা জানান।[৫০] এ ছাড়া দালাল ছাড়া ক্ষতিপূরণ না দেওয়া এবং ক্ষতিপূরণ প্রদানে দীর্ঘসূত্রতার বিষয় জানান ভুক্তভোগীরা।[৫১]

ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে অনিয়ম

বরিশাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র : প্রকল্পে কাজের সুযোগ সিন্ডিকেটের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা হয় বলে স্থানীয় তথ্যদাতারা জানান। এ ছাড়া স্থানীয়দের কাজ প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্তদের বিরুদ্ধে নিয়োগ-বাণিজ্যের অভিযোগও রয়েছে। স্থানীয় যাদের চাকরি দেওয়া হয়, তাদের সাথে বেতনবৈষম্য করা হয় বলে স্থানীয় তথ্যদাতারা অভিযোগ করেন।

বাঁশখালী এসএস বিদ্যুৎকেন্দ্র : প্রকল্পে কাজের সুযোগ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি নিয়ন্ত্রণ করেন এবং শ্রমিকদের থেকে ৩০-৫০ টাকা/ঘণ্টা কমিশন আদায় করেন বলে অভিযোগ রয়েছে।[৫২] প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্তদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়নি বলে স্থানীয়রা তথ্য প্রদান করেন। স্থানীয় শ্রমিকদের কম বেতন বা ক্ষেত্রবিশেষে বেতন না দিয়েই কাজ থেকে অব্যাহতি প্রদানের অভিযোগ রয়েছে।

মাতারবাড়ী এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্র : জমি থেকে উচ্ছেদ করা হলেও প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্তদের (লবণচাষি ও ভূমিমালিক) চাকরি ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়নি বলে স্থানীয় তথ্যদাতারা অভিযোগ করেন।

ক্ষতিগ্রস্তদের হয়রানিসহ মানবাধিকার লঙ্ঘন

বরিশাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র : আইসোটেক কর্তৃক প্রশাসনের সহায়তায় জমির মালিকদের নামে বিভিন্ন হয়রানিমূলক মামলা দেওয়ার অভিযোগ করেন ভুক্তভোগীরা।[৫৩] জেলা প্রশাসন ও পুলিশের সহায়তায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের জমিতে বসবাসকারী ইজারাভোগী জেলেদের ভয়ভীতি প্রদর্শন, ঘরবাড়ি ভাঙচুর ও উচ্ছেদ করা হয়েছে বলে তথ্যদাতারা জানান।

বাঁশখালী এসএস বিদ্যুৎকেন্দ্র: কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্রবিরোধী আন্দোলনসহ প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্তদের কর্মসংস্থান, ভালো কর্ম পরিবেশ প্রদান এবং অন্যায্য ছাঁটাই বন্ধের দাবিসংবলিত আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে।[৫৪] এ ছাড়া আন্দোলনে জড়িত স্থানীয় নেতৃস্থানীয়দের গ্রেপ্তার, ক্রসফায়ারের হুমকি, মামলা ও গ্রেপ্তার করে কয়লাবিদ্যুৎ কেন্দ্রবিরোধী আন্দোলন বন্ধ করার অভিযোগ রয়েছে।

মাতারবাড়ী এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্র : এলাকার প্রভাবশালী কর্তৃক হুমকি ও ভয়ভীতি প্রদর্শন করে ক্ষতিগ্রস্তদের অধিকার আদায়ের আন্দোলন বাধাগ্রস্ত করা হয়েছে বলে স্থানীয়রা জানান।[৫৫]

প্রভাবশালী রাজনীতিক ও আমলাদের স্বার্থরক্ষায় অনিয়ম

বরিশাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র : স্থানীয় রাজনীতিবিদ কর্তৃক অনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে প্রকল্পে শ্রমিক নিয়োগসহ কাঁচামাল (প্রকল্পে শ্রমিক নিয়োগ, ইট, বালি, সিমেন্ট, রড) সরবরাহের ঠিকাদারি গ্রহণের অভিযোগ রয়েছে।[৫৬] এ ছাড়া খাসজমির জাল দলিল তৈরি ও কোম্পানির কাছে বিক্রয়ে সরকারি কর্মচারী ও আমলাদের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ রয়েছে।

বাঁশখালী এসএস বিদ্যুৎকেন্দ্র : কয়লা প্রকল্পবিরোধী আন্দোলন বন্ধে স্থানীয় একজন প্রভাবশালী জনপ্রতিনিধিকে অনৈতিকভাবে বিবিধ সুবিধা (যেমন প্রকল্প এলাকায় খাবার ক্যানটিন পরিচালনা, তেল, ইট, বালি, সিমেন্ট, রড ও শ্রমিক সরবরাহসংক্রান্ত ঠিকাদারি) প্রদানের অভিযোগ রয়েছে।[৫৭]

মাতারবাড়ী এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্র : চর ও খাসজমির জাল দলিল তৈরি এবং এসব জমিকে মৎস্য ও চিংড়িঘের দেখিয়ে তা কোম্পানির কাছে চড়া দামে বিক্রির সাথে সরকারি কর্মচারী ও আমলাদের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ রয়েছে।[৫৮]

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

সার্বিকভাবে জ্বালানি খাতের অবকাঠামো উন্নয়নে দাতানির্ভর নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারী কর্তৃক বাংলাদেশের জ্বালানি খাতের পলিসি ক্যাপচার (দেখুন সারণি ৯ : জ্বালানি খাতের পলিসি ক্যাপচার প্রক্রিয়া) করা হয়েছে। বাংলাদেশে কয়লা ও এলএনজি বিদ্যুৎ প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়নে দেশি-বিদেশি সংস্থা ও বিনিয়োগকারী, রাজনীতিবিদ, সরকারি কর্মকর্তা, প্রভাবশালী ব্যবসায়ী, মধ্যস্বত্বভোগী এবং লবিস্টরা পলিসি ক্যাপচারের সাথে জড়িত বলে গবেষণায় উঠে এসেছে। মূলত নীতিনির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং নীতি, আইন ও বিধি ক্যাপচারের মাধ্যমে জ্বালানি খাতের পলিসি ক্যাপচার হয়েছে।

খসড়া টেন্ডার প্রস্তুত, শর্তাদি নির্ধারণ, দরপত্র মূল্যায়ন এবং প্রত্যাশী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ রক্ষাকারী সরকারি কর্মকর্তাদের নানাবিধ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে আয়ত্ত করা হয়েছে। প্রভাবশালী রাজনৈতিক কর্তৃক অ্যাজেন্ডা নির্ধারণ এবং ক্রয়, কার্যাদেশসহ প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সাথে যোগসাজশে সরকারি অভ্যন্তরীণ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করায় প্রভাবশালী ব্যবসায়ী গোষ্ঠী কর্তৃক একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপন করা হয়েছে। এ ছাড়া, বিদ্যুৎ চাহিদার অতিরিক্ত প্রাক্কলন এবং উদ্দেশ্য পূরণে নতুন নীতি ও আইন (দ্রুত বিদ্যুৎ সরবরাহ আইন) প্রণয়ন করা হয় এবং এর মেয়াদ দফায় দফায় বৃদ্ধি করা হয়েছে। সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণে আইন ও নীতি (পিএসএমপি, আইইপিএমপি, পরিবেশ আইন, ক্রয় আইন ইত্যাদি) কৌশলে আয়ত্ত এবং সুবিধাজনক ধারা সংযোজন ও সংশোধন করার মাধ্যমে বিভিন্ন সুবিধাসহ কার্যাদেশ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। কর, ভ্যাট রেয়াতসহ ঋণ গ্রহণে সরকারি গ্যারান্টির নিশ্চয়তা আদায় করা হয়েছে। এমনকি, বিদ্যুৎ উৎপাদন না করেই ক্যাপাসিটি চার্জ বাবদ অনৈতিকভাবে অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে।

সারণি ৯ : জ্বালানি খাতের পলিসি ক্যাপচার

দেশি-বিদেশি সংস্থা ও বিনিয়োগকারী, রাজনীতিক, সরকারি কর্মকর্তা, প্রভাবশালী ব্যবসায়ী, মধ্যস্বত্বভোগী এবং লবিস্ট

নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ

- টেন্ডার প্রস্তুত, শর্ত নির্ধারণ, দরপত্র মূল্যায়ন এবং প্রত্যাশী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ রক্ষাকারী সরকারি কর্মকর্তাদের নানাবিধ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে প্রভাবিত করা
- প্রভাশালী রাজনৈতিক কর্তৃক অ্যাজেন্ডা নির্ধারণ
- ক্রয় ও কার্যাদেশসহ প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রাধিকার নির্ধারণ
- মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তার যোগসাজশে অভ্যন্তরীণ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ

নীতি, আইন ও বিধি

- চাহিদার অতিরিক্ত বিদ্যুৎ প্রাক্কলন এবং উদ্দেশ্য পূরণে নতুন নীতি ও আইন (দ্রুত বিদ্যুৎ সরবরাহ আইন) প্রণয়ন
- সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণে আইন ও নীতি (পিএসএমপি, পরিবেশ আইন, ক্রয় আইন, দ্রুত বিদ্যুৎ সরবরাহ আইন ইত্যাদি) কৌশলে আয়ত্ত এবং সুবিধাজনক ধারা সংযোজন ও সংশোধন

- প্রভাবশালী ব্যবসায়ী গোষ্ঠী কর্তৃক একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপন
- দ্রুত বিদ্যুৎ সরবরাহ আইনের মেয়াদ দফায় দফায় বৃদ্ধি
- বিভিন্ন সুবিধাসহ কার্যাদেশ প্রাপ্তি
- কর ও ভ্যাট রেয়াতসহ ঋণ গ্রহণে সরকারি গ্যারান্টির নিশ্চয়তা আদায়
- বিদ্যুৎ উৎপাদন না করেই ক্যাপাসিটি চার্জ বাবদ অনৈতিকভাবে অর্থ গ্রহণ

দুর্বল আইনের সুযোগ নিয়ে চীন, জাপানসহ উন্নত দেশের কয়লাভিত্তিক পুরোনো বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রযুক্তি বাংলাদেশে রপ্তানি করার মাধ্যমে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। একদিকে যেমন নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রসারে সরকারের উল্লেখযোগ্য কোনো পদক্ষেপ নেই, অন্যদিকে জীবাশ্ম জ্বালানি প্রকল্পে অধিক দুর্নীতি এবং দ্রুত মুনাফা তুলে নেওয়ার সুযোগ থাকায় প্রয়োজন না থাকলেও কয়লা এবং এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। প্রভাবশালী মহলকে অনৈতিক সুবিধা প্রদানে প্রকল্প অনুমোদন, বিবিধ চুক্তি সম্পাদন, ইপিসি ঠিকাদার নিয়োগ, বিদ্যুতের দাম নির্ধারণ এবং বিদ্যুৎ ক্রয়ে প্রতিযোগিতাভিত্তিক পদ্ধতি ব্যবহার না করে বিশেষ বিধানের আওতায় চুক্তি ও কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে। কয়লা ও এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নে পরিবেশ সংরক্ষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। পরিবেশ আইন লঙ্ঘন করে এবং নির্ভুল পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব সমীক্ষা ছাড়াই প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ত্রুটিপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে পরিবেশদূষণ এবং সংকটাপন্ন এলাকায় ঝুঁকি বৃদ্ধি পেলেও পরিবেশ অধিদপ্তর বিদ্যমান আইন ও বিধি কার্যকরভাবে প্রয়োগে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে বন, নদী, খাসজমিসহ প্রাকৃতিক সম্পদের দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি সাধিত হচ্ছে। এ ছাড়া প্রকল্প বাস্তবায়নে নানাবিধ অনিয়ম ও দুর্নীতি এবং মানবাধিকার লঙ্ঘিত হলেও বিচার না হওয়ায় অপরাধীদের এক ধরনের দায়মুক্তি প্রদান করা হচ্ছে, যা এই খাতসংশ্লিষ্ট প্রভাবশালীদের অনিয়ম ও দুর্নীতিকে আরও উৎসাহিত করছে।

সুপারিশ

১. জ্বালানি খাতে স্বার্থের দ্বন্দ্ব সংশ্লিষ্ট দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিদের বাদ দিয়ে একটি অন্তর্ভুক্তি ও অংশগ্রহণমূলক উপায়ে আইইপিএমপি প্রণয়ন করতে হবে এবং প্রস্তাবিত আইইপিএমপিতে একটি সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপসহ কৌশলগতভাবে নবায়নযোগ্য জ্বালানিকে গুরুত্ব দিতে হবে।

২. বিদ্যুৎ ও জ্বালানি দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ বাতিল করতে হবে। ২০২২ সালের পরে নতুন কোনো প্রকার জীবাশ্ম জ্বালানিনির্ভর প্রকল্প অনুমোদন ও অর্থায়ন না করার ঘোষণা দিতে হবে।

৪. জ্বালানি প্রকল্প অনুমোদন, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদন, ঋণের শর্ত নির্ধারণে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিসহ শুদ্ধাচার নিশ্চিত করতে হবে এবং এ-সংক্রান্ত সব নথি প্রকাশ করতে হবে।

৫. জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশের ক্ষতি রোধ এবং জীবন-জীবিকা ও প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায় চলমান ঝুঁকিপূর্ণ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো স্থগিত করে আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য ও নিরপেক্ষ কৌশলগত, সামাজিক ও পরিবেশগত সমীক্ষা সম্পাদন সাপেক্ষে অগ্রসর হতে হবে।

৬. আইএনডিসির অঙ্গীকার বাস্তবায়নে পরিকল্পনাধীন কয়লা ও এলএনজি বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য অধিগ্রহণকৃত জমিতে সোলারসহ নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে।

৭. ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া, ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ ও বিতরণ এবং ক্রয়সংক্রান্ত কার্যক্রমে শুদ্ধাচার নিশ্চিত করতে হবে।

৮. প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে সংঘটিত দুর্নীতির তদন্তপূর্বক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

পরিশিষ্ট ১

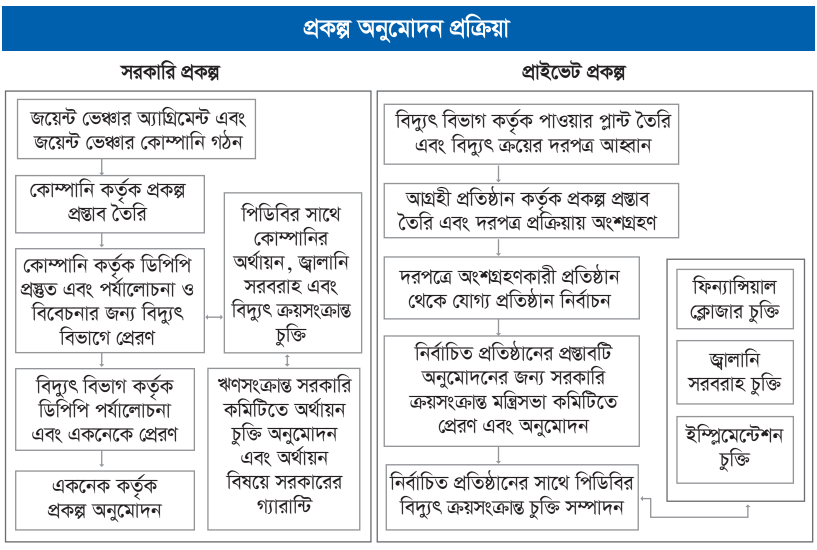

তথ্যসূত্র

১ অনুচ্ছেদ ১৮ (ক), পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, আইন বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়, বিস্তারিত দেখুন: http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details-957.html, (১৮ এপ্রিল ২০২২)।

2 বাংলাদেশে দশটি কয়লাভিত্তিক প্রকল্প বন্ধ করার সিদ্ধান্ত, বিবিসি বাংলা, বিস্তারিত দেখুন: https://www.bbc.com/bengali/news-57630991, (২৭ জুন ২০২১)।

৩ বিদ্যুৎ খাতে ব্যয়ের বোঝা বাড়াচ্ছে ক্যাপাসিটি চার্জ, বিডি নিউজ টোয়েন্টি ফোর, বিস্তারিত দেখুন: https://bangla.bdnews24.com/economy/article2024498.bdnews, (২৩ মার্চ ২০২২)।

৪ তথ্যদাতা, একজন গবেষক ও অধ্যাপক, ২৭ জুলাই ২০২১।

৫ তথ্যদাতা, একজন অধ্যাপক, ২৯ জুলাই ২০২১।

৬ তথ্যদাতা, একজন অধ্যাপক, ২৯ জুলাই ২০২১।

৭ ২০৪১-এর মধ্যে ৬০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুতের মহাপরিকল্পনা প্রধানমন্ত্রীর, বাংলা নিউজ টোয়েন্টিফোর, বিস্তারিত দেখুন : https://www.banglanews24.com/power-fuel/news/bd/468702.details, (২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২)।

৮ কয়লাখনি উত্তরে, বিদ্যুৎকেন্দ্র দক্ষিণে, প্রথম আলো, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://bit.ly/3L9Yfep

৯ দাম বাড়ল বিদ্যুতের : কতটা যৌক্তিক, অন্য দিগন্ত, বিস্তারিত দেখুন: https://www.onnoekdiganta.com/article/detail/7379, (১০ মার্চ ২০২২)।

১০ প্যারিস জলবায়ু সম্মেলন ও বাংলাদেশ, প্রথম আলো, বিস্তারিত দেখুন : https://bit.ly/3slIXfG, (১৯ এপ্রিল ২০২২)।

১১ তথ্যদাতা, একজন গবেষক, ২৭ জুলাই ২০২১।

১২ তথ্যদাতা, একজন অধ্যাপক, ২৭ জুলাই ২০২১।

১৩ তথ্যদাতা, একজন গবেষক, ২৯ জুলাই ২০২১।

১৪ তথ্যদাতা, একজন অধ্যাপক, ৮ আগস্ট ২০২১।

১৫ তথ্যদাতা, একজন গবেষক, ২৭ জুলাই ২০২১।

১৬ তথ্যদাতা, একজন গবেষক, ২৭ জুলাই ২০২১।

১৭ তথ্যদাতা, পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১।

১৮ তথ্যদাতা, একজন স্থানীয় ভুক্তভোগী, ২ অক্টোবর ২০২১।

১৯ তথ্যদাতা, পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, ৩ অক্টোবর ২০২১।

২০ তথ্যদাতা, একজন সাংবাদিক, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২১।

২১ তথ্যদাতা, একজন স্থানীয় ভুক্তভোগী, ২ অক্টোবর ২০২১।

২২ তথ্যদাতা, একজন স্থানীয় ভুক্তভোগী, ২ অক্টোবর ২০২১।

২৩ তথ্যদাতা, একজন স্থানীয় ভুক্তভোগী, ১১ অক্টোবর ২০২১।

২৪ তথ্যদাতা, একজন স্থানীয় ভুক্তভোগী, ১১ অক্টোবর ২০২১।

২৫ তথ্যদাতা, একজন স্থানীয়, ১২ অক্টোবর ২০২১।

২৬ 1224MW power plant at Banskhali: S Alam Group pays Tk 2.0b as penalty for delay, The Financial Express, বিস্তারিত দেখুন : https://thefinancialexpress.com.bd/public/trade/1224mw-power-plant-at-banskhali-s-alam-group-pays-tk-20b-as-penalty-for-delay-1594610600, (১৬ নভেম্বর ২০২১)।

২৭ তথ্যদাতা, একজন সাংবাদিক ও অধ্যাপক, ১২ আগস্ট ২০২১।

[২৮] তথ্যদাতা, একজন সাংবাদিক, ১২ আগস্ট ২০২১।

[২৯] তথ্যদাতা, একজন অধ্যাপক, ৩১ জুলাই ২০২১।

[৩০] তথ্যদাতা, একজন গবেষক, ২৭ জুলাই ২০২১।

[৩১] তথ্যদাতা, একজন অধ্যাপক, ৩১ জুলাই ২০২১।

[৩২] তথ্যদাতা, একজন গবেষক, ২৯ জুলাই ২০২১।

[৩৩] Power plant near reserve forest evokes concern, The Financial Express, বিস্তারিত দেখুন : https://today.thefinancialexpress.com.bd/last-page/power-plant-near-reserve-forest-evokes-concern-1525715574 (২৪ আগস্ট ২০২১)।

[৩৪] প্রতিবেদন, 'বরগুনা জেলার নদ-নদী পরিদর্শন ও জেলা নদী রক্ষা বিষয়ে দিক-নির্দেশনা প্রসঙ্গে', চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, ২৪ জানুয়ারি ২০২০।

[৩৫] প্রতিবেদন, Assessment of the Banskhali S. Alam coal power (SS Power I) project EIA. CREA, BELA and BWGED, প্রকাশকাল: ০৬.২০২১, বিস্তারিত দেখুন- https://energyandcleanair.org/major-flaws-in-banskhali-eia/, (১৯ এপ্রিল ২০২২)।

[৩৬] Banshkhali Coal Power Plant Propaganda and Reality, The Daily Star, বিস্তারিত দেখুন : https://www.thedailystar.net/op-ed/politics/banshkhali-coal-power-plant-propaganda-and-reality-1208137, (২৮ নভেম্বর ২০২১)।

[৩৭] মাতারবাড়ীতে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র : হুমকিতে পরিবেশ, দ্য ডেইলি স্টার, বিস্তারিত দেখুন- https://www.thedailystar.net/bangla/node/284531, (১৯ এপ্রিল ২০২২)।

[৩৮] তথ্যদাতা, একজন স্থানীয় ভুক্তভোগী, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২১।

[৩৯] Review of land requirement for thermal power stations, Central Electricity Authority, New Delhi-110066, বিস্তারিত দেখুন- https://cea.nic.in/wp-content/uploads/2020/04/land_requirement.pdf, (১৭ এপ্রিল ২০২২)।

[৪০] তথ্যদাতা, একজন স্থানীয় ভুক্তভোগী, ১১ অক্টোবর, ২০২১; ফোকাস দলীয় আলোচনা, স্থানীয় জনসাধারণ, ১১ অক্টোবর ২০২১।

[৪১] তথ্যদাতা, স্থানীয় জনসাধারণ, ১১ অক্টোবর ২০২১; লাভের মধু কার পেটে, সমকাল, বিস্তারিত দেখুন: https://samakal.com/index.php/todays-print-edition/tp-last-page/article/210495019/, (৮ মে ২০২২)।

[৪২] তথ্যদাতা, স্থানীয় ভুক্তভোগী, ১২ আগস্ট ২০২১।

[৪৩] তথ্যদাতা, একজন স্থানীয় রাজনীতিবিদ, ১২ অক্টোবর ২০২১।

[৪৪] তথ্যদাতা, একজন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও সাংবাদিক, ১ অক্টোবর ২০২১।

[৪৫] তথ্যদাতা, একজন স্থানীয় প্রতিনিধি ও সাংবাদিক, ২ অক্টোবর ২০২১।

[৪৬] তথ্যদাতা, দুজন স্থানীয় ভুক্তভোগী, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২১।

[৪৭] তথ্যদাতা, একজন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, ১২ অক্টোবর ২০২১।

[৪৮] তথ্যদাতা, একজন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, ১১ অক্টোবর ২০২১।

[৪৯] তথ্যদাতা, একজন স্থানীয় ভুক্তভোগী এবং একজন সাংবাদিক, ২ অক্টোবর ২০২১।

[৫০] তথ্যদাতা, একজন স্থানীয় ভুক্তভোগী, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২১।

[৫১] তথ্যদাতা, একজন স্থানীয় ভুক্তভোগী, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২১।

[৫২] তথ্যদাতা, একজন সাংবাদিক, ২ অক্টোবর ২০২১।

[৫৩] তদন্ত কমিটির সামনেই একজনকে মারধর, প্রথম আলো, বিস্তারিত দেখুন : তদন্ত কমিটির সামনেই একজনকে মারধর (prothomalo.com), (২৪ আগস্ট ২০২১)।

[৫৪] Banshkhali 1320 MW (SSPL) Coal Power Plant, BWGED, বিস্তারিত দেখুন- https://bwged.blogspot.com/p/banshkhali-coal-power-plant-s-alam.html, (১৮ এপ্রিল ২০২২)।

[৫৫] তথ্যদাতা, একজন স্থানীয় ভুক্তভোগী, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২১।

[৫৬] তথ্যদাতা, একজন ভুক্তভোগী, ১১ অক্টোবর ২০২১।

[৫৭] তথ্যদাতা, একজন সাংবাদিক, ২৯ অক্টোবর ২০২১।

[৫৮] তথ্যদাতা, একজন সাংবাদিক, ২৯ অক্টোবর ২০২১।

পরিবেশ অধিদপ্তরে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়*

মো. নেওয়াজুল মওলা

প্রেক্ষাপট

জাতিসংঘ পরিবেশ সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বে প্রতিবছর মানুষের মোট মৃত্যুর মধ্যে প্রায় এক-চতুর্থাংশের (১২ দশমিক ৬ মিলিয়ন) মৃত্যু হয় পরিবেশগত বিপর্যয়জনিত কারণে।[১] এনভায়রনমেন্টাল পারফরম্যান্স (ইপি) ইনডেক্স, ২০২০ অনুযায়ী, পরিবেশদূষণ রোধে পিছিয়ে থাকা দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম একটি দেশ এবং ১৮০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৬২তম।[২] বায়ুদূষণের বিভিন্ন উপাদানের বার্ষিক গড় উপস্থিতির হিসাবে দূষণের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান শীর্ষে; দূষিত রাজধানীর তালিকায় ঢাকার অবস্থান দ্বিতীয়।[৩] বায়ুদূষণজনিত কারণে এক দশকে বাংলাদেশে প্রতিবছর গড়ে প্রায় ৩১ হাজার ৩০০ মানুষের মৃত্যু হয়েছে।[৪] 'বাংলাদেশ পরিবেশ সমীক্ষা-২০১৭' অনুযায়ী, বাংলাদেশে পরিবেশদূষণজনিত কারণে প্রতিবছর জিডিপির ২ দশমিক ৭ শতাংশ ক্ষতি হয়।[৫] এ ছাড়া পোশাক উৎপাদনকারী কারখানাগুলো থেকে প্রতি এক টন কাপড় উৎপাদনের বিপরীতে ২০০ টন বর্জ্য পানি নির্গমণ হয়। বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি মাত্রার বায়ুদূষণের উৎস ইটভাটা (৩৮ শতাংশ), পরিবহন (১৯ শতাংশ) এবং রাস্তার ধূলিকণা (১৮ শতাংশ)।

পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন বাংলাদেশের সংবিধানের মূলনীতির অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।[৬] পরিবেশ উন্নয়ন, দূষণ নিয়ন্ত্রণ, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলাসহ পরিবেশসংক্রান্ত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে বাংলাদেশ সরকারের মুখ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে পরিবেশ অধিদপ্তর। এটি জাতীয় পরিবেশনীতি ২০১৮সহ পরিবেশ আইন ও সংশ্লিষ্ট জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চুক্তি বাস্তবায়নেও সরকারের ফোকাল প্রতিষ্ঠান হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত।[৭] কিন্তু বিদ্যমান আইন, নীতি ও প্রবিধান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে ঘাটতি এবং পরিবেশদূষণ নিয়ন্ত্রণসংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে ব্যর্থতাসহ পরিবেশ অধিদপ্তরের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় অনিয়মের অভিযোগ গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।[৮] ইতিপূর্বে টিআইবি পরিচালিত গবেষণায় (২০১৫) পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা (ইআইএ) ও ইকোলজিক্যালি ক্রিটিক্যাল এরিয়া (ইসিএ) ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের ঘাটতি প্রতিফলিত হয়েছে।[৯] তবে পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যক্রমে সুশাসনসংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ গবেষণার ঘাটতি রয়েছে।

এর পরিপ্রেক্ষিতে পরিবেশ রক্ষা এবং দূষণ রোধে পরিবেশ অধিদপ্তরকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগসহ অর্পিত দায়িত্ব পালনে সক্ষমতা ও কার্যকারিতার দিকগুলো সুশাসনের দিক থেকে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করার প্রয়োজনীয়তা থেকে গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়েছে।

---

* ২০২২ সালের ৫ জানুয়ারি ঢাকায় ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ।

গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য পরিবেশ অধিদপ্তরে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা। এই গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো :

- পরিবেশ অধিদপ্তরের আইন প্রতিপালনে সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জগুলো চিহ্নিত করা;
- পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জগুলো চিহ্নিত করা;
- পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যক্রমে অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন, মাত্রা ও কারণ চিহ্নিত করা এবং
- পরিবেশ অধিদপ্তরের সুশাসনের চ্যালেঞ্জগুলো উত্তরণে সুপারিশ প্রস্তাব করা।

গবেষণার পদ্ধতি

এটি একটি মিশ্র পদ্ধতির গবেষণা। গুণগত ও পরিমাণগত পদ্ধতি এবং কৌশল প্রয়োগ করে তথ্য সংগ্রহ, যাচাই ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই গবেষণায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করা হয়েছে (সারণি-১)।

সারণি ১ : তথ্যের ধরন, উৎস ও সংগ্রহ পদ্ধতি

তথ্যের ধরন		তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি	তথ্যের উৎস
প্রত্যক্ষ তথ্য	গুণগত	মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার (৩০টি)	পরিবেশ অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী, পরিবেশ ছাড়পত্র গ্রহীতা, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, ইআইএ পরামর্শক এবং পরিবেশ বিশেষজ্ঞ
		পর্যবেক্ষণ (৭টি)	পরিবেশদূষণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম এবং প্রধান ও মাঠপর্যায়ের বিভিন্ন কার্যালয়
	পরিমাণগত	জরিপ (৩৫৩টি)	পরিবেশ ছাড়পত্র গ্রহীতা
পরোক্ষ তথ্য		বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা	সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও নীতিমালা, প্রাসঙ্গিক গবেষণা প্রতিবেদন, গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ, পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রকাশিত প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি প্রতিবেদন এবং ওয়েবসাইট

প্রত্যক্ষ তথ্য

গবেষণার বিষয়বস্তুর সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত ব্যক্তি কিংবা এসব বিষয়ে অবহিত অধিদপ্তরের বর্তমান ও সাবেক কর্মীদের কাছ থেকে গুণগত ও পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

গুণগত তথ্য সংগ্রহপদ্ধতি

পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যক্রমের ওপর মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। গুণগত তথ্যের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত পরিমাণ তথ্যের প্রাপ্তি নিশ্চিত হওয়া পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণে চেকলিস্ট ব্যবহার করা হয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-

কর্মচারী ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, পরিবেশ ছাড়পত্র গ্রহীতা প্রতিষ্ঠান, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, ঠিকাদার, ইআইএ পরামর্শক, পরিবেশ বিশেষজ্ঞ, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, পরামর্শক সংস্থা, সাংবাদিক এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক/ব্যবস্থাপক/তত্ত্বাবধায়কের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে।

পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহপদ্ধতি

নমুনায়ন : পরিবেশ ছাড়পত্র গ্রহীতা শিল্প ইউনিট নির্বাচনে দুই পর্যায়বিশিষ্ট স্তরায়িত নমুনায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে পরিবেশ ছাড়পত্র প্রদানের নয়টি বিভাগ থেকে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে দুটি বিভাগ (ঢাকা মহানগর ও চট্টগ্রাম মহানগর) নির্বাচন করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিটি বিভাগের প্রতিটি শিল্প শ্রেণি[১০] থেকে নিয়মতান্ত্রিক দৈবচয়ন পদ্ধতিতে পরিবেশ ছাড়পত্র গ্রহীতা শিল্প প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা হয়েছে। উভয় বিভাগেই সবুজ শ্রেণিভুক্ত শিল্প ইউনিট ছিল একটি করে মোট দুটি। জরিপে দুটি শিল্প ইউনিটকেই নির্বাচন করা হয়েছে। মোট ৩৫৩টি শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে নির্দিষ্ট প্রশ্নমালার ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তুলনামূলক বিশ্লেষণ করার জন্য সবুজ শ্রেণির নমুনা (দুটি)* পর্যাপ্ত না থাকায় এই শ্রেণিকে পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সারণি ২ : পরিবেশ ছাড়পত্র গ্রহীতা জরিপের নমুনায়ন

শিল্প শ্রেণি	ঢাকা মহানগর	চট্টগ্রাম মহানগর	মোট জরিপকৃত শিল্প ইউনিট	শতকরা হার
সবুজ	১	১	২*	০.৫৭
কমলা-ক	৫২	১০	৬২	১৭.৫৬
কমলা-খ	১০২	৬১	১৬৩	৪৬.১৮
লাল	৯৫	৩১	১২৬	৩৫.৬৯
সর্বমোট	২৫০	১০৩	৩৫৩	১০০

পরোক্ষ তথ্য

গবেষণার পরোক্ষ তথ্যের উৎসের মধ্যে রয়েছে পরিবেশ, জলবায়ু এবং অধিদপ্তরসংশ্লিষ্ট আইন, বিধিমালা, নির্দেশিকা, প্রাসঙ্গিক গবেষণা প্রতিবেদন, নিবন্ধ, প্রতিবেদন, নথি, গণমাধ্যম ও ওয়েবসাইট ইত্যাদি। পরোক্ষ উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের আধেয় বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

গবেষণার তথ্য সংগ্রহের সময়

এপ্রিল ২০১৯ থেকে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে গবেষণার তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই করা হয়েছে।

বিশ্লেষণকাঠামো

আটটি সূচকের আলোকে এ গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ, যাচাই ও গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে (সারণি ৩)। এগুলো হচ্ছে আইনের শাসন, সক্ষমতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, অংশগ্রহণ, কার্যসম্পাদন, সমন্বয় ও অনিয়ম-দুর্নীতি।

সারণি ৩ : সুশাসনের নির্দেশকের ভিত্তিতে বিশ্লেষণকাঠামো

সুশাসনের নির্দেশক	পর্যবেক্ষণের সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্র
আইনের শাসন	পরিবেশ রক্ষায় বিদ্যমান আইন, নীতি ও বিধি প্রতিপালনে ঘাটতি এবং চ্যালেঞ্জ
সক্ষমতা	জনবল ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, ভৌত অবকাঠামো, লজিস্টিক্যাল ও প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থাপনা এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা
স্বচ্ছতা	স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের ব্যবস্থা, চাহিদাভিত্তিক তথ্য প্রদান, ওয়েবসাইট ও হালনাগাদ তথ্য ব্যবস্থাপনা
জবাবদিহি	কার্যক্রম তদারকি, নিরীক্ষা ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনা
অংশগ্রহণ	অধিদপ্তরের কার্যক্রমে নাগরিক অংশগ্রহণ, গণশুনানি ও সামাজিক নিরীক্ষায় স্থানীয় জনগোষ্ঠী এবং অংশীজনদের অন্তর্ভুক্তি
কার্যসম্পাদন	ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশ চিহ্নিতকরণ ও পুনরুদ্ধারে ব্যবস্থা, ক্ষতিপূরণ নিরূপণ ও আদায়, পরিবেশ মামলা পরিচালনা
সমন্বয়	পরিবেশ রক্ষায় সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়
অনিয়ম-দুর্নীতি	দুর্নীতির ক্ষেত্র, ধরন, মাত্রা ও সংঘটক

গবেষণার ফলাফল

পরিবেশসংশ্লিষ্ট আইন, নীতি ও বিধিমালা : প্রতিপালনে চ্যালেঞ্জ

পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশদূষণ নিয়ন্ত্রণসংক্রান্ত আইন প্রয়োগ পরিবেশ অধিদপ্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বাংলাদেশের পরিবেশের স্বার্থ রক্ষার্থে পরিবেশ অধিদপ্তর বেশ কিছু আইন, বিধি ও নীতিমালা অনুযায়ী এর ওপর ন্যস্ত আইন প্রয়োগের দায়িত্ব পালন করে থাকে। পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টি বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার একটি মূলনীতির অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানে বলা হয়েছে, 'রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিবেন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্য প্রাণীর সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করিবেন'।[১১] সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতির দ্বারা পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিশেষ গুরুত্ব পেলেও এবং পরিবেশসংক্রান্ত আইনগুলো যথাযথভাবে প্রয়োগ করার দায়িত্ব পরিবেশ অধিদপ্তরের হলেও এই গবেষণায় বাংলাদেশের পরিবেশসংক্রান্ত আইন ও বিধির সীমাবদ্ধতা, প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ ও তার প্রভাব নিয়ে উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ রয়েছে।

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ : এই আইনে[১২] অধিদপ্তরের মহাপরিচালক নিয়োগের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু মহাপরিচালক নিয়োগে চাকরির শর্ত ও যোগ্যতা, যেমন দুর্যোগ-সম্পর্কিত বিশেষায়িত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ইত্যাদি বিষয় নির্ধারণ না করায় নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়মের সুযোগ রয়েছে, ফলে বিশেষায়িত জ্ঞানসম্পন্ন নেতৃত্বের ঘাটতি বিদ্যমান। এ ছাড়া প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনার কথা বলা হলেও প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার সীমানা নির্ধারণসংক্রান্ত কোনো নির্দেশনা নেই।[১৩] ফলে এখতিয়ার না থাকায় প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার কাছাকাছি পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ভারী শিল্পকারখানাসহ বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ অব্যাহত রয়েছে। পলিথিন শপিং ব্যাগ নিষিদ্ধ করা হলেও সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ও লেমিনেটেড প্লাস্টিক নিষিদ্ধ করা হয়নি, ফলে প্লাস্টিক দূষণ অব্যাহত রয়েছে।[১৪]

পরিবেশ আদালত আইন, ২০১০ : এই আইনের[১৫] অধীনে প্রতিটি জেলায় এক বা একাধিক পরিবেশ আদালত প্রতিষ্ঠার বিধান থাকলেও বর্তমানে সারা দেশে মাত্র তিনটি পরিবেশ আদালত ও একটি পরিবেশ আপিল আদালত রয়েছে। এর ফলে পরিবেশদূষণ-সংক্রান্ত মামলার বিচারে বিলম্বের পাশাপাশি মামলা পরিচালনায় বাদী-বিবাদীদের ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের মাধ্যমে দীর্ঘ প্রশাসনিক প্রক্রিয়া শেষ করে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা করার অনুমতি নিতে হয়।[১৬] মহাপরিচালক বা তার কাছ থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে সরাসরি মামলা করতে পারলেও সাধারণ মানুষ মামলা করতে পারে না। এ ছাড়া মামলার প্রক্রিয়া শেষ হতে হতে অনেক সময় পাহাড় কাটা, জলাশয় ভরাটসহ পরিবেশ ধ্বংসকারী অনেক কাজ শেষ হয়ে যায়। পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিদর্শকের লিখিত প্রতিবেদন ছাড়া পরিবেশ আদালত কর্তৃক কোনো ক্ষতিপূরণের দাবি বিচারের জন্য গ্রহণ করতে না পারায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির সরাসরি মামলা করা ও ক্ষতিপূরণ পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়।[১৭]

ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ : ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩[১৮]–এ ইট তৈরিতে নিষিদ্ধ মাটির উৎস হিসেবে 'কৃষিজমি' বলতে দুই বা তার বেশি ফসলি জমির উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে এক ফসলি জমির উর্বর মাটি কেটে ইট তৈরি অব্যাহত রয়েছে। এই আইনের প্রয়োগ না হওয়ায় মাটি উর্বরতা শক্তি ও উৎপাদন ক্ষমতা হারাচ্ছে। এ ছাড়া ইটভাটায় ইট পোড়ানোর কাজে জ্বালানি হিসেবে কাঠ ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হলেও[১৯] কাঠের ব্যবহার অব্যাহত রয়েছে। আবাসিক এলাকা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাট-বাজার ও ফসলি জমির এক কিলোমিটারের মধ্যে ইটভাটা স্থাপন নিষিদ্ধ[২০] হলেও ইটভাটাগুলো গড়ে উঠছে ফসলি জমি দখল করে লোকালয়ের পাশ ঘেঁষে। ২০১৯ সালে আইনটি সংশোধিত করে ধারা ৫(৩ক) সংযুক্ত করা হয়, যেখানে ইটের কাঁচামাল হিসেবে মাটির ব্যবহার হ্রাস করার জন্য আধুনিক প্রযুক্তির ইটভাটায় নির্দিষ্ট হারে ফাঁপা ইট (Hollow Brick) প্রস্তুত করার নির্দেশনা দেওয়া হয়। পরে প্রজ্ঞাপন জারি করে মাটির ব্যবহার পর্যায়ক্রমে হ্রাসকল্পে সব সরকারি নির্মাণ, মেরামত ও সংস্কারকাজে পোড়ানো ইটের বিকল্প হিসেবে শুধু সরকারি নির্মাণকাজে পোড়ানো ইটের বিকল্প হিসেবে ব্লক ইটের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়। কিন্তু বেসরকারি ও ব্যক্তিমালিকানাধীন নির্মাণকাজে ব্লক ইটের ব্যবহার বাধ্যতামূলক না হওয়ায় বেসরকারি ও ব্যক্তিমালিকানাধীন নির্মাণকাজে ব্লক ইটের ব্যবহার ও প্রসারে ঘাটতি রয়েছে এবং কৃষি ও উর্বর জমির উপরিভাগের মাটি কেটে ইট তৈরি অব্যাহত রয়েছে। ফলে মাটির ব্যবহার হ্রাসে সরকারি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন না হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ : এই বিধিমালার[২১] বিধি ১৩ অনুযায়ী সরকারি ও বেসরকারি প্রকল্প ও শিল্পকারখানাগুলো কর্তৃক নির্ধারিত মাত্রার চেয়ে বেশি মাত্রায় বর্জ্য পরিবেশে উন্মুক্ত না করার নির্দেশনা থাকলেও ক্ষেত্রবিশেষে আন্তর্জাতিকভাবে অনুসৃত মাত্রার সাথে সামঞ্জস্য রেখে মাত্রা নির্ধারণ করা হয়নি। ফলে বিভিন্ন প্রকল্প ও শিল্পকারখানা থেকে নির্ধারিত মাত্রার চেয়েও বেশি মাত্রায় বর্জ্য নিঃসরণ হচ্ছে। বিধি ৭(২) অনুযায়ী আবাসিক এলাকায় শিল্পকারখানা স্থাপন না করার নির্দেশনা থাকলেও পরিবেশ ছাড়পত্র প্রদান অব্যাহত রয়েছে। ফলে শব্দ, পানি, বায়ুদূষণসহ সরকারি সম্পত্তির (পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস) অপব্যবহার এবং যেকোনো মুহূর্তে ভবন ধস, অগ্নিকাণ্ডসহ নানা দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে। ছাড়পত্র পাওয়ার জন্য সব শ্রেণির শিল্পকারখানার জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষ থেকে অনাপত্তিপত্র নেওয়া আবশ্যক [বিধি ৭(৬)] হলেও এটি ছাড়াই পরিবেশ অধিদপ্তর

থেকে ছাড়পত্র প্রদান করা হচ্ছে। ফলে সুযোগ পেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ও নিষিদ্ধ স্থানে শিল্পকারখানা স্থাপন অব্যাহত রয়েছে।

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা

জনবল ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা : পরিবেশ অধিদপ্তরে জনবল-সংকট রয়েছে। অধিদপ্তরে অনুমোদিত পদ ১ হাজার ১৪১টি হলেও লোকবল আছে ৪৬৫ জন (শূন্য পদের হার ৫৯ দশমিক ২৫ শতাংশ)।[২২] জনবলের ঘাটতির কারণে ছাড়পত্র প্রদানসহ অন্যান্য সেবা প্রদানে সমতা নিশ্চিত করা যায় না, যা অনিয়ম ও দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি করে। একজন কর্মকর্তা/কর্মচারী একসাথে অনেকগুলো কাজের দায়িত্বে নিযুক্ত থাকায় কাজের মান হ্রাস পায়। তদারকি প্রতিবেদন পর্যালোচনা করার জন্য অধিদপ্তরের নিজস্ব ক্ষেত্রভিত্তিক বিশেষজ্ঞ দল নেই। আধুনিক পরিবেশগত ও প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন জনবলের ঘাটতি থাকায় প্রায়ই দূষণ বা পরিবেশগত বিপর্যয় দ্রুত চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রেও ঘাটতি রয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তরে প্রেষণে নিয়োগপ্রাপ্ত উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাদের পরিবেশ ও জলবায়ু-সম্পর্কিত বিশেষায়িত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় ঘাটতি রয়েছে। এ ছাড়া প্রেষণে পদায়িত হওয়ার কারণে অধিদপ্তরের শীর্ষ নেতৃত্বের পক্ষ থেকে সরকারের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে (পরিবেশের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ বড় উন্নয়ন প্রকল্প এবং শিল্পকারখানা স্থাপনে ছাড়পত্র প্রক্রিয়ায়) বস্তুনিষ্ঠ অবস্থান গ্রহণেও ঘাটতি রয়েছে।[২৩]

সারণি ৪ : পরিবেশ অধিদপ্তরে জনবলের সারসংক্ষেপ

পদ	অনুমোদিত পদ (সংখ্যা)	শূন্য পদ (সংখ্যা)
১ম শ্রেণি	২৭৪	৯৪
২য় শ্রেণি	২০১	১৬৬
৩য় শ্রেণি	৪২৮	২১০
৪র্থ শ্রেণি	২৩৮	২০৬
মোট	**১,১৪১**	**৬৭৬**

ভৌত অবকাঠামো ও লজিস্টিকস : বাংলাদেশের সব জেলায় পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যালয় না থাকায় স্থানীয় পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়নে ঘাটতি দেখা যায়। মাত্র ২১টি জেলায় পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যালয় থাকার কারণে কোনো কোনো কার্যালয়কে একই সাথে তিন-চারটি জেলায় কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়। এ ছাড়া পরিবেশ অধিদপ্তরের অবকাঠামোগত ও লজিস্টিকসের ঘাটতি রয়েছে। মাঠপর্যায়ের কার্যালয়গুলোতে অত্যাবশ্যক অবকাঠামো (যেমন দাপ্তরিক কাজের জন্য কক্ষ ও বসার জায়গা) ও আসবাব এবং প্রয়োজনীয় লজিস্টিক্যাল সুবিধার (যেমন কম্পিউটার, প্রিন্টার, ফটোকপিয়ার ও ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট-সংযোগ) ঘাটতি রয়েছে। পরিবেশগত ছাড়পত্র আবেদন পদ্ধতি অনলাইনভিত্তিক করা হলেও প্রদান ও নবায়ন সম্পূর্ণভাবে ডিজিটালাইজড করা হয়নি। পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ কর্মকাণ্ড পরিচালনাসহ তদারকি ও পরিবীক্ষণে আধুনিক প্রযুক্তির ঘাটতি রয়েছে। এ ছাড়া অধিদপ্তরের কার্যক্রমে জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেম (জিআইএস)

ও রিমোট সেনসিং প্রযুক্তির সম্প্রসারণ করা হয়নি। ম্যানুয়ালি কর্মকাণ্ড পরিচালনা করায় পরিবেশ অধিদপ্তর সঠিকভাবে দূষণের মাত্রা শনাক্ত করতে পারে না।

আর্থিক ব্যবস্থাপনা : দূষণ নিয়ন্ত্রণ পরিবেশ অধিদপ্তরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হওয়া সত্ত্বেও এ খাতে তারা বরাদ্দের সম্পূর্ণ অংশ খরচ করতে পারে না। পরিবেশ অধিদপ্তরের জন্য গত পাঁচ অর্থবছরে গড় বরাদ্দ ছিল ৯৮ কোটি ৩৮ লাখ টাকা; পক্ষান্তরে গড় ব্যয় ছিল ৮৫ কোটি টাকা; অর্থাৎ বরাদ্দের তুলনায় ব্যয়ের হার ৮৬ দশমিক ৪০ শতাংশ।[২৪] জরিমানা, দণ্ড ও বাজেয়াপ্তকরণ, পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান ও নবায়ন এবং পরীক্ষা ও পরীক্ষণ/টেস্টিং ফিসহ অন্যান্য খাতে আয় করে অধিদপ্তর প্রতিবছর গড়ে ৬৫ কোটি ১১ লাখ টাকা রাজস্ব সংগ্রহ করে সরকারের কোষাগারে প্রদান করে। এসব কার্যক্রম থেকে যে অর্থ পাওয়া যায় তা থেকে কিছু অংশ প্রণোদনাস্বরূপ পরিবেশ অধিদপ্তরের জনবল, সাংগঠনিক কাঠামো এবং প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ করার প্রস্তাব করা হলেও তা মন্ত্রণালয় নাকচ করে দিয়েছে।[২৫] পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণের চেয়ে পরিবেশ অধিদপ্তরের রাজস্ব সংগ্রহে আগ্রহ বেশি থাকায় তা পরিবেশ রক্ষায় অন্যতম অন্তরায় ও দুর্নীতির ঝুঁকি সৃষ্টি করছে। অপরদিকে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান ও নবায়ন ফি আদায় অধিদপ্তরের অন্যতম আয়ের উৎস হলেও উল্লেখযোগ্যসংখ্যক শিল্প প্রতিষ্ঠানকে তারা এর আওতায় নিয়ে আসতে পারেনি।[২৬]

স্বচ্ছতা

পরিবেশ অধিদপ্তরে তথ্যের উন্মুক্ততা ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ঘাটতি বিদ্যমান। ওয়েবসাইটে অধিদপ্তরের পূর্ণাঙ্গ বাজেট ও প্রকল্পের বিস্তারিত তথ্য দেওয়া নেই। প্রতিবছর বিভিন্ন পর্যায়ে কী পরিমাণ দূষণ হচ্ছে, কোথায় হচ্ছে ও কারা করছে তা প্রকাশ করা হয় না।[২৭] মাঠপর্যায়ের কার্যালয়ের নিজস্ব ওয়েবসাইট নেই এবং সেখানে নাগরিক সনদ প্রদর্শিত না থাকায় অধিদপ্তরের স্থানীয় পর্যায়ের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানা যায় না।[২৮] অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার কথা থাকলেও গত দুই বছরের প্রতিবেদন এখনো প্রকাশ করা হয়নি। কেন্দ্রীয় ওয়েবসাইটটি নিয়মিত হালনাগাদ করা হয় না এবং গত ছয় বছরেও পরিবেশ অধিদপ্তরের তথ্যচিত্র হালনাগাদ করা হয়নি। দেশের বৃহৎ প্রকল্পসহ (যেমন রামপাল, মাতারবাড়ী, পদ্মা সেতু ইত্যাদি) সব ধরনের প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (ইআইএ) প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয় না।

জবাবদিহি

কার্যক্রম তদারকি : পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে তদারকির সময় ইটিপি, কারখানার পরিবেশ, পানির মান, লাইসেন্সের কাগজপত্র, ল্যাবরেটরি রিপোর্ট, টাকার রসিদ, ছাড়পত্র নবায়ন ও মূল সার্টিফিকেট ইত্যাদি বিষয় নিবিড়ভাবে দেখতে হয়। অভিযোগ রয়েছে, তদারকি কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট কারখানার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সঠিকভাবে তদারকি করেন না।[২৯] জরিপের আওতাভুক্ত প্রায় এক-তৃতীয়াংশ শিল্পকারখানায় বছরে একবারও পরিবেশ অধিদপ্তরের তদারকি হয়নি। এ ছাড়া ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার তদারকিতে ঘাটতি থাকায় পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান ও নবায়ন ছাড়পত্র হস্তান্তর করতে সময়ক্ষেপণ করা হয়।[৩০] ক্ষেত্রবিশেষে ছাড়পত্র নিতে

দালালের মাধ্যমে কাজ সম্পন্ন করতে গিয়ে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতিনিধিরা হয়রানির শিকার হন। ক্ষেত্রবিশেষে শিল্পকারখানার তরল বর্জ্য (এফ্লুয়েন্ট) মানমাত্রা অনুযায়ী নিঃসরণ না হলেও তদারকি প্রতিবেদনে প্রকৃত চিত্র প্রতিফলিত না হওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

চিত্র ১ : পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে শিল্প কারখানা বার্ষিক তদারকি
(পরিদর্শনকৃত কারখানার হার)

নিরীক্ষা : মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (সিএজি) কার্যালয় কর্তৃক অধিদপ্তরের ওপর গতানুগতিক নিরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। এ ক্ষেত্রে সিএজির পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে যথাযথ কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয় না। অন্যদিকে অধিদপ্তরের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা মাঠ জরিপভিত্তিক না হয়ে কেবল নথি পর্যালোচনাভিত্তিক হয়।

> ‘পরিবেশ অধিদপ্তরের নিরীক্ষা করার জন্য কারিগরি ও পরিবেশসংক্রান্ত জ্ঞান জরুরি হলেও যারা নিরীক্ষা সম্পন্ন করেন, তাদের এ-সংক্রান্ত জ্ঞানের ঘাটতি আছে। দূষণ নিয়ন্ত্রণে কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে; দূষণের হার কত; জরিমানা, আর্থিক দণ্ড, বাজেয়াপ্তকরণের পরিমাণ ও দূষণকারী ইত্যাদি বিষয়ের পর্যবেক্ষণ নিরীক্ষা প্রতিবেদনে থাকে না। ২০০৭ সালে প্রণীত ‘এনভায়রনমেন্ট পারফরম্যান্স অডিট’-এ পরিবেশ সংরক্ষণে বিশেষায়িত জ্ঞানসম্পন্ন জনবল নিয়োগ না দেওয়ার পর্যবেক্ষণ উঠে এসেছিল।’
>
> *- একজন মুখ্য তথ্যদাতা*

অভিযোগ গ্রহণ ও নিরসনব্যবস্থা : পরিবেশ অধিদপ্তরের বিবিধ কার্যক্রমে অনিয়ম থাকলেও অভিযোগ প্রতিকারব্যবস্থায় আস্থাহীনতা রয়েছে এবং অভিযোগ প্রদানেও অনীহা রয়েছে। যেমন লিখিত অভিযোগ গ্রহণের জন্য কার্যালয়গুলোতে কোনো অভিযোগ বাক্স নেই, ক্ষেত্রবিশেষে শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দায়েরকৃত অভিযোগ তদন্তে ঘাটতি রয়েছে এবং গণমাধ্যমে প্রকাশিত অভিযোগগুলো আমলে নিয়ে তদন্ত ও সুরাহা করায় ঘাটতি রয়েছে। সাধারণ জনগণের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে দূষণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে অধিদপ্তর থেকে কারণ দর্শানোর নোটিশ পাঠানো হলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সেই

প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে মুচলেকা নিয়ে অব্যাহতি দেওয়া হয়। অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করা হলে প্রশাসনিকভাবে তদন্তের ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে। আন্তবিভাগীয় কোনো অভিযোগ দাখিল হলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা হয় বলা হলেও ক্ষেত্রবিশেষে অভিযোগকারী কর্মীর হয়রানির শিকার হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হয়।

গণশুনানি ও সামাজিক নিরীক্ষায় অংশীজনের অন্তর্ভুক্তি : পরিবেশ অধিদপ্তরের সদর দপ্তরে প্রতি মাসের তৃতীয় বৃহস্পতিবার গণশুনানি অনুষ্ঠিত হলেও এর কার্যকারিতায় ঘাটতি রয়েছে। গণশুনানিতে আনীত অভিযোগ নিষ্পত্তি না হলে একই অভিযোগ পুনরায় মহাপরিচালক বরাবর লিখিতভাবে দিতে হয়। যেকোনো প্রকল্প শুরু করার আগে এবং পরিবেশগত সমীক্ষা পরিচালনার সময় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মতামত গ্রহণে ঘাটতি রয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর পরিবেশগত বিপন্নতা ও পরিবেশের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে স্থানীয় জনগণের মতামত পরিবেশগত সমীক্ষায় (আইইই, ইআইএ এবং এসআইএ) প্রতিফলিত হয় না। স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করে পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণে ঘাটতি রয়েছে। এ ছাড়া অংশীজনদের পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত করতে কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণে ঘাটতি রয়েছে।[৩১,৩২]

কার্যসম্পাদন

ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশ চিহ্নিতকরণ ও পুনরুদ্ধারে ব্যবস্থা : ইটিপি থেকে নির্গত পানির মান সঠিকভাবে নির্ণয় করা হয় না। নির্ধারিত সময়ের চেয়ে কম সময় নিয়ে নমুনা সংগ্রহ করার ফলে এফ্লুয়েন্ট ডিসচার্জ সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রতিবেদনে আসে না এবং ঝুঁকিপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলোও চিহ্নিত করতে পারে না পরিবেশ অধিদপ্তর।[৩৩] পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষার পরে 'মিটিগেশন মেজার' পরিকল্পনা দিয়েও কোনো প্রকল্পের ঝুঁকি নিরসন না হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তা বাতিল করার নিয়ম থাকলেও সরকারি বড় প্রকল্প এবং বড় বিনিয়োগের শিল্পকারখানার ক্ষেত্রে এই নিয়মের প্রয়োগ হয় না। প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার কাছে রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পসহ ভারী শিল্পকারখানা স্থাপন অব্যাহত রয়েছে। রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্পের চার কিমি দূরে সুন্দরবনের প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা এবং ২ দশমিক ৫ কিমি দূরে বিপন্ন প্রজাতির ইরাবতী ডলফিনের অভয়ারণ্যের ক্ষতি রোধে পরিবেশ অধিদপ্তর কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। ইউনেসকোর পর্যবেক্ষণ ও রামসার কনভেনশন মোতাবেক রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পটির পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা প্রতিবেদন ত্রুটিপূর্ণ ও সুন্দরবনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ বলে চিহ্নিত হয়। কিন্তু দফায় দফায় ইআইএ প্রতিবেদন পরিবর্তন করা হয়। পরিবেশ অধিদপ্তর প্রথমে আপত্তি জানালেও সরকারের চাপে প্রকল্পটির বিরুদ্ধে অনড় অবস্থান গ্রহণ করেনি।[৩৪] পরিবেশবাদীদের আপত্তি সত্ত্বেও প্রকল্পটির বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে। অন্যদিকে বায়ুদূষণের ক্ষেত্রে দূষিত রাজধানীর তালিকায় ঢাকার অবস্থান শীর্ষ পর্যায়ে হলেও দূষণ বন্ধে অধিদপ্তর সুরক্ষামূলক কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।[৩৫]

মেয়াদোত্তীর্ণ পরিবেশগত ছাড়পত্র : জরিপকৃত শিল্পকারখানার শতকরা ৫১ ভাগ মেয়াদোত্তীর্ণ ছাড়পত্র দিয়ে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে, যার শতকরা ৭০ ভাগ তথ্য সংগ্রহের সময় পর্যন্ত নবায়নের জন্য আবেদনই করেনি।

চিত্র ২ : মেয়াদোত্তীর্ণ পরিবেশগত ছাড়পত্র নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা (শিল্পকারখানার শতকরা হার)

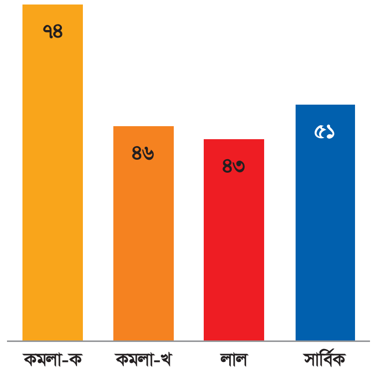

চিত্র ৩ : তথ্য সংগ্রহের সময় ছাড়পত্র নবায়নের অবস্থা (শিল্পকারখানার শতকরা হার)

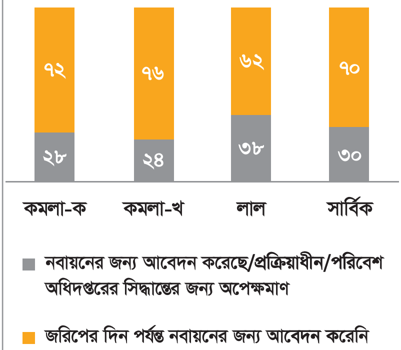

ক্ষতিপূরণ নিরূপণ ও আদায় এবং মামলা পরিচালনা : দূষণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের কোনো তালিকা না থাকায় 'দূষণকারী কর্তৃক ক্ষতিপূরণ প্রদান' মানদণ্ডের আলোকে জরিমানা, দণ্ড ও বাজেয়াপ্তকরণে ঘাটতি রয়েছে। ২০১৭-১৮ থেকে ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত জরিমানা, দণ্ড ও বাজেয়াপ্তকরণের মাধ্যমে মাত্র ৭০ কোটি ৭৭ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করা হয়েছে, যা গত চার বছরে বাংলাদেশে দূষণের কারণে যে পরিমাণ পরিবেশগত বিপর্যয় হয়েছে তার তুলনায় নগণ্য। অন্যদিকে নির্ধারণকৃত জরিমানার বড় অংশ আপিলের মাধ্যমে ছাড় পায় দূষণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো।[৩৬] ভ্রাম্যমাণ আদালতে মোট মামলার সংখ্যা ৮ হাজার ৭৫৬টি। দূষণকারীদের বিরুদ্ধে পরিবেশ আদালতে মামলা করার পরিবর্তে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার মাধ্যমে জরিমানা নির্ধারণে অধিদপ্তর বেশি আগ্রহী বলে অভিযোগ রয়েছে। পরিবেশ সংরক্ষণ আইনে দায়ের করা মামলার বাইরেও ফৌজদারি আইনের মামলার বোঝা রয়েছে পরিবেশ আদালতের ওপরে। দেশের তিনটি পরিবেশ আদালতে ২০১৫ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত মামলার সংখ্যা ৭ হাজার ২টি হলেও এগুলোর মধ্যে পরিবেশ সংরক্ষণ আইনে দায়ের করা মামলার সংখ্যা মাত্র ৩৮৮টি, যা মোট মামলার সাড়ে ৫ শতাংশ। অধিদপ্তর কর্তৃক পরিবেশ আদালতে মামলার তদন্ত প্রতিবেদন সময়মতো দাখিল ও সাক্ষী হাজির করায় ঘাটতি রয়েছে। মামলা নিষ্পত্তিতে বিলম্ব হওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে প্রয়োজনীয়সংখ্যক আইনজীবী নিয়োগ না করা। এ ছাড়া নির্দিষ্ট আইনজীবীদের অধিক উপার্জনের পথ সুগম রাখতে মামলা পরিচালনায় প্রয়োজনীয়সংখ্যক আইনজীবী নিয়োগ না করার অভিযোগ রয়েছে।

সমন্বয়

যথাযথ সমন্বয় না থাকায় বিভিন্ন প্রকল্প ও শিল্পকারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় (ইএমপি) উল্লেখকৃত নির্দেশনাবলীর যথাযথ বাস্তবায়ন হচ্ছে কি না, তা তদারকিতে ঘাটতি

রয়েছে। সমন্বয়ের ঘাটতির কারণে ইটিপির কার্যকারিতা এবং মানদণ্ড ও নির্দেশিকা অনুযায়ী বর্জ্য নিঃসরণ-সংক্রান্ত বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদন প্রণয়নের ক্ষেত্রেও ঘাটতি রয়েছে।[৩৭] আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেসি বা পুলিশি ক্ষমতার জন্য অধিদপ্তরকে অন্য দপ্তরের ওপর নির্ভর করতে হয়। এখানে সমন্বয়ের ঘাটতি থাকায় পরিবেশ আইনের প্রয়োগ যথাযথভাবে হয় না। পরিবেশ অধিদপ্তরের অভিযোগ, দূষণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম ও ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করতে সময় এবং সুযোগমতো প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছ থেকে সহযোগিতা পাওয়া যায় না।[৩৮] পরিবেশ অধিদপ্তরের সাথে অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে একটি কমিটি গঠন করা হলেও এর সদস্যদের ব্যস্ততার কারণে কার্যকারিতায় ঘাটতি রয়েছে।

দুর্নীতি ও অনিয়ম

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র ছাড়াই পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান : পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে ছাড়পত্র প্রদানের ক্ষেত্রে সব শ্রেণির শিল্পকারখানাকে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ থেকে প্রাপ্ত অনাপত্তিপত্র জমা দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু জরিপের আওতাভুক্ত শতকরা ১৭ ভাগ শিল্পকারখানা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনাপত্তিপত্র না পাওয়া সত্ত্বেও পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে ছাড়পত্র পেয়েছে।

চিত্র ৪ : স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র ছাড়াই পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান (শিল্পকারখানার শতকরা হার)

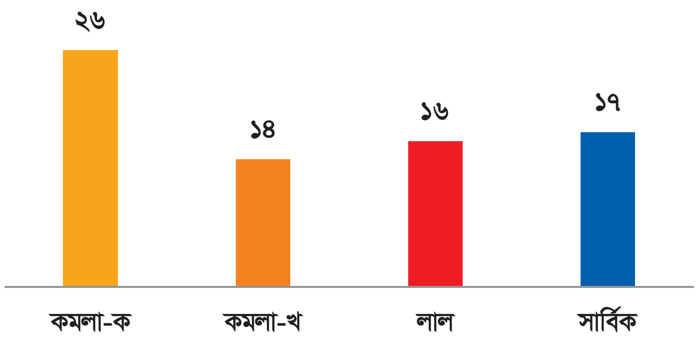

আবাসিক এলাকায় অবস্থিত শিল্পকারখানার পরিবেশ ছাড়পত্রপ্রাপ্তি : আবাসিক এলাকায় শিল্পকারখানা স্থাপন না করার আইনি বিধান থাকলেও জরিপের আওতাভুক্ত বেশির ভাগ শিল্পকারখানাই (৭২ শতাংশ) আবাসিক এলাকায় অবস্থিত। ক্ষমতার অপব্যবহার এবং ক্ষেত্রবিশেষে অবৈধভাবে অর্থ লেনদেনের মাধ্যমে এটি করা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে।

চিত্র ৫ : আবাসিক এলাকায় অবস্থিত পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে ছাড়পত্রপ্রাপ্ত শিল্পকারখানা (শতকরা হার)

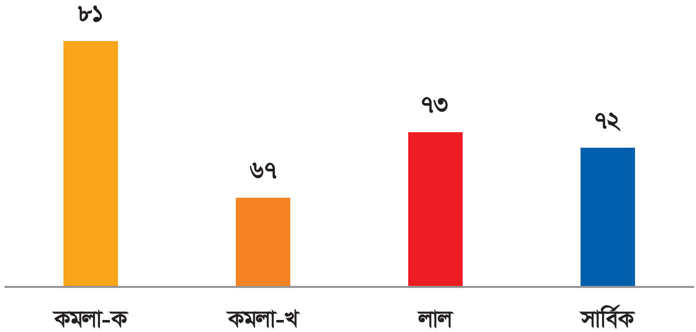

লাল শ্রেণিভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের ইআইএ প্রতিবেদন জমা প্রদান : পরিবেশদূষণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকদের সাথে প্রভাবশালী আমলা এবং ক্ষমতাসীন রাজনীতিকদের একাংশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট সম্পর্ক থাকায় প্রভাব এবং যোগসাজশের মাধ্যমে ত্রুটিপূর্ণ ইআইএ দিয়েও ছাড়পত্র দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে প্রকল্প শুরু হওয়ার আগে ইআইএ না করে বাস্তবায়নের শেষ পর্যায়ে ইআইএ সম্পন্ন করা হয় এবং একে এক্সটেনশন ইআইএর নামে চালিয়ে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে লাল শ্রেণি শিল্প ইউনিটের ছাড়পত্রপ্রাপ্তির আগে ইআইএ প্রতিবেদন জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক হলেও জরিপের তথ্যমতে শতকরা ২২ ভাগই ইআইএ প্রতিবেদন জমা দেয়নি।

পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানে অনিয়ম : পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য কোনো কোনো কর্মকর্তার সাথে দালালের পূর্ব যোগসাজশ এবং নিয়মবহির্ভূত অর্থের একটা অংশ প্রাপ্তির পর ছাড়পত্র প্রদানের অভিযোগ রয়েছে। জরিপে শতকরা ৫১ ভাগ শিল্পকারখানায় পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানে অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে।

চিত্র ৬ : পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানে অনিয়ম
(উত্তরদাতা শিল্পকারখানার অভিমত অনুযায়ী; একাধিক উত্তর) (শতকরা হার)

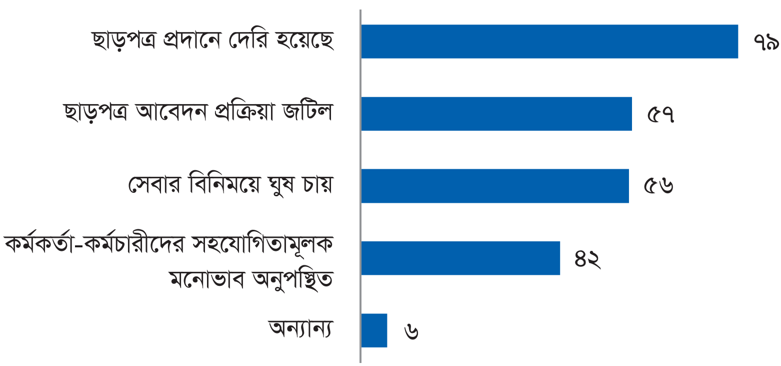

পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএমপি) ছাড়া পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান : কমলা-খ ও লাল শ্রেণিভুক্ত শিল্পকারখানা/প্রকল্পের পরিবেশগত ছাড়পত্র আবেদনের সময় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক। তবে জরিপের আওতাভুক্ত শতকরা ৫৭ ভাগ শিল্পকারখানা/প্রকল্প কোনো প্রকার পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ছাড়াই পরিবেশগত ছাড়পত্র পেয়েছে।

চিত্র ৭ : পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ছাড়াই যোগসাজশের মাধ্যমে কমলা-খ ও লাল শ্রেণিভুক্ত শিল্পকারখানা/প্রকল্পের ছাড়পত্র প্রদান (শতকরা হার)

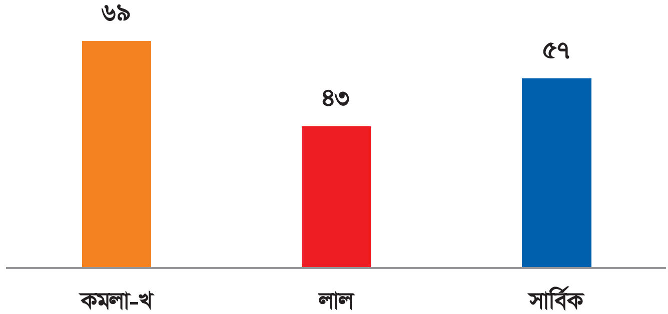

পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের বিভিন্ন পর্যায়ে যোগসাজশের মাধ্যমে নিয়মবহির্ভূত আর্থিক লেনদেন : জরিপকৃত শিল্পকারখানার শতকরা ৬৬ ভাগ পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের বিভিন্ন পর্যায়ে (যেমন অনাপত্তিপত্র পাওয়া, অবস্থানগত ছাড়পত্র পাওয়া) যোগসাজশের মাধ্যমে নিয়মবহির্ভূত আর্থিক লেনদেন করে থাকে।

চিত্র ৮ : পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের বিভিন্ন পর্যায়ে যোগসাজশের মাধ্যমে নিয়মবহির্ভূত আর্থিক লেনদেন (শিল্পকারখানার শতকরা হার)

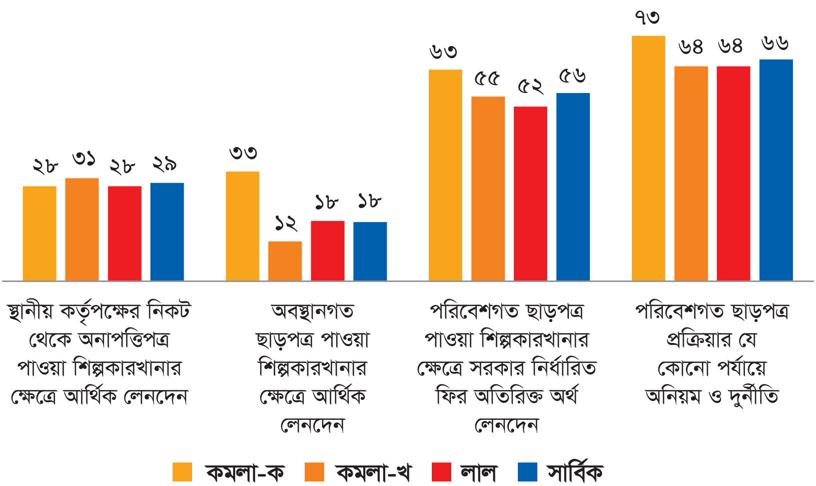

জরিপকৃত শিল্পকারখানার পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের ক্ষেত্রে শ্রেণিভেদে সার্বিকভাবে সর্বনিম্ন ৩৬ হাজার টাকা থেকে সর্বোচ্চ ১ লাখ ৮ হাজার ৮০০ টাকা পর্যন্ত নিয়মবহির্ভূত আর্থিক লেনদেনের তথ্য পাওয়া যায়।

সারণি ৫ : পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের বিভিন্ন পর্যায়ে যোগসাজশের মাধ্যমে নিয়মবহির্ভূত আর্থিক লেনদেনের পরিমাণ

শিল্প প্রতিষ্ঠানের ধরন	স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র পাওয়ার ক্ষেত্রে নিয়মবহির্ভূত আর্থিক লেনদেনের গড় পরিমাণ (টাকা)	অবস্থানগত ছাড়পত্র পাওয়ার ক্ষেত্রে নিয়মবহির্ভূত আর্থিক লেনদেনের গড় পরিমাণ (টাকা)	পরিবেশগত ছাড়পত্র পাওয়ার ক্ষেত্রে নিয়মবহির্ভূত আর্থিক লেনদেনের গড় পরিমাণ (টাকা)	সার্বিক নিয়মবহির্ভূত আর্থিক লেনদেনের গড় পরিমাণ (টাকা)
কমলা-ক	৬,৪০০	৯২,০০০	১০,৫০০	৪৩,০০০
কমলা-খ	৯,৫০০	৮৬,০০০	৪৪,০০০	৩৬,০০০
লাল	৮,০০০	১,২৫,৮০০	১,৬৬,০০০	১,০৮,৮০০

** নিয়মবহির্ভূত আর্থিক লেনদেনের পরিমাণ পূর্ণসংখ্যায় ওয়েটেড গড় হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।*

অন্যান্য অনিয়ম ও দুর্নীতি : অধিদপ্তরের 'নির্মল বায়ু ও টেকসই পরিবেশ' প্রকল্পে অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। এই প্রকল্পের অধীনে অযৌক্তিকভাবে একই কর্মকর্তার ১০ বারসহ ১০ বছরে মোট ২৯৩ জন কর্মকর্তার বিদেশে প্রশিক্ষণের নামে ভ্রমণ বাবদ অর্থ অপচয় করা হয়েছে। এ ছাড়া প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় অনিয়ম নিয়ে সংসদীয় স্থায়ী কমিটি উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং মূল্যায়নের জন্য পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে (আইএমইডি) প্রেরণ করেছে। পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মীদের একাংশের ক্ষমতা অপব্যবহার করে এবং অবৈধ লেনদেনের মাধ্যমে পরিবেশদূষণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের জরিমানার অর্থ মওকুফ করে দেওয়ারও অভিযোগ রয়েছে। কারখানায় ইটিপির কার্যকারিতা তদারকির সময় অধিদপ্তরের কর্মীদের একাংশের পারস্পরিক যোগসাজশে এবং নিয়মবহির্ভূত অর্থ লেনদেনের মাধ্যমে ইটিপি অচল বা বন্ধ রাখা হয় এবং জরিমানা করা হয় না। পরিবেশ অধিদপ্তরের স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনায় অন্যতম অন্তরায় হিসেবে প্রভাবশালীদের হুমকি, হস্তক্ষেপ এবং সরকারের উচ্চপর্যায়ের মৌখিক নির্দেশনা রয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

একদিকে পরিবেশসংক্রান্ত আইনের দুর্বলতা রয়েছে এবং অন্যদিকে বিদ্যমান আইন, বিধিমালাসহ সম্পূরক আইন কার্যকরভাবে প্রয়োগে ব্যর্থ হয়েছে পরিবেশ অধিদপ্তর। কর্মীদের একাংশের অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে বড় অঙ্কের নিয়মবহির্ভূত আর্থিক লেনদেন এবং তা প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে ঘাটতির ফলে পরিবেশ অধিদপ্তরে দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হয়েছে। অধিদপ্তরের

কর্মীদের একাংশের সাথে পরিবেশদূষণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকদের একাংশের যোগসাজশ এবং তাদের প্রভাবের কাছে আত্মসমর্পণ করার কারণে অধিদপ্তরের কার্যকারিতা ব্যাহত হচ্ছে। অধিদপ্তরের কার্যক্রমে সুশাসনের বিভিন্ন নির্দেশককে, যেমন স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা, জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা, জনসম্পৃক্ততা এবং কার্যকর সমন্বয়ে ঘাটতি বিদ্যমান। একদিকে সামর্থ্যের ঘাটতি এবং অন্যদিকে সরকারের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে প্রভাবিত হয়ে বস্তুনিষ্ঠ অবস্থান গ্রহণে ঘাটতির কারণে পরিবেশ রক্ষায় ব্যর্থ হচ্ছে পরিবেশ অধিদপ্তর। এ ছাড়া কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পসহ সরকারি বিভিন্ন বড় উন্নয়ন প্রকল্প এবং শিল্পকারখানা স্থাপন মূলত পরিবেশদূষণের জন্য দায়ী হলেও এবং পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ অগ্রাধিকার কার্যক্রমের অংশ হওয়ার কথা থাকলেও পরিবেশ অধিদপ্তরের বিদ্যমান ক্ষমতা প্রয়োগে ব্যর্থতা লক্ষণীয়। আমলানির্ভরতা, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ঘাটতি, নিরীক্ষায় ঘাটতি, পেশাগত দক্ষতার ঘাটতি এবং অনেক ক্ষেত্রে সৎ সাহস ও দৃঢ়তার ঘাটতির কারণে পরিবেশ অধিদপ্তর একটি দুর্বল, দুর্নীতিগ্রস্ত এবং অনেকাংশে অক্ষম ও অকার্যকর একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিণত হয়েছে।

সুপারিশ

১. আইনের যথার্থ প্রয়োগে ভয়, চাপ ও আর্থিক প্রলোভনের ঊর্ধ্বে থেকে দৃঢ়তার সাথে পরিবেশদূষণের জন্য দায়ী বড় উন্নয়ন প্রকল্প এবং শিল্পকারখানাগুলোকে জবাবদিহির মধ্যে আনতে হবে।

২. প্রেষণে পদায়ন না করে অধিদপ্তরের নেতৃত্বে বিশেষায়িত জ্ঞানসম্পন্ন ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে নিয়োগ দিতে হবে।

৩. যথাযথ চাহিদা নিরূপণসাপেক্ষে সব কার্যালয়ের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক বরাদ্দ, পর্যাপ্ত অবকাঠামো, কারিগরি ও লজিস্টিক্যাল সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।

৪. ওয়েবসাইটকে আরও তথ্যবহুল (যেমন নিরীক্ষা প্রতিবেদন, পূর্ণাঙ্গ বাজেট, প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ তথ্য, বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে করা জরিমানা ও আদায়ের পরিমাণের ওপর পূর্ণাঙ্গ তথ্য, সব প্রকল্পের ইআইএ প্রতিবেদন ইত্যাদি) ও নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে।

৫. পরিবেশসংক্রান্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানগুলোকে তালিকাভুক্ত করে পরিবেশ অধিদপ্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী ত্রুটিমুক্ত পরিবেশগত সমীক্ষা সম্পন্ন করতে হবে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠানগুলোকে অধিদপ্তরের জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে।

৬. প্রকল্প বাস্তবায়ন, দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশ সংরক্ষণের সাথে জড়িত সব কর্মীর বার্ষিক আয় ও সম্পদের বিবরণী বছর শেষে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেওয়াসহ তা প্রকাশ করতে হবে।

৭. পরিবেশ ছাড়পত্রকেন্দ্রিক অনিয়ম-দুর্নীতি এবং বিভাগীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে যথাযথ শাস্তি প্রদানের নজির স্থাপন করতে হবে।

৮. ইটিপির কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং ইআইএ প্রতিবেদন অনুযায়ী মিটিগেশন প্ল্যান,

ইএমপি তদারকি বৃদ্ধিসহ পরিবেশগত নিরীক্ষার (এনভায়রনমেন্টাল অডিট) ব্যবস্থা করতে হবে।

৯. দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশ সংরক্ষণ কার্যক্রম তদারকি ও পরিবীক্ষণে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ এবং এর কার্যকর ব্যবহার করতে হবে।

১০. আইন সংশোধনের মাধ্যমে পরিবেশ আদালতে সাধারণ মানুষের সরাসরি মামলা করার সুযোগ রাখতে হবে।

পরিশিষ্ট

পরিবেশের ওপর প্রভাব বিস্তার এবং অবস্থান অনুযায়ী শিল্প ইউনিট/প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পসমূহ নিম্নবর্ণিত চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে। ‘সবুজ’ শ্রেণির শিল্প/প্রতিষ্ঠান/প্রকল্প পরিবেশের খুবই সামান্য ক্ষতি করে; ‘কমলা-ক’ পরিবেশের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে; ‘কমলা-খ’-এর ক্ষেত্রে পরিবেশের ঝুঁকি বেশি, এবং ‘লাল’ শ্রেণির ক্ষেত্রে ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি বা মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।

সারণি ৬ : শ্রেণিভিত্তিক শিল্প ইউনিট/প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

শিল্প শ্রেণি	পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রাপ্তিতে অত্যাবশ্যকীয় কার্যাবলী										
	আবাসিক এলাকায় শিল্পকারখানা স্থাপন না করা	সম্ভাব্যতা সমীক্ষা	প্রাথমিক পরিবেশগত সমীক্ষা (আইইই)	বর্জ্য নির্গমন ব্যবস্থা	বর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপন (ইটিপি)	পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএমপি)	স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র গ্রহণ	দূষণ হ্রাসসহ জরুরি পরিকল্পনা	পুনর্বাসন পরিকল্পনা	পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (ইআইএ)	অবস্থানগত ছাড়পত্র
সবুজ	√	X	X	X	X	X	√	X	X	X	X
কমলা-ক	√	X	X	√	X	X	√	X	√	X	√
কমলা-খ	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	√
লাল	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

তথ্যসূত্র

[১] ইউনাইটেড নেশনস এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রাম, *Healthy Environment, Healthy People(2012)*, বিস্তারিত দেখুন: https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/premature-deaths-environmental-degradation-threat-global-public, (১৪ সেপ্টেম্বর ২০২১)।

[২] এনভায়রনমেন্ট পারফরম্যান্স ইনডেক্স, *Global metrics for the environment: Ranking country performance on sustainability issues (2020),* বিস্তারিত দেখুন: https://epi.yale.edu/downloads/epi2020report20210112.pdf, (১৪ সেপ্টেম্বর ২০২১)।

[৩] আইকিউ এয়ার; *World Air Quality Report Region & City PM2.5 Ranking (2020),* বিস্তারিত দেখুন: https://www.iqair.com/world-most-polluted-countries, (১৪ সেপ্টেম্বর ২০২১)।

[৪] হেলথ ইফেক্ট ইনস্টিটিউট, *State of global air: a special report on global exposure to air pollution and its health impacts(2020),* বিস্তারিত দেখুন : https://fundacionio.com/wp-content/uploads/2020/10/soga-2020-report.pdf, (১৪ সেপ্টেম্বর ২০২১)।

[৫] Enhancing Opportunities for Clean and Resilient Growth in Urban Bangladesh: Country Environmental Analysis 2018, World bank.বিস্তারিত দেখুন: https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/585301536851966118/enhancing-opportunities-for-clean-and-resilient-growth-in-urban-bangladesh-country-environmental-analysis-2018

[৬] বাংলাদেশের সংবিধান, অনুচ্ছেদ ১৮ (ক), পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়, বিস্তারিত দেখুন : http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details-957.html, (১৪ সেপ্টেম্বর ২০২১)।

[৭] জাতীয় পরিবেশ নীতি (২০১৮), পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

[৮] হবিগঞ্জের সুতাং নদী রক্ষায় হাইকোর্টের রুল, রাইজিং বিডি, বিস্তারিত দেখুন: https://www.risingbd.com/bangladesh/news/425649 সর্বশেষ ভিজিট: ০৮.১২.২০২১। পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা করতে হবে, গোলাম রব্বানী: পরিবেশ ও সমাজবিষয়ক গবেষক, ইউনিভার্সিটি অব ইয়র্ক (যুক্তরাজ্য), প্রথম আলো, সর্বশেষ ভিজিট: ০৮.১২.২১; পরিবেশ রক্ষা করেই উন্নয়ন রামপাল, রূপপুর নিয়ে আলোচনায় বক্তারা, প্রথম আলো, সর্বশেষ ভিজিট: ০৮.১২.২০২১; রামপালসহ 'প্রাণ-প্রকৃতি বিনাশী' প্রকল্প বাতিলের দাবি, সারাবাংলা, বিস্তারিত দেখুন: https://sarabangla.net/post/sb-570881/, (৮ ডিসেম্বর ২০২১)।

[৯] Use and Effectiveness of Effluent Treatment Plants (ETPs) in the Garments Industry of Bangladesh: a Water Sector Integrity Perspective, Transparency Interntional Bangladesh (TIB), May 2017, বিস্তারিত দেখুন: https://www.ti-bangladesh.org/beta3/index.php/en/bawin/135-bawin-events/5418-use-and-effectiveness-of-effluent-treatment-plants-etps-in-the-garments-industry-of-bangladesh-a-water-sector-integrity-perspective

[১০] বিভিন্ন শিল্প শ্রেণির ব্যাখ্যার জন্য দেখুন পরিশিষ্ট।

[১১] রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিস্তারিত দেখুন: http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-367/section-41505.html?lang=en, (৮ ডিসেম্বর ২০২১)।

[১২] বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন (১৯৯৫), ধারা ৩(২), পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিস্তারিত দেখুন: http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-791.html, (৮ ডিসেম্বর ২০২১)।

[১৩] বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন (১৯৯৫), ধারা ৫।

[১৪] বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন (১৯৯৫), ধারা ৬(ক)।

[১৫] পরিবেশ আদালত আইন (২০১০), ধারা ৪(১), পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিস্তারিত দেখুন : http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1061.html, (৮ ডিসেম্বর ২০২১)।

[১৬] পরিবেশ আদালত আইন (২০১০), ধারা ৬(১)।

[১৭] পরিবেশ আদালত আইন (২০১০), ধারা ৭(৪)।

[১৮] ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন (২০১৩), ধারা ৫-এ, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিস্তারিত দেখুন: http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details-1140.html, (৮ ডিসেম্বর ২০২১)।

[১৯] ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন (২০১৩), ধারা ৬।

[২০] ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন (২০১৩), ধারা ৩(ক)।

[২১] পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা (১৯৯৭),পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিস্তারিত দেখুন: http://doe.portal.gov.bd/sites/default/files/files/doe.portal.gov.bd/page/5a9d6a31_d858_4001_b844_817a27d079f5/ECR%201997.pdf, (৮ ডিসেম্বর ২০২১)।

[২২] তথ্যদাতা, পরিবেশ অধিদপ্তর (সদর দপ্তর), ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২০।

[২৩] তথ্যদাতা, একজন গবেষক, ২৯ জানুয়ারি ২০২০।

[২৪] তথ্যদাতা, পরিবেশ অধিদপ্তর (সদর দপ্তর), ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২০।

[২৫] তথ্যদাতা, পরিবেশ অধিদপ্তর (সদর দপ্তর), ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২০।

[২৬] পরিবেশের মরণবেশ : আইনে সংকট প্রয়োগও তথৈবচ, বিডিনিউজ২৪.কম, বিস্তারিত দেখুন: https://opinion.bdnews24.com/bangla/archives/36323, (৮ ডিসেম্বর ২০২১)।

[২৭] তথ্যদাতা, পরিবেশ অধিদপ্তর (সদর দপ্তর), ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০।

[২৮] তথ্যদাতা, একজন পরিবেশ ছাড়পত্র গ্রহীতা, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০।

[২৯] তথ্যদাতা, একজন পরিবেশ ছাড়পত্র গ্রহীতা, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০।

[৩০] তথ্যদাতা, একজন পরিবেশ ছাড়পত্র গ্রহীতা, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০।

[৩১] তথ্যদাতা, একজন পরিবেশবিদ ও প্রাক্তন সাংবাদিক, ২৯ জানুয়ারি ২০২০।

[৩২] তথ্যদাতা, একজন সাংবাদিক, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০।

[৩৩] তথ্যদাতা, একজন অধ্যাপক, ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯; তথ্যদাতা, একজন পরামর্শক, ২১ জানুয়ারি ২০২০।

[৩৪] UNESCO to Bangladesh: Cancel Rampal coal plant, or Sundarbans could be added to List of World Heritage in Danger in 2017, Endcoal.org, বিস্তারিত দেখুন: https://endcoal.org/2016/10/unesco-to-bangladesh-cancel-rampal-coal-plant-or-sundarbans-could-be-added-to-list-of-world-heritage-in-danger-in-2017/(৯ ডিসেম্বর ২০২১)।

[৩৫] তথ্যদাতা, একজন পরামর্শক, ২১ জানুয়ারি ২০২০।

[৩৬] জরিমানার অর্ধেক টাকাই ফেরত, কালের কণ্ঠ, বিস্তারিত দেখুন: https://www.kalerkantho.com/print-edition/last-page/2014/07/15/107048, (৮ ডিসেম্বর ২০২১); পরিবেশদূষণের জরিমানা লোক দেখানো, প্রথম আলো, (৮ ডিসেম্বর ২০২১)। জরিমানা মওকুফের সুযোগে দূষণ বাড়ছে, বণিক বার্তা, বিস্তারিত দেখুন: https://bit.ly/31gz1tF, (৯ ডিসেম্বর ২০২১)।

[৩৭] তথ্যদাতা, একজন গবেষক, ২৯ জানুয়ারি ২০২০।

[৩৮] তথ্যদাতা, একজন সাংবাদিক, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০।

মিসরের শার্ম আল শেখে কপ-২৭ জলবায়ু সম্মেলন জলবায়ু অর্থায়নে ন্যায্যতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রসঙ্গে টিআইবির অবস্থানপত্র*

মো. মাহ্ফুজুল হক

মিসরের শার্ম আল শেখ শহরে ৬ নভেম্বর ২০২২ থেকে শুরু হতে যাওয়া কপ-২৭/জলবায়ু সম্মেলনে জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন, প্রশমন এবং এ-সংক্রান্ত অর্থায়নকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ২০২১ সালে গ্লাসগো জলবায়ু সম্মেলনে বিজ্ঞানীরা পরিষ্কার করেন যে ২১০০ সালের মধ্যে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা প্রাক-শিল্প যুগ থেকে কমপক্ষে ২ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পাবে। ইতিমধ্যে তাপমাত্রা ১ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেয়েছে। এই অব্যাহত তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে প্যারিস চুক্তিতে নির্ধারিত বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি প্রাক-শিল্পোন্নয়নের সময় থেকে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে এবং সম্ভব হলে ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে রাখার লক্ষ্যমাত্রা 'লাইফ সাপোর্টে' চলে যাওয়ার অবস্থায় পৌঁছেছে।[১] তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে বিশ্বব্যাপী ঘন ঘন বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড় এবং দাবানলের ঘটনা ইতিমধ্যে প্রকট হয়েছে। কার্বন নিঃসরণকারী জীবাশ্ম জ্বালানি, বিশেষ করে কয়লার ব্যবহার ও রপ্তানি বেড়েছে এবং কয়লাভিত্তিক জ্বালানি প্রকল্পে অর্থায়নও বৃদ্ধি পেয়েছে। কোভিড-১৯ অতিমারি এবং ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধ জলবায়ু সংকটকে আরও ঘনীভূত করেছে।

বিশ্বজুড়ে জ্বালানি তেল ও গ্যাসের দাম এবং উন্নত দেশের সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় জলবায়ু অভিযোজন ও প্রশমন কার্যক্রম তহবিল সংকটে পড়েছে। উন্নয়নশীল ও ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোয় খাদ্যনিরাপত্তা, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ-সংক্রান্ত কার্যক্রমে উন্নত দেশের সহায়তা কমেছে।[২] উন্নয়নশীল দেশের জন্য ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রতিশ্রুত উন্নয়নসহায়তার 'অতিরিক্ত' এবং 'নতুন' প্রতিবছর ১০০ বিলিয়ন ডলার জলবায়ু তহবিল দিতে শিল্পোন্নত দেশগুলো ব্যর্থ হয়েছে। উন্নত দেশের বাধার মুখে ২০২১ সালে জলবায়ু সম্মেলনে ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় আলাদা তহবিলও গঠন করা হয়নি। কপ-২৬ সম্মেলনের ওপর ভিত্তি করেই এ বছর জলবায়ু সম্মেলনে জলবায়ু অর্থায়ন, অভিযোজন, প্রশমন, ক্ষয়ক্ষতি (loss and damage) তহবিল গঠন এবং উন্নত

---

* কপ-২৭ জলবায়ু সম্মেলন উপলক্ষে প্রণীত টিআইবির ওয়েবসাইটে প্রকাশিত অবস্থানপত্র।

[১] জাতিসংঘ মহাসচিবের ভাষণ, ২০২২, বিস্তারিত দেখুন: https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2022-03-21/secretary-generals-remarks-economist-sustainability-summit

[২] জাতিসংঘ, এপ্রিল ২০২২, বিস্তারিত দেখুন: https://www.uneca.org/stories/global-impact-of-war-in-ukraine-on-food%2C-energy-and-finance-systems

স্বচ্ছতাকাঠামোসহ বিবিধ বিষয় আলোচনা হবে।[৩] তবে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা, বিশেষ করে অর্থায়ন-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও শুদ্ধাচার নিশ্চিতে নিম্নলিখিত ঘাটতিগুলো পরিলক্ষিত হচ্ছে।

বৈশ্বিক জলবায়ু অর্থায়নে স্বচ্ছতার ঘাটতি ও অর্থায়নে অনিশ্চয়তা

প্রতিশ্রুত জলবায়ু তহবিল দিতে ব্যর্থতা : প্যারিস চুক্তিতে প্রতিশ্রুত জলবায়ু তহবিল দেওয়া বাধ্যতামূলক না করে ঐচ্ছিক রাখা হয়েছে। ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় জলবায়ু অর্থায়ন পাওয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। ২০২০ সাল থেকে প্রতিবছর জলবায়ু অর্থায়ন হিসেবে প্রতিশ্রুত ১০০ বিলিয়ন ডলার দিতে উন্নত দেশগুলো ব্যর্থ হয়েছে,[৪] যা ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনসহ প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নের পূর্বশর্ত। জলবায়ু তহবিল 'উন্নয়ন সহায়তার বাড়তি' এবং 'নতুন ও অতিরিক্ত' হলেও কোনো রকম যাচাই-বাছাই ছাড়াই উন্নয়ন সহায়তার সাথে জলবায়ু অর্থায়নকে মিলিয়ে গত দুই বছরে তারা ৮৩ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলার দিয়েছে। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ২০ বিলিয়ন ডলার জলবায়ু তহবিল।[৫] তাই এ বছর জলবায়ু সম্মেলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো প্রতিবছর ১০০ বিলিয়ন ডলার করে ২০২০-২৫ সাল পর্যন্ত প্রতিশ্রুত মোট ৬০০ বিলিয়ন ডলার সময়াবদ্ধভাবে সরবরাহে উন্নত দেশগুলোকে রাজি করানো।

তহবিলের অপর্যাপ্ততা : ২০৩০ সালের মধ্যে জলবায়ু তহবিলের চাহিদা প্রতিবছর ১৪০-৩০০ বিলিয়ন ডলার হবে।[৬] তাপমাত্রা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ বৃদ্ধির ফলে ২০০৯ সালে প্রতিশ্রুত প্রতিবছর ১০০ বিলিয়ন ডলার এখন আর পর্যাপ্ত নয়।[৭] তাই ক্ষতিগ্রস্ত দেশের ক্রমবর্ধমান অভিযোজন ও প্রশমন চাহিদা মেটানোর জন্য অর্থায়নের নতুন সম্মিলিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ জরুরি। কেবল অভিযোজনের জন্য বাংলাদেশের প্রতিবছর ৫ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলার প্রয়োজন।[৮] কিন্তু ২০১০ সাল থেকে বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত ৭১০ মিলিয়ন ডলার আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিল থেকে পেয়েছে, যা প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য।[৯] এ ছাড়া জলবায়ু তহবিলের টাকা কোন উৎস হতে, কখন এবং কীভাবে দেওয়া হবে এবং ২০২৫ সালের পর অর্থ সরবরাহের রোডম্যাপ না থাকায় অর্থায়ন নিয়ে অনিশ্চয়তা বাড়ছে।

---

[৩] কপ-২৭ ওয়েবসাইট, বিস্তারিত দেখুন: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2022_01E.pdf?download

[৪] নেচার, ২০ অক্টোবর ২০২১, বিস্তারিত দেখুন: https://www.nature.com/articles/d41586-021-02846-3

[৫] ওইসিডি ২০২২, বিস্তারিত দেখুন https://bit.ly/3U3UoEx

[৬] এনার্জি ট্রাকার এশিয়া, অক্টোবর ২০২২, বিস্তারিত দেখুন: https://bit.ly/3N9rUXy

[৭] রেস টু রেজিলিয়েন্স, রেস টু জিরো, ৩০ আগস্ট ২০২২, বিস্তারিত দেখুন: https://bit.ly/3TDMemd

[৮] অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় ২০১৫, বিস্তারিত দেখুন: https://bit.ly/3N7rT6y

[৯] ঢাকা ট্রিবিউন, ২ জানুয়ারি ২০২১, বিস্তারিত: https://www.dhakatribune.com/climate-change/2021/01/02/climate-finance-in-bangladesh-a-critical-review

জলবায়ু অর্থায়নে ঋণের প্রসার ও দ্বৈত গণনা : প্যারিস চুক্তিতে জলবায়ু অর্থায়নের সর্বসম্মত সংজ্ঞা না থাকায় 'নতুন' এবং 'অতিরিক্ত' সহায়তাকে ঋণ হিসেবেও প্রদান করা হচ্ছে।[১০] এখন পর্যন্ত প্রদত্ত মোট বৈশ্বিক জলবায়ু অর্থায়নের ৭০ শতাংশই ঋণ হিসেবে দেওয়া হয়েছে। জিসিএফ তহবিল প্রাপ্তিতে কঠিন মানদণ্ড নির্ধারণ করায় প্রয়োজনীয় জলবায়ু তহবিল পাওয়া ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর জন্য কঠিন হয়ে পড়েছে। এই সুযোগে আন্তর্জাতিক অর্থ লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানগুলো জিসিএফ নিবন্ধন নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশে অনুদানের সাথে ঋণের প্রসার করছে। এ ছাড়া উন্নয়নসহায়তাকে জলবায়ু তহবিল হিসেবে দেখানোর ফলে প্রদত্ত অর্থ অনেক ক্ষেত্রে দুইবার গণনা ও রিপোর্ট করা হয়েছে, যা অনৈতিক।

অভিযোজন কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও শুদ্ধাচারে ঘাটতি

ক্ষতিগ্রস্ত দেশে অভিযোজনকে অনাগ্রাধিকার : ক্ষতিগ্রস্ত দেশের জন্য অভিযোজন অগ্রাধিকার হলেও এ খাতে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ করা হয়নি। ২০২০ সালে দ্বিপক্ষীয়, বহুপক্ষীয়, সরকারি এবং বেসরকারি উৎস থেকে প্রদত্ত বৈশ্বিক মোট জলবায়ু অর্থের মাত্র ৩২ শতাংশ অভিযোজন এবং ৫৮ শতাংশ প্রশমন খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে। বাকি ১০ শতাংশ অর্থ অভিযোজন ও প্রশমন একত্রে মিলিয়ে (ক্রস-কাটিং) বরাদ্দ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, জলবায়ু অর্থায়নের প্রধান মাধ্যম জিসিএফে অভিযোজন এবং প্রশমন খাতে ৫০ঃ৫০ অনুপাত বজায় রাখার কথা থাকলেও ২০২২ সালের জুলাই পর্যন্ত বরাদ্দকৃত অর্থের হিসাবে এই অনুপাত ৩৮ঃ৬২। এ ক্ষেত্রে অভিযোজনের জন্য ৪ দশমিক ১০ বিলিয়ন ডলার এবং প্রশমনের জন্য ৬ দশমিক ৭০ বিলিয়ন ডলার বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।[১১]

সময়াবদ্ধ প্রকল্প বাস্তবায়নে ঘাটতি : জিসিএফসহ তহবিলের প্রকল্প অনুমোদন, অর্থছাড় ও কার্যক্রম নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নে নীতিমালা ও জবাবদিহি নেই। অর্থছাড়ে রয়েছে দীর্ঘসূত্রতা। ২০১৫ সালে জিসিএফ প্রথম যেসব প্রকল্প অনুমোদন দেয় তার একটি হলো ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার মেইনস্ট্রিমিং (সিআরআইএম) প্রকল্প। বাংলাদেশে বাস্তবায়নরত প্রকল্পটির মেয়াদকাল ২০১৫-২০২৪ সাল হলেও এর বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি। ২০২২ সালের জুলাই পর্যন্ত এই প্রকল্পে অনুমোদিত মোট অর্থের মাত্র ৭ শতাংশ ছাড় করা হয়েছে।[১২] জিসিএফ বাংলাদেশের সাতটি প্রকল্পে ৩৭৪ মিলিয়ন ডলার অনুমোদন দিলেও এখন পর্যন্ত মাত্র ৩৫ দশমিক ৬ মিলিয়ন ডলার ছাড় করেছে।[১৩] প্রকল্প তহবিল ছাড় এবং বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতার কারণে জলবায়ু উপদ্রুত এলাকায় দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি বেড়েই চলেছে।

---

[১০] ডেইলি স্টার, ১৭ ডিসেম্বর ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://bit.ly/3m41Jpt; ডেইলি স্টার, ২৮ জুলাই ২০২১, বিস্তারিত দেখুন: https://bit.ly/3AZbvgN

[১১] জিসিএফ ২০২২, বিস্তারিত দেখুন, https://www.greenclimate.fund/projects/dashboard

[১২] জিসিএফ ২০২২, বিস্তারিত দেখুন: https://www.greenclimate.fund/project/fp004?f[]=field_date_content:2021

[১৩] জিসিএফ ২০২২, বিস্তারিত দেখুন, https://www.greenclimate.fund/countries/bangladesh#documents

প্রাকৃতিক সম্পদের সুরক্ষায় ঘাটতি : সম্মেলনে একটি গুরুত্বপূর্ণ অ্যাজেন্ডা হলো ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠী, প্রাকৃতিক আবাসস্থল ও সম্পদ সুরক্ষা, বাস্তুতন্ত্র রক্ষা ও পুনরুদ্ধার, জীবন-জীবিকা রক্ষা এবং ক্ষতি এড়ানো। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অর্থায়ন নেই, নেই কোনো সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা। অন্যদিকে উন্নয়নের নামে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক প্রকল্পে অর্থায়ন অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশে জাপান, চীন ও দক্ষিণ কোরিয়ার মতো উন্নত দেশগুলো কয়লাভিত্তিক প্রকল্পে অর্থায়ন ও কারিগরি সহায়তা প্রদান অব্যাহত রেখেছে।[১৪] কয়লা প্রকল্পের ফলে বন ধ্বংস, পানিদূষণসহ জীববৈচিত্র্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। বৈশ্বিক ও জাতীয় উদ্বেগ উপেক্ষা করে, ত্রুটিপূর্ণ সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষার ভিত্তিতে এবং আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য কৌশলগত পরিবেশ সমীক্ষা ছাড়াই সুন্দরবনের মতো পরিবেশ সংবেদনশীল বনের কাছে কয়লাবিদ্যুৎ প্রকল্প ও ঝুঁকিপূর্ণ শিল্প স্থাপন করা হচ্ছে।

অভিযোজন কার্যক্রমে দুর্নীতি ও অনিয়ম : গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফ্যাসিলিটি-জিইএফসহ প্রধান জলবায়ু তহবিল ও এর বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে।[১৫] বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ডসহ অভিযোজন কার্যক্রমেও দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে।[১৬] ট্রাস্ট তহবিল প্রকল্পের ৩৫ শতাংশ অর্থ আত্মসাৎ এবং ৮০ শতাংশ প্রকল্পের কাজ নিম্নমানের করা হয় বলে গবেষণায় উঠে এসেছে।[১৭]

প্রশমন কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির ঘাটতি

ব্যাপকভিত্তিক জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার অব্যাহত এবং জলবায়ু ঝুঁকি বৃদ্ধি : উন্নত দেশগুলো প্রশমন-সহায়ক প্রযুক্তি উন্নয়ন ও হস্তান্তর ত্বরান্বিত করা এবং জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার কমানোয় সম্মত হলেও বাস্তব চিত্র উল্টো। দেশগুলো ২০৩০ সালনাগাদ জীবাশ্ম জ্বালানি উৎপাদন ও ব্যবহার ১১০ ভাগ বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে। এর মধ্যে কয়লার উৎপাদন ২৪০ শতাংশ বাড়ানোর পরিকল্পনা হচ্ছে।[১৮] কপ-২৬ সম্মেলনে কয়লার ব্যবহার বন্ধের (ফেজ আউট) প্রচেষ্টা ভারত, সৌদি আরব, অস্ট্রেলিয়ার বাধায় ভেস্তে যায় এবং কয়লার ব্যবহার কমানোর (ফেজ ডাউন) সিদ্ধান্তেই দেশগুলো সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু সম্মেলনে কয়লার ব্যবহার কমানোর ঘোষণা দেওয়া দেশগুলোর অর্ধেকই উল্টো কয়লার ব্যবহার বাড়িয়েছে, যার মধ্যে চীন ৯ শতাংশ এবং যুক্তরাষ্ট্র ১৪ শতাংশ বাড়িয়েছে।[১৯] বাংলাদেশও কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প গ্রহণ

---

১৪ মার্কেট ফোর্স ২০১৯, বিস্তারিত দেখুন: https://bit.ly/3C79Y9A

১৫ ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল ২০২১, বিস্তারিত দেখুন: https://images.transparencycdn.org/images/220406_TI_Report_Corruption_free_climate_finance.pdf

১৬ জিসিএফ ২০২১, বিস্তারিত দেখুন: https://bit.ly/3f4j9l7

১৭ লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিক্স ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://bit.ly/3D9wNLO

১৮ দ্য প্রডাকশন গ্যাপ রিপোর্ট ২০২১, বিস্তারিত দেখুন: https://productiongap.org/2021report/

১৯ দ্য স্ট্র্যাটিজিস্ট, বিস্তারিত দেখুন: https://www.aspistrategist.org.au/the-worlds-appetite-for-coal-was-increasing-even-before-the-ukraine-war/

বন্ধের ঘোষণা দেয়নি। চলমান এবং প্রস্তাবিত কয়লা প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন হলে বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে বছরে ১১৫ মিলিয়ন টন বাড়তি কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসরণ করবে,[২০] যা কার্বন নিঃসরণ কমানোসংক্রান্ত সরকারের আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারের সাথে সাংঘর্ষিক। নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনেও অগ্রগতি হয়নি। বাংলাদেশ সংশোধিত জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অনুমিত অবদান (আইএনডিসি) জমা দিলেও কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের বাড়তি কোনো কার্যক্রম ও পরিকল্পনা প্রদান করেনি; বরং খসড়া ইন্টিগ্রেটেড এনার্জি অ্যান্ড পাওয়ার মাস্টারপ্ল্যানে (আইইপিএমপি) কয়লা ও এলএনজিকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ফলে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বৈশ্বিক কার্বন নিঃসরণ হ্রাসসংক্রান্ত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে ঘাটতি : জীবাশ্ম জ্বালানি খাত বৈশ্বিক মোট কার্বনের তিন-চতুর্থাংশ নিঃসরণ করে, যা তাপমাত্রা দ্রুতই ১ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধির জন্য দায়ী।[২১] ২০২১ সালে জ্বালানি খাতে কার্বন নিঃসরণ পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বোচ্চ ৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।[২২] ইউরোপের ৫০টি দেশ ২০৫০ সালের মধ্যে 'নেট-জিরো' লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং সংশোধিত আইএনডিসি বাস্তবায়নের ঘোষণা দিলেও তারা পরিবহন, ইস্পাত ও ভারী শিল্প খাত থেকে অপর্যাপ্ত কার্বন নিঃসরণ কমানোর পরিকল্পনা দিয়েছে।[২৩] তাদের প্রদত্ত সংশোধিত প্রতিশ্রুতি কার্বন হ্রাসে বৈশ্বিক মোট ঘাটতির মাত্র ২০ শতাংশ পুষিয়ে দিতে পারবে।[২৪] তাই 'নেট-জিরো' অর্জনে সব দেশকে এনডিসিতে কার্বন নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্যমাত্রা আরও বৃদ্ধি করে পূর্বনির্ধারিত ২০২৫ সালের আগেই তা সংশোধনে মতৈক্য জরুরি।[২৫]

উন্নত স্বচ্ছতাকাঠামোর বিবিধ শর্তে শিথিলতা : আইএনডিসি বাস্তবায়নে ২০১৮ সালে প্যারিস পরিকল্পনা (রুলবুক) বাস্তবায়ন নির্দেশিকা গৃহীত হলেও রুলবুকের উন্নত স্বচ্ছতাকাঠামোর (এনহ্যান্সড ট্রান্সপারেন্সি ফ্রেমওয়ার্ক) আওতায় প্রতিবেদন প্রস্তুতে কিছু শর্ত শিথিল রাখা হয়েছে। অর্থায়নসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিতে যে কাঠামোর প্রস্তাব করা হয়েছে, তা মেনে চলাও বাধ্যতামূলক নয়। ফলে দেশগুলো অস্বচ্ছ তথ্যের ভিত্তিতে গ্যাস নির্গমন, অভিযোজন ও প্রশমন কার্যক্রম এবং প্রদত্ত ও প্রাপ্ত আর্থিক সহায়তাসংবলিত প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। উন্নত দেশসহ অধিকাংশ দেশ তুলনাযোগ্য, সম্পূর্ণ এবং সময়োপযোগী তথ্য প্রদান করেনি।[২৬] ফলে কার্যক্রমের

[২০] মার্কেট ফোর্স ২০১৯, বিস্তারিত দেখুন: https://www.marketforces.org.au/bangladesh-choked-by-coal/

[২১] গ্লোবাল এনার্জি আউটলুক ২০২১, বিস্তারিত দেখুন: https://www.rff.org/publications/reports/global-energy-outlook-2021-pathways-from-paris/; আওয়ার ওয়ার্ল্ড ইন ডেটা, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২০, বিস্তারিত দেখুন: https://ourworldindata.org/ghg-emissions-by-sector

[২২] জাতিসংঘ ২০২২, https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2022-03-21/secretary-generals-remarks-economist-sustainability-summit

[২৩] ওইসিডি ২০১৯, বিস্তারিত দেখুন: https://www.oecd.org/greengrowth/GGSD2019_IssuePaper_CementSteel.pdf

[২৪] ইমিশন গ্যাপ রিপোর্ট ২০২০, বিস্তারিত দেখুন-https://www.unep.org/interactive/emissions-gap-report/2020/

[২৫] জাতিসংঘ ২০২১, বিস্তারিত দেখুন: https://www.un.org/en/climatechange/cop26

[২৬] ইউএনএফসিসিসি ২০২১, বিস্তারিত দেখুন: https://bit.ly/3m4rvtr

অগ্রগতিসহ উন্নত দেশগুলো ক্ষতিগ্রস্ত দেশে কী পরিমাণ আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করেছে এবং কী পরিমাণ কার্বন নির্গমন কমিয়েছে, তা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। প্রতিবেদনে প্রদত্ত তথ্যের সত্যতা যাচাই করার কোনো ব্যবস্থাও নেই।[২৭]

ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় আলাদা তহবিল গঠনে উন্নত দেশের বাধা এবং অনুদানভিত্তিক বরাদ্দে ঘাটতি

ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় অনুদানভিত্তিক বরাদ্দে ঘাটতি রয়েছে। প্যারিস চুক্তিতে 'ক্ষয়ক্ষতি'র (loss and damage) বিষয়টি অভিযোজন থেকে আলাদা বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তবে ওয়ারসো ইন্টারন্যাশনাল মেকানিজমের আওতায় সান্তিয়াগো নেটওয়ার্ক অন লস অ্যান্ড ড্যামেজ গঠন করা হলেও এর পরিচালনা পদ্ধতি এখনো নির্ধারণ করা হয়নি।[২৮] উন্নত দেশগুলোর বিবিধ বাধার মুখে (ক্ষয়ক্ষতির বিষয় সরাসরি অস্বীকার করা, অ্যাজেন্ডা থেকে ক্ষয়ক্ষতিবিষয়ক আলোচনা বাদ দেওয়া, সিদ্ধান্তসংক্রান্ত নথিতে ভাষাগত পরিবর্তন করা) 'ক্ষয়ক্ষতি' মোকাবিলায় ৩০ বছরেও আলাদা কোনো তহবিল গঠন করা হয়নি।[২৯] উল্লেখ্য, লস অ্যান্ড ড্যামেজের বিষয়টি কপ-২৭ সম্মেলনে আনুষ্ঠানিক আলোচনার অ্যাজেন্ডায়ও অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।[৩০] এ ছাড়া অনুদানভিত্তিক ক্ষতিপূরণ প্রদান না করে উন্নত দেশগুলো বিমা কার্যকর করায় গুরুত্ব দিচ্ছে, যা ক্ষতিগ্রস্তদের বিমার বোঝাসহ দুর্ভোগ আরও বাড়বে।

আসন্ন কপ-২৭ সম্মেলনে টিআইবির প্রত্যাশা

এই পরিপ্রেক্ষিতে আসন্ন কপ-২৭ সম্মেলনে জলবায়ু অর্থায়নে দৃশ্যমান অগ্রগতিসহ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে ন্যায্যতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতসহ প্যারিস চুক্তির বাস্তবায়ন নিশ্চিতে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের বিবেচনার জন্য টিআইবি নিচের দাবিগুলো পেশ করছে :

বাংলাদেশ কর্তৃক কপ-২৭ সম্মেলনে উত্থাপনযোগ্য

১. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করে উন্নত দেশগুলোকে প্রতিশ্রুত ১০০ বিলিয়ন ডলার জলবায়ু তহবিল প্রদান এবং ২০২০-২০২৫ মেয়াদের জন্য প্রতিশ্রুত মোট ৬০০ বিলিয়ন ডলার প্রদানে একটি রোডম্যাপ প্রস্তুতে সমন্বিত দাবি উত্থাপন করতে হবে;

২. জলবায়ু অর্থায়নের জন্য নতুন সম্মিলিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে উন্নয়নশীল এবং ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্ট্রগুলোর সাথে একত্রে কাজ করতে হবে;

---

[২৭] সেন্টার ফর ক্লাইমেট অ্যান্ড এনার্জি সল্যুশন, ৩ জুন ২০২১, বিস্তারিত দেখুন: https://www.c2es.org/2021/06/transparency-of-action-issues-for-cop-26/

[২৮] ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, বিস্তারিত দেখুন: https://bit.ly/3WioV3p

[২৯] ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, বিস্তারিত দেখুন: https://drive.google.com/file/d/1YikIwuccKBT2RInnPAhOJl5p_PiHtLwV/view

[৩০] দ্য থার্ড পোল, জুন ২০২২, বিস্তারিত দেখুন: https://www.thethirdpole.net/bn/464/94029/

৩. কার্বন নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্যমাত্রা আরও বৃদ্ধি করে ২০২৫ সালের আগে এনডিসি সংশোধনে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

৪. উন্নত স্বচ্ছতাকাঠামোর প্রতিশ্রুতি পূরণে শিথিলতা পরিহার এবং অভিযোজন ও প্রশমন কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে;

৫. জিসিএফসহ জলবায়ু তহবিলে ঋণ নয়, অভিযোজনকে অগ্রাধিকার দিয়ে ক্ষতিপূরণের টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করতে হবে;

৬. ক্ষয়ক্ষতিবিষয়ক আলাদা তহবিল গঠন করতে হবে; ঝুঁকি বিনিময়ে বিমার পরিবর্তে অনুদানভিত্তিক অর্থ প্রদান করতে হবে;

৭. সান্তিয়াগো নেটওয়ার্ক অন লস অ্যান্ড ড্যামেজের পরিচালনা পদ্ধতি নির্ধারণপূর্বক তা কার্যকরে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

৮. জিসিএফসহ জলবায়ু তহবিল থেকে সময়াবদ্ধ প্রকল্প অনুমোদন ও অর্থ ছাড় করতে হবে; ক্ষতিগ্রস্ত দেশে অভিযোজন ও প্রশমনবিষয়ক ৫০ঃ৫০ অনুপাত মেনে অর্থায়ন করতে হবে;

৯. ২০২২ সালের পরে সব দেশকে নতুন কোনো কয়লানির্ভর প্রকল্প অনুমোদন ও অর্থায়ন না করার ঘোষণা দিতে হবে।

বাংলাদেশ সরকারের করণীয়

১০. ইউক্রেন যুদ্ধপ্রসূত অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক ও জ্বালানিসংকট মোকাবিলার বাধ্যবাধকতার পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনজনিত চ্যালেঞ্জগুলোর ওপর প্রাধান্য অব্যাহত রাখতে হবে;

১১. জীবন-জীবিকা, বন ও পরিবেশ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায় কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রসহ ঝুঁকিপূর্ণ শিল্পায়ন কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে স্থগিত করে আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য ও নিরপেক্ষ কৌশলগত পরিবেশের প্রভাব নিরূপণ সাপেক্ষে অগ্রসর হতে হবে;

১২. একটি সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপসহ প্রস্তাবিত ইন্টিগ্রেটেড এনার্জি অ্যান্ড পাওয়ার মাস্টারপ্ল্যান-আইইপিএমপিতে কৌশলগতভাবে নবায়নযোগ্য জ্বালানিকে গুরুত্ব দিতে হবে;

১৩. জ্বালানি খাতে স্বার্থের দ্বন্দ্ব সংশ্লিষ্টদের বাদ দিয়ে একটি অন্তর্ভুক্তি ও অংশগ্রহণমূলক উপায়ে আইইপিএমপি প্রণয়ন করতে হবে;

১৪. বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানির উৎপাদন বৃদ্ধিতে এ খাতে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে;

১৫. সুনির্দিষ্ট রূপরেখা প্রণয়ন করে প্রশমনবিষয়ক কার্যক্রম স্বচ্ছতার সাথে বাস্তবায়নে পদক্ষেপ নিতে হবে; বিশেষ করে এ খাতে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ বৃদ্ধির সহায়ক নীতিমালা প্রণয়ন ও অবিলম্বে বাস্তবায়ন করতে হবে;

১৬. জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা-সংক্রান্ত সব প্রকল্পে সুশাসন, শুদ্ধাচার এবং বিশেষ করে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ নিশ্চিত করতে হবে।

গবেষক পরিচিতি

কাওসার আহমেদ

টিআইবির গবেষণা ও পলিসি বিভাগে রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট পদে কর্মরত। বর্তমানে তিনি 'ব্যাংকবহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়' শীর্ষক গবেষণা প্রকল্পে কাজ করছেন। কাওসার আহমেদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি উচ্চশিক্ষা অর্জনের লক্ষ্যে হেলমুট-স্মিট স্কলারশিপ নিয়ে জার্মানি গমন করেন এবং ইউনিভার্সিটি অব এরফুর্টের উইলি ব্র্যান্ট স্কুল অব পাবলিক পলিসি থেকে পাবলিক পলিসি বিষয়ে দ্বিতীয় মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি মূলত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, আমলাতন্ত্রের রাজনৈতিকীকরণ, ফ্রন্টলাইন ব্যুরোক্রেসি এবং নীতি বাস্তবায়নবিষয়ক গবেষণায় আগ্রহী। তার লেখা 'Ethnic Marginalization and Statelessness of Rohingya : Policy Conundrums for Repatriation' শীর্ষক প্রবন্ধ এরফুর্ট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ২০২০ সালে প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া ২০১৪ সালে প্রকাশিত Local Governance and Decentralization: Politics and Economics শীর্ষক গ্রন্থে তার লেখা তিনটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। টিআইবিতে যোগ দেওয়ার আগে কাওসার আহমেদ ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির সেন্টার ফর পিস অ্যান্ড জাস্টিস এবং হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার নামের সংস্থায় কাজ করেছেন। পাশাপাশি তার এশিয়া ফাউন্ডেশন, ইউএনডিপি ও এসডিজির বিভিন্ন প্রকল্পে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে।

ফারহানা রহমান

টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে রিসার্চ ফেলো হিসেবে কর্মরত। তিনি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয় স্থানীয় সরকার খাত ও প্রতিষ্ঠান। এ ছাড়া তিনি প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, জাতীয় বাজেট পর্যালোচনা, ২০০৪ সালের বন্যা পরিস্থিতি পর্যালোচনা বিষয়ে গবেষণা করেছেন। তিনি টিআইবির জাতীয় খানা জরিপের সাথে বিশেষভাবে জড়িত।

মুহা. নূরুজ্জামান ফরহাদ

বর্তমানে রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট, কোয়ান্টিটেটিভ হিসেবে টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে কর্মরত। এর আগে আট বছরের বেশি সময় ধরে প্রাইম ব্যাংক লিমিটেডের গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগে কর্মরত ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিসংখ্যান বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার ক্ষেত্র শিশু স্বাস্থ্য, নারীর ক্ষমতায়ন। এ পর্যন্ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক জার্নালে তার বেশ কিছু গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

মো. সাজেদুল ইসলাম

ডেটা অ্যানালিস্ট হিসেবে টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে কর্মরত। তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। এর পর তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তথ্যপ্রযুক্তি (IT) ও ফলিত পরিসংখ্যান এবং তথ্যবিজ্ঞানের (Applied Statistic and Data science) ওপর আরও দুটি স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ডেটাবেইস এবং ডেটা বিশ্লেষণে তার অভিজ্ঞতা রয়েছে। টিআইবিতে কাজ করার সময় তিনি সেবা খাতে দুর্নীতি : জাতীয় খানা জরিপ ২০২১-এ ডেটা বিশ্লেষণ কার্যক্রম পরিচালনা করেন। টিআইবিতে যোগদানের আগে তিনি জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচিতে গভর্নমেন্ট ক্যাপাসিটি বৃদ্ধিকরণ প্রোগ্রামে কাজ করেছেন। এর আগে তিনি বাংলাদেশের কয়েকটি স্বনামধন্য সফটওয়্যার কোম্পানিতে সফটওয়্যার প্রকৌশলী হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

মো. জুলকারনাইন

রিসার্চ ফেলো হিসেবে টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে কর্মরত। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর এবং পরবর্তী সময়ে স্টেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ থেকে জনস্বাস্থ্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয়ের মধ্যে রয়েছে সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও ব্যাংকিং খাত এবং এসব খাতভিত্তিক প্রতিষ্ঠান, পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য ইত্যাদি। এ ছাড়া তিনি টিআইবির জাতীয় খানা জরিপসহ জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন জরিপের সাথেও জড়িত ছিলেন। টিআইবি ছাড়াও তিনি পপুলেশন কাউন্সিল বাংলাদেশ, জেমস পি গ্রান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথ, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, এনজিও ফোরাম ফর পাবলিক হেলথ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে গবেষক হিসেবে কাজ করেছেন।

মো. নেওয়াজুল মওলা

রিসার্চ ফেলো, ক্লাইমেট ফিন্যান্স গভর্নেন্স (সিএফজি) হিসেবে টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে কর্মরত। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নৃবিজ্ঞানে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। সামাজিক গবেষণা এবং এর বিভিন্ন পদ্ধতিতে তার অভিজ্ঞতা রয়েছে। টিআইবিতে 'জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন' ইউনিটে কাজের সুবাদে তিনি পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং অর্থায়নসংক্রান্ত বিষয়ের সুশাসনগত দিকগুলো বিশ্লেষণ করেন এবং জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসনের ওপর বিভিন্ন গবেষণা ও অধিপরামর্শমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করেন। টিআইবিতে যোগদানের আগে তিনি ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি, আইসিডিডিআরবি এবং ব্র্যাকের সাথে কাজ করেছেন। গবেষণায় তার আগ্রহের ক্ষেত্রগুলো হলো পরিবেশ ও জলবায়ু, জলবায়ু অভিযোজন ও অর্থায়ন, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, জলবায়ুতাড়িত অভিবাসন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা।

মো. মাহ্ফুজুল হক

সিনিয়র রিসার্চ ফেলো (সিএফজি) হিসেবে টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে কর্মরত। জলবায়ু পরিবর্তন, জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন, পানি ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও

পরিবেশ সুরক্ষা ইত্যাদি বিষয় তার গবেষণার প্রধান ক্ষেত্র। তার গবেষণাকাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়ন এবং সুশাসন, বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়নের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, অভিযোজন অর্থায়নে সুশাসনের মানদণ্ড নির্ধারণ, বন্যা মোকাবিলায় প্রস্তুতি এবং ত্রাণ কার্যক্রমে শুদ্ধাচার পর্যবেক্ষণ, দুর্যোগ মোকাবিলা ইত্যাদি। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন।

মো. মোস্তফা কামাল

রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট, কোয়ালিটেটিভ হিসেবে টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে কর্মরত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। টিআইবিতে কাজ করার আগে তিনি আইসিডিডিআরবিতে স্বাস্থ্য খাতের একাধিক গবেষণাকর্মে সহায়তা করেছেন।

মো. সহিদুল ইসলাম

বর্তমানে রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট (সিএফজি) হিসেবে টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে কর্মরত। তিনি শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। পরে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজবিজ্ঞানে এমফিল ডিগ্রি অর্জন করেছেন। টিআইবিতে যোগদানের আগে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (বিআইডিএস), বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল রিসার্চ ট্রাস্ট এবং ইনস্টিটিউট অব কালচারাল অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট রিসার্চসহ (আইসিডিআর) বিভিন্ন স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে গবেষণার কাজ করেছেন। তার গবেষণার ক্ষেত্র সামাজিক পুঁজি, প্রজননস্বাস্থ্য, অভিবাসন এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও নীতি। এ পর্যন্ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক জার্নালে তার ৪০টির বেশি গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

মো. সাজ্জাদুল করিম

রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট, কোয়ালিটেটিভ হিসেবে টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে কর্মরত ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। টিআইবিতে কাজ করার আগে তিনি বাংলাদেশ সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড স্টাডিজ (বিসিএএস) প্রতিষ্ঠানে গবেষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তার গবেষণার মূল বিষয়গুলোর মধ্যে চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন (প্রশমন, অভিযোজন ও অর্থায়ন), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, পানিসম্পদ উন্নয়ন, সংসদব্যবস্থা, জেন্ডার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া ওই বিষয়গুলোর ওপর জাতীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষকের জন্য প্রশিক্ষণ (টিওটি) কর্মশালায় প্রশিক্ষক হিসেবে তার কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে।

মো. শহিদুল ইসলাম

টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর এবং একই

বিভাগ থেকে 'মিলিটারি রুল অ্যান্ড দ্য ক্রাইসিস অব গুড গভর্নেন্স : আ স্টাডি অব এরশাদ রেজিম' বিষয়ে এমফিল ডিগ্রি অর্জন করেন। বর্তমানে জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমিতে 'উন্নয়ন পরিকল্পনার' ওপর পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা করছেন। তার গবেষণার প্রতিপাদ্য বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে সুশাসন, উন্নয়ন, গণতন্ত্র, জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠী। টিআইবি ছাড়াও তিনি ব্র্যাকের গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগে কাজ করেছেন।

মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান সাখিদার

রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট, কোয়ান্টিটেটিভ হিসেবে টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে কর্মরত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। টিআইবিতে কাজ করার আগে তিনি আইইডিসিআর, আইপাস বাংলাদেশ এবং এমিনেন্সের মতো জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে গবেষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তার গবেষণার মূল বিষয়গুলোর মধ্যে জনস্বাস্থ্য, জেন্ডার, জলবায়ু পরিবর্তন, সংসদব্যবস্থা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া গবেষণা ও তথ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতির ওপর আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রশিক্ষক হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে।

মোহাম্মদ নূরে আলম

রিসার্চ ফেলো হিসেবে টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে কর্মরত। তিনি শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। নূরে আলম ইতিমধ্যে পানি উন্নয়ন বোর্ড, বিমান ও বিমানবন্দর ব্যবস্থাপনা এবং ভূমি ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণা সম্পন্ন করেছেন। এ ছাড়া টিআইবির জাতীয় খানা জরিপসহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জরিপের সাথেও তিনি জড়িত।

মোহাম্মদ শাহনূর রহমান

টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগে প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। পরে তিনি গভর্ন্যান্স অ্যান্ড পাবলিক পলিসি বিষয়ে সিভিল সার্ভিস কলেজ, ঢাকা থেকে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। এ ছাড়া তিনি নরওয়ে সরকারের আর্থিক সহায়তায় সাউথ সাউথ এশিয়া এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামের আওতায় দুর্নীতি ও সুশাসন বিষয়ে এক বছর মেয়াদি ফ্রেডসকর্পসেট ফেলোশিপ সম্পন্ন করেন। তিনি স্বাস্থ্য খাত ও প্রতিষ্ঠান, ওষুধ ব্যবস্থাপনা, নিরাপদ খাদ্য, পাসপোর্ট সেবা ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা সম্পন্ন করেছেন। এ ছাড়া টিআইবির জাতীয় খানা জরিপসহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জরিপের সাথেও তিনি জড়িত ছিলেন।

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান

টিআইবির রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের পরিচালক। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতি বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের বস্টন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য বিষয়ে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয়গুলোর

দেশব্যাপী দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং নাগরিক চাহিদাকে সোচ্চার ও কার্যকর করার জন্য কাজ করছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। এর অংশ হিসেবে সুশাসনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সরকারি ও বেসরকারি সেবা খাতে দুর্নীতির প্রকৃতি, মাত্রা ও ব্যাপকতা নিরূপণের জন্য টিআইবি গবেষণা ও তার ভিত্তিতে অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সরকার ও সংশ্লিষ্ট সব অংশীজনের অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশে আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক, নীতি ও কৌশলকাঠামোয় প্রয়োজনীয় ও যুগোপযোগী সংস্কারের মাধ্যমে রাষ্ট্রের দুর্নীতিবিরোধী ও সুশাসন-সহায়ক অবকাঠামো সুদৃঢ় এবং এর প্রয়োগে সহায়ক ভূমিকা পালন করা এই কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য।

টিআইবি পরিচালিত ও প্রকাশিত বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ নিয়ে 'বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা : উত্তরণের উপায়' শীর্ষক ১২টি সংকলন ইতিমধ্যে বার্ষিক ভিত্তিতে প্রকাশিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় এই সিরিজের ত্রয়োদশতম সংকলন ২০২৩ সালের অমর একুশে বইমেলা উপলক্ষে প্রকাশিত হলো। এই সংকলনকে তিনটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন, দ্বিতীয় অধ্যায়ে সেবা খাত এবং তৃতীয় অধ্যায়ে পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে প্রকাশিত বিভিন্ন গবেষণার সারসংক্ষেপ সংকলিত হয়েছে।

978-984-35-3809-3

মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, গণতান্ত্রিক কাঠামো, প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়া, জাতীয় সততাব্যবস্থা এবং এ-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান।

রাবেয়া আক্তার কনিকা

রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট, কোয়ালিটেটিভ হিসেবে টিআইবির রিসার্চ ও পলিসি বিভাগে কর্মরত। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। গুণগত গবেষক হিসেবে তিনি সিআইপিআরবি ও আইপাস বাংলাদেশসহ বিভিন্ন উন্নয়ন ও গবেষণাপ্রতিষ্ঠানে কাজ করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে জনস্বাস্থ্য, জেন্ডার, নগর উন্নয়ন, গণতন্ত্র অধ্যয়ন, সংসদব্যবস্থা ইত্যাদি।